পূর্ব ভারত
(PURVA BHARAT)
মানুষ ও সংস্কৃতি
ISSN 2319-8591

বর্ষ : ৮ সংখ্যা : ১

জুন, ২০২৫

প্রকাশক

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

গভ. রেজিঃ নং - S/1L/79269(2011)

শোভাগঞ্জ, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার

যোগাযোগের ঠিকানা

ডঃ সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,
পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২
ইমেল- eastindiansocietyapd@gmail.com
Website : https:\\eastindiansociety.org
দূরভাষ: - 9434630784 (সভাপতি), 7407018862 (সম্পাদক),
9434494655 (সহ সম্পাদক), 9733134588 (কর্মসমিতি সদস্য)

Copyright 2025 ©
All Rights Reserved by
East Indian Society for the Studies of Social Sciences.

The "East Indian Society for the Studies of Social Sciences" was established more than a decade ago; and its official journey was flagged off on the 5th of April, 2011, when it was registered under the societies Registration Act (West Bengal XXVI, 1961) with the Reg. No. S/1L/ 79269 (2011-2012) of the Government of West Bengal. It is a Non-Government and nonprofit organization pledged to carry on the mission of research in social sciences with India in general and Eastern-India in particular as the main theme in its objective of interdisciplinary explorations. As a part of multi-faceted social activities of the society, two biannual peer reviewed Journals namely "East Indian Journal of Social Sciences" (in English language) & "Purva Bharat" (Manus O Sanskriti) in Bengali Language with ISSN are being published regularly. Seminars and debates on significant topics are held as many times as financially possible in a year.

The Foundation of the Society and the Creation of the Journals:

The idea of the foundation of 'The East Indian Society for the Studies of Social Sciences' was, in the first place, excogitated by Dr. Sailen Debnath. The name of the society as well as the conceptions and appellations of the two journals - 'The East Indian Journal of Social Sciences' and 'Purva-Bharat (Manush O Sanskriti)' with ISSN were also originated by him. The ISSN of 'The East Indian Journal of Social Sciences' is individually in his name. He has been, indeed, the founder of the society and of the two journals.

পূর্ব ভারত

(PURVA BHARAT)

মানুষ ও সংস্কৃতি

(ISSN 2319-8591)

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গবেষণা পত্রিকার কোন প্রবন্ধ কিংবা প্রবন্ধের কোন অংশের কোনরূপ পুনঃপ্রকাশ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রকাশক

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

গভ. রেজিঃ নং - S/1L/79269(2011)

শোভাগঞ্জ, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার

প্রকাশ কাল : জুলাই ২০২৫

©ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

প্রচ্ছদ

স্বাধীন ঝা

মুদ্রণ

বিয়ন্ড হরাইজন পাবলিকেশন

৯৪৩৪৬৩৩০০৫

সংগ্রহ মূল্য

ব্যক্তিগত (বার্ষিক) ৬০০ টাকা (ভারতীয় টাকা)

প্রতিষ্ঠান (বার্ষিক) ১০০০ টাকা (ভারতীয় টাকা)

প্রাপ্তিস্থানঃ ড. সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,

পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২

দূরভাষ: - 9434630784(সভাপতি),7407018862(সম্পাদক),

9434494655(সহ সম্পাদক), 9733134588(কর্মসমিতি সদস্য)

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

কার্য নির্বাহী সমিতি

সভাপতি
ড. সুলেখা পন্ডিত

সহ-সভাপতি
পুষ্পজিৎ সরকার

সম্পাদক
সুজয় দেবনাথ

সহকারী সম্পাদক
জয়দীপ সিং

কোষাধ্যক্ষ
অনুপ রঞ্জন দে
কৌশিক চক্রবর্তী

মুখ্য সম্পাদক
ড. সুলেখা পন্ডিত
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

সহযোগী সম্পাদক

স্বাধীন ঝা
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

ড. অখিল সরকার,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ , নদীয়া

ড. সুভাষ সিংহ রায়
অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,
চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

পরীক্ষক মণ্ডলী

প্রফেসর (ড.) দীপক কুমার রায়
উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ
পূর্বতন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় , পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) রূপ কুমার বর্মণ
উপাচার্য, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) মাধবচন্দ্র অধিকারী
নিবন্ধক
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) কার্তিক চন্দ্র সুত্রধর
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) মনোশান্ত বিশ্বাস
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) পলাশ মণ্ডল
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) সোমদত্তা ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ড.) শ্রাবণী ঘোষ
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

সম্পাদকীয়

প্রকাশিত পূর্ব ভারত (মানুষ ও সংস্কৃতি) গবেষণামূলক পত্রিকার অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। এই পত্রিকার ভাষা ও লিপি বাংলায়, তাই বাঙালিরাই এর প্রধান লেখক এবং পাঠক। কয়েক বছরের নজরে লক্ষ্য করেছি, বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয় স্রষ্টাদের সাহিত্য নিয়ে কোন গবেষণামূলক লেখা পত্রিকার কলেবরভুক্ত হয়নি। বঙ্কিম, রবীন্দনাথ, শরৎ, নজরুল, বিভূতি, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ এঁদের কারও উপর মননশীল প্রবন্ধ চোখে পড়েনি। বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, দর্শন এবং ইতিহাস নিয়েও কোন নিবন্ধ আসেনি। প্রাপ্ত লেখাগুলি অভিনবত্বে বিষয়ের গভীরতায় এবং ব্যপ্তিতে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় না। শুধু অতলস্পর্শী হয় হতাশা।

যাই হোক, পূর্ব ভারত চলবে তার নিজস্ব গতিতে নদীর মতো। বহন করে নিয়ে যাবে যা সামনে আসে তাই। আর তাই নিয়ে যাবে জনসমুদ্রে, পাঠকের কাছে। আশা বুকে নিয়ে তাকিয়ে থাকবো শুধু ভবিষ্যতের আলোর দিকে। ফুটবে হয়তো উষার আলো।

সুলেখা পন্ডিত
সম্পাদক

আলিপুরদুয়ার
জুন, ২০২৫

সূচীপত্র

১১
ড. রমেন্দ্র নাথ ভৌমিক
বঙ্গভঙ্গ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৩০):
প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ

১৯
মেঘমিত্রা বিশ্বাস
নদীয়া জেলায় স্বদেশী আন্দোলন

২৭
ড. অমিত কুমার বটব্যাল
স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ভাবনায় চতুর্বিধ যোগ:
একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

৩৯
মানিক পাল
বাঙলায় সাংবাদিকতার প্রসার ও রামমোহন রায়

৫১
অপূর্ব ঘোষ ও শুভঙ্কর কুণ্ডু
ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষ বনাম দেশীয় পৌরুষ:
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদে পৌরুষ প্রতর্কে
স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরুষ ভাবনা

৬৫
কুন্তল দেবনাথ
পূর্ব ভারতের অন্যতম স্বদেশব্রতী শিক্ষাবিদ :
ড. ত্রিগুণা সেন (১৯০৫-১৯৯৮)

৮৩
ড. জয়দীপ ঘোষ,
ধর্ম, উৎসব ও অর্থনীতি : প্রসঙ্গ তারকেশ্বর

পূর্ব ভারত

৯৩
ড. সান্তনা মোচারি
মেচ সমাজে খ্রিস্ট ধর্মের আগমন ও প্রভাব:
ঔপনিবেশিক পর্যালোচনা

১০০
দশরথ রজক
সাহিত্য সংস্কৃতির আলোকে রাঢ়বঙ্গের প্রান্তিক জনজাতি

১০৯
কমলেশ রায়
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার:
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

১১৮
শ্রীমন্ত দাস
দামোদর সেচখাল প্রকল্প : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

১২৪
টোটন বিশ্বাস
প্রান্তজনের ধারায় বাংলার তিন সর্দার :
নারদ, দুর্যোধন ও লংকেশ্বর

১৩২
প্রিয়াঙ্কা দত্ত
সত্যজিত রায় পরিচালিত নারীকেন্দ্রিক ‘মহানগর’ (১৯৬৩)
ছায়াছবির একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

১৪৯
ড: জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
বেদান্তদর্শনের ধারায় ভগবদ্গীতা ও ঈশ্বর গীতার
তুলনামূলক আলোচনা

বঙ্গভঙ্গ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৩০): প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ

ড. রমেন্দ্র নাথ ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শামুকতলা সিধু কানহু কলেজ, আলিপুরদুয়ার

সারসংক্ষেপ:

উত্তরবঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস কম গৌরবের নয়। কিন্তু সেই ইতিহাস উঠে আসেনি এখনও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের রচনায়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে উত্তরবঙ্গের মাটিতে জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার আসে। চিত্তরঞ্জন দাশ, গান্ধীজী, নেতাজী, বিপিন চন্দ্র পালের মত জাতীয় নেতাদের আগমনে এখানকার ছাত্র, যুবক, শিক্ষকদের মধ্যে এক অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করলে উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে এক অভুতপুর্ব উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন। মালদা, অবিভক্ত দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার সহ অধুনা বাংলাদেশের রংপুর, রাজশাহী, পাবনাতে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেয়, ধোপারা কাপড় কাচতে অস্বীকার করে, উকিলগণ ব্রিটিশ আদালত ত্যাগ করে, বিদেশী চিনি, লবন, সাবান ব্যাবহার বন্ধ করে সবাই। এর মাঝে উত্তরবঙ্গে গড়ে ওঠে 'জাতীয় শিক্ষার স্কুল, কলেজ'। মালদাতে বিনয় সরকার 'জাতীয় স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। জলপাইগুড়ির দিনবাজারে দেশীয় বস্ত্রের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

একই ভাবে উত্তরবঙ্গে উদ্ভব হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন যার মুল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে অর্থাৎ অস্ত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশদের হত্যা করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। ক্রমে ক্রমে উত্তরবঙ্গের মাটিতে 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর সমিতি', 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', 'সুহৃদ সমিতি', এবং আর ও কিছু বিপ্লবী দলের শাখা গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন মালদা, অবিভক্ত দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহারে ছড়িয়ে পড়ে। স্বভাবতই কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসে তা হল- উত্তরবঙ্গে কোথায় প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল? উত্তরবঙ্গের মাটিতে কেন দেরিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল? ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন উত্তরবঙ্গের সম্ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কেন? উত্তরবঙ্গের মানুষ বঙ্কিম চন্দ্র ও বিবেকানন্দের লেখার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল? উত্তরবঙ্গের মাটিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সফল হয়েছিল কি? উত্তরবঙ্গে কোথায় অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সমিতির সক্রিয় ঘাঁটি ছিল? আলোচ্য প্রবন্ধে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন, কার্লাইল সার্কুলার, জাতীয় শিক্ষা, গুপ্ত সমিতি, বিপ্লবী আন্দোলন প্রভৃতি।

মূল প্রবন্ধ

উত্তরবঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুটো প্রধান ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল -নরমপন্থী (যারা এই মতে বিশ্বাসী -গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, মহাত্মা গান্ধী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ) ও চরমপন্থী (যারা এই মতে বিশ্বাসী -বিপিন চন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ) যা বাংলার উত্তরপ্রান্তের মাটিকে ও স্পর্শ করেছিল। আমরা সবাই জানি যে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) পর থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। এই সময়ে নরমপন্থীরা তিনটি 'P' এর নীতিতে (Pray, Please, Petition,) বিশ্বাসী ছিল। [১] ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলে বাংলার মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে গান লিখলেন-

'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।।'

বাংলার মানুষ নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে গঙ্গার জলে স্নান করে 'অরন্ধন ও রাখি বন্ধন উৎসব' পালন করে। তখন থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের ছাত্র-যুবক-জনতা এক হয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের মাটিতে ঝাঁপিয়ে পরেছিল। বঙ্গভঙ্গ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের এই ইতিহাস এ উত্তরবঙ্গের গৌরবময় ভূমিকার কথা যথাযথ স্থান পায়নি। এর প্রধান কারন এখানকার মানুষের ইতিহাস সচেতনতা, অজ্ঞতা ও তথ্যের অপ্রতুলতা। আলোচ্য প্রবন্ধে 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৩০) : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ' শিরোনামে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে আলোচনার চেষ্টা করেছি। এখানে কিছু প্রশ্ন তুলেছি এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা গবেষকদের কাছে তুলে ধরেছি যাতে এই বিষয়টি একটি আলোচনার পরিসরে সমতা পায়।

বিষয়গত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

স্বভাবতই কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসে তা হল— উত্তরবঙ্গে কবে, কোথায় প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল? উত্তরবঙ্গের মাটিতে কেন দেরীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল? কেন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উত্তরবঙ্গের সম্ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? কিভাবে উত্তরবঙ্গের মানুষ বঙ্কিম চন্দ্র

ও বিবেকানন্দের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল? উত্তরবঙ্গের মাটিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কতোটা সফল হয়েছিল? অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সমিতির উত্তরবঙ্গে কোথায় সক্রিয় ঘাটি ছিল? বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বক্সা দুর্গ কিভাবে জড়িত?

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও উত্তরবঙ্গ

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলে উত্তরবঙ্গের বাংলার মানুষ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিপিন চন্দ্র পাল 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকার দ্বারা এখানকার মানুষের মনে বিপ্লবী চেতনার সঞ্চার করে। উত্তরবঙ্গের মালদা এক্ষেত্রে অগ্রনি ভূমিকা পালন করে। মালদার এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন বিনয় সরকার। বিদ্যাসাগার কলেজ এর দোতলায় ডাকা এক সভায় সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'ডন সোসাইটি' ১৯০২ সালে। ঐ সভায় বিনয় সরকার উপস্থিত ছিলেন। মালদায় ১৯০৭ সালের ৬ই জুন তিনি প্রতিস্থা করলেন 'মালদা জাতীয় শিক্ষা সমিতি'। তিনি ১৫/১৬ জন মালদার ছাত্র-শিক্ষক কে 'মালদা জাতীয় শিক্ষা সমিতি'র প্রচেষ্টায় উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠান। [২]

মালদার ছাত্র-যুবক এক সঙ্গে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছিল সেদিন। কার্লাইল সার্কুলার জারি স্বত্বেও ছাত্ররা বিদেশি স্কুল,কলেজ ছেড়ে দেয়, উকিল ব্রিটিশ আদালত ত্যাগ করে, ডাক্তারগন ব্রিটিশদের চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। ১৯২৯ সালে স্টেনলি জাকসন যিনি বাংলার গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তিনি বয়কট আন্দোলনের মুখে পরেন মালদা তে এসে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার জন্য অতুল চন্দ্র কুমার কে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ।[৩] পরবর্তী কালে তার প্রতি সম্মান জানাতে একটি বাজারের নামকরণ করা হয় 'অতুল মার্কেট'। মালদার ধোপারা ও বিদেশি বস্ত্র পরিস্কার করতে অস্বীকার করে। এই স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ পাশের দিনাজপুর জেলাতেও গিয়ে আছড়ে পড়েছিল। এই সময় বালুরঘাটের সুরজিত রায় দিনাজপুরে স্বদেশি আন্দোলনে বড় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ARG বিপ্লবী সমিতির সাথেও যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নিতেন।[৪] দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গায় 'ব্রতী সমিতি', 'বন্দেমাতরম', প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দেশের কল্যানে নিয়োজিত হয়। রবি ঠাকুরের নির্দেশে যোগীন্দ্র চক্রবর্তী, রমেশ নিয়োগী, ললিত সেন, মাধব চট্রপাধ্যায় আরও অনেকে 'রাখি বন্ধন উৎসব' উৎযাপন করে। চন্দ্র মোহন জনপ্রিয় করে তোলেন রজনীকান্ত সেনের গান এখানকার মানুষদের কাছে -

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই
দিন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।'[৫]

দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাট, পতিরাম এবং চোপড়াতেও এই আন্দোলনের প্রভাব পরেছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে বিদেশী বস্ত্র ভাণ্ডার পোড়ান হয়েছিল। ছাত্রদের বিছিন্ন করতে পুলিশ সেদিন লাঠি চালিয়েছিল। গ্রেপ্তার হলেন দুর্গা দাস চক্রবর্তী, আদ্যনাথ মিত্র, আনন্দ বিশ্বাস প্রমুখ। ১৯০৬ সালে রায়কত পাড়ার

ক্লাবের ছেলেরা পালন করলো 'জাতীয় মহাবিদ্যালয় দিবস'। রায়কত পাড়া ফুটবল খেলার মাঠে 'বন্দে মাতরম ধ্বনি' উঠেছিল। ১৯০৭ সালে জলপাইগুড়িতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। স্বদেশী শিল্প ও কাপড়ের কল তৈরির চেষ্টা হয়েছিল।[৬] যদিও সেই চেষ্টা সফল হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের আঁচ কোচবিহারে কম অনুভুত হয়েছিল। কারন কোচবিহার ছিল দেশীয় রাজ্য। ১৯১১ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ মারা যাওয়ার পর কোচবিহার রাজ্য স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের ঝোঁক দেখা যায়। মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণও একই নীতি অবলম্বন করেন।[৭] তবু বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব কোচবিহারেও পরেছিল। কোচবিহারে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল। কোচবিহারে এই জন্য তাকে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা বলা হয়। Sedition Committee Report এ স্বদেশী আন্দোলনে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রদের ভূমিকার কথা উল্লেখ আছে। কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার কাশীমোহন ঘোষ ১৯০৫ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তেন। পড়া ছেড়ে তিনি 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' তে নাম লিখিয়ে স্বদেশী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[৮]

দার্জিলিং-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলন এবং তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে বলেন, 'I will unsettle the settle fact i.e. the partition of Bengal.' দার্জিলিং-এ হেলেন লেপচা স্বদেশী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দার্জিলিং-এ প্রচুর সংখ্যক ছাত্র পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেছিল। দার্জিলিং-এর মানুষ বিলাতি লবণ ও চিনি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৯] ১৯২৫ সালে গান্ধীজী দার্জিলিং এ এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সতীশ দাশগুপ্ত, মহাদেব দেশাই। চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে গান্ধীজীর দেখা হয়। গান্ধীজী হিন্দু পাবলিক হলে একটি মহিলা সভাতে যোগদান করেন। রতনলাল ব্রাহ্মণ বাপুকে সভাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করে সেদিনের সভার কাজ এগিয়ে নিয়ে যান।[১০]

বিপ্লবী আন্দোলন ও উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গে প্রথম কোথায় এবং কিভাবে বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধেছিল তা নিবিড় গবেষণার বিষয়। উত্তরবঙ্গের মাটিতে 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর সমিতি', 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', 'সুহৃদ সমিতি', এবং আর ও কিছু বিপ্লবী দলের শাখা ছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্যরা সক্রিয় ভাবে তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাতে উত্তরবঙ্গে আসা যাওয়া করতেন। উত্তরবঙ্গের বিপ্লবীদের জীবনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিবেকানন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিবেকানন্দের বাণী ও পথ তাদের কাছে গুরু বাক্যের মত। আর বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ছিল বিপ্লবীদের কাছে বেদ ও গীতা স্বরূপ। এছাড়া বন্দেমাতরম গান তাদের জীবন উৎসর্গের উৎস। বিপ্লবীরা জেলে থাকার সময় বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের লেখা পড়তেন।

বিপ্লবী আন্দোলনে মালদার জীবনকৃষ্ণ সান্যাল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি মালদা জেলা স্কুলে পড়াকালীন একবার 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাওয়ার অপরাধে তাকে বিদ্যালয় থেকে 'Transfer Certificate' (T.C.) দেওয়া হয়েছিল। তিনি 'অনুশীলন

সমিতি'র সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী হংস গোপাল আগরবালা ও মালদার সর্বশ্রী গ্রামের ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। [১১] ১৯১৬ সালে চট্টগ্রাম জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবীন চন্দ্র বসু বদলি হয়ে মালদা জেলা স্কুলে আসেন। তিনি ব্রিটিশদের কাছে যে সব ছাত্র স্কুলে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কাজে লিপ্ত থাকতো তাদের খবর পাচার করতেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ সালে তিনি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাক্তির ছুরিকাঘাতে মারা যান। এটাই ছিল মালদার বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথম হত্যা। এই ভাবে মালদার স্বদেশ পাকড়াশি যিনি 'রাজাবাজার বোমা কেসের' সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল গোপনে বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্র পাঠান। [১২] সেই সময় মালদার মাটিতে বিপ্লবী আন্দোলনের তেজ তীব্র ছিল।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলাতেও বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পরেছিল। দিনাজপুরের বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনটি পরিবারের নাম উঠে আসে তারা হলেন- ধীরেন ব্যানার্জি ও তার পরিবার, ভালবাসা বসু ও তার পরিবার, জীতেন মুখুটি ও তার পরিবার। শুধু পুরুষই নন দিনাজপুরের নারী যেমন পারুল মুখার্জি, মায়া নাগ এবং সরলাবালা বিপ্লবী আন্দোলনে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৩] ১৯০৭ সালে দিনাজপুরে প্রথম বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হল 'হিলি রেলে বোম মারা'। বালুরঘাটের হৃদয় রায় যিনি 'অনুশীলন সমিতি'র সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি এই অপরাধেও যুক্ত ছিলেন। তিনি 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায়' যুক্ত থাকার কারণে ঋষি অরবিন্দর সাথে কারাগারের একই কুঠুরিতে কাটিয়েছিলেন।[১৪] ১৯২৪ সালে বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাস কে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৫] ২৭শে অক্টোবর ১৯৩৩ সাল ছিল একটি ঐতিহাসিক দিন কারণ ঐদিন 'হিলি রেলে ডাকাতি' হয়েছিল। এর সাথে যারা যুক্ত ছিলেন- প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী (ফরিদপুর), শশধর সরকার (ফুলবাড়ি), অশোক ঘোষ (দিনাজপুর), সত্যব্রত চক্রবর্তী (দিনাজপুর), ঋষিকেশ ভট্টাচার্য (দিনাজপুর), সরোজ বসু (দিনাজপুর), প্রফুল্ল সান্যাল (ফরিদপুর), হরিপদ বসু (ফরিদপুর), সুবোধ দত্ত (কলকাতা) এবং আরও অনেকে। এদের নেতা ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী।[১৬] দিনাজপুরের আরেকজন বিপ্লবী হলেন সুকুমার গুহ যিনি 'যুগান্তর সমিতি' র সাথে যুক্ত ছিলেন।[১৭]

দার্জিলিং জেলাতে 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর সমিতি'র প্রভাব বেশি ছিল। প্রথম দিকে এই জেলাতে বিপ্লবী আন্দোলন বেশি সক্রিয় ছিল না। বিপিন চন্দ্র পাল ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতার আগমনে এই জেলাতে আন্দোলনের নব জোয়ার আসে। ১৯২২ সালে সাবিত্রী দেবী (হেলেন লেপচা) কে তিন মাসের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কারণ তিনি উত্তেজক ভাষণ দিয়েছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছে যে, 'সাবিত্রী দেবী, ই. আহম্মেদ এবং ১২ জন গোর্খা স্বেচ্ছাসেবককে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'[১৮] যদিও পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু বাড়িতে নজরদারিতে রাখা হয়। শিউমঙ্গল সিংহ কংগ্রেস কর্মী হলেও তিনি গোপনে বিপ্লবের জন্য সহায়তা করতেন। 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর সমিতি'র সদস্যরা এই জেলার গোপন আস্তানায় থাকতেন। সুযোগ বুঝে অপারেশন চালাত।[১৯]

১৯১১ সালে বীরেন সরকার যিনি জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। একবার তিনি হত্যা করলেন ব্রিটিশ আধিকারিক D.S.P. শামসুল আলিকে। এই শামসুল আলি

ছিলেন 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্তদের শাস্তি প্রদানকারী অফিসার।[২০] বিচারে বীরেন সরকারের ফাঁসি হয়। এছাড়া জলপাইগুড়ির যেসব বিপ্লবী অগ্নিযুগে উল্লেখ্য ছিলেন তারা হলেন-বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, কিশোরী মোহন মৌলিক, অক্ষয় কুমার মৌলিক, মাখনলাল ভৌমিক প্রমুখ। 'হিলি রেলে ডাকাতি'র ঘটনায় যুক্ত দুর্গাচরণ সান্যালের বাড়ি ছিল জলপাইগুড়িতে। দেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল যে, 'এই ঘটনার গুরত্ব অনেক।' এই জেলায় যাঁরা আন্দোলন কে শক্তিশালী করেছিল তাঁরা হলেন- পঞ্চানন নিয়োগী, সতীশ ঘোষ, পূর্ণ দাস মোক্তার, অন্নদা বিশ্বাস, মহেন্দ্র সরকার, দুর্গা দাস চক্রবর্তী, জীবন রায়, বীরেন দত্তগুপ্ত, উপেন রায়, শচীন মজুমদার, সীতা নাথ প্রামানিক, যোগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, মাধব সান্যাল, অন্নদাচরণ সেন, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ আর ও অনেকে।[২১] ফলে অগ্নিযুগে সহজেই অনুমেয় এই জেলার অবদান ।

বাংলার অগ্নিযুগে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বিপ্লবীদের শরীর চর্চার জন্য আখড়া ছিল কোচবিহারে। চারুচন্দ্রকে দুই বছর কোচবিহারে অন্তরীন করে রাখা হয়। যেহেতু তাঁর সঙ্গে অরবিন্দর একটা যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হত তাই তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই জেলার যাঁরা বিপ্লবী কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন-শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, ডক্টর শিবশঙ্কর আর ও অনেকে। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে F.A. পাশ করেন। অশ্রুমান দাশগুপ্ত ও কোচবিহারের নতুন বাজারে একটি গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই জেলার কয়েকজন বিপ্লবী কর্মকর্তার নাম হল-তনেন্দ্র ঘোষ, অনন্ত কুমার রায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় যারা 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া যারা আড়াল থেকে বিপ্লবী কাজের উৎসাহ দিতেন তারা হলেন, যদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্র নাথ বর্মণ, যোগেন দত্ত, হর চন্দ্র রায়, সুশোভন রায়, নীরদ বর্মণ প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে আমরা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষ চন্দ্র দে'র কথা ভুলতে পারি না কারণ তিনি গুপ্ত সমিতি 'আত্মোন্নতি'-র সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং কোচবিহারে বিপ্লবী কাজ প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[২২] বিপ্লবী যুগে রাজবন্দীদের বক্সা দুর্গে রাখা হত। এই যুগের বহু বিখ্যাত বন্দীদের বক্সা দুর্গে আটক করে রাখা হত। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আনন্দ গোপাল ঘোষ যথার্থ মন্তব্য করেছেন যে, 'এই বন্দী নিবাসে বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপের প্রায় ২৫০ জন বন্দী ছিলেন।'[২৩] ১৯৩৩ সালে যারা এই বন্দী শিবিরের ম্যানেজার ছিলেন-

১) অনুশীলন গ্রুপ: (অফিস), শ্রী সরল কুমার সেন, (কিচেন), শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

২) যুগান্তর গ্রুপ: (অফিস), শ্রী মনোরঞ্জন ধর, (কিচেন), শ্রী সতীশ ঠাকুর,

এছাড়া মলিন চন্দ্র সেন, ভূপাল বোস, নিখিল দাস, রবি সেন, ফণী আচার্য, অনিল দত্ত, প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, জ্ঞান মজুমদার, জিতেন গুপ্ত, বটকৃষ্ণ মিশ্র, অরুণ চন্দ্র গুহ, পূর্ণচন্দ্র দাস, তারক দাস ব্যানার্জী, ডাক্তার ধীরেন ব্যানার্জী, প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠি, রবীন্দ্র নাথ শিকদার, উপেন্দ্র নাথ রায়, নরেন্দ্র নাথ সরকার, নরেন দাস প্রমুখ।[২৪] বক্সায় এই বন্দীদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করা হত যা বিভিন্ন বিপ্লবীর জীবনীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। সি. জি. মেনন তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক সচিব এস এন রায় (I.C.S.) কে চিঠি লিখে জানান সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

'Its basis is thought. It is on that base that it should be mate. It is the only fundamental treatment, incidentally and happily, it is the systematic and reasoned treatment which is the most fruitful for intelligence.'

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের থেকে বিপ্লবী আন্দোলন ও অন্যান্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাংলার উত্তরাংশের ভূমিকার কথা ঐতিহাসিকভাবে তুলে ধরা হয়নি। ব্রিটিশের গোপন নথিতে উল্লেখ আছে যে, 'মেজর সি. জি. মেনন সুপারিশ করছেন বাংলার যুবকদের মন জয় করতে যারা ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত।' এ থেকে একটা বিষয় পরিস্কার যে, ব্রিটিশ সাহেবগণ অনেক সময়ই ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতো এই যুগে। উত্তরবঙ্গের এই ভূমিকার কথা ইতিহাসে স্থান পাওয়া জরুরী অন্তত আগামী প্রজন্ম তথা তরুণ গবেষকদের জন্য। স্বদেশী যুগে সাহিত্যের যে ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গে তার পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিপ্লবীদের চিঠি, ব্যাক্তিগত ডাইরির যথাযত সংরক্ষণ প্রয়োজন। বক্সা দুর্গের সাথে জড়িত জাতীয় অথবা স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাসের প্রকৃত মুল্যায়ন এখনো হয়নি।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Bhowmick, Ramendra Nath, Extremists Movement in North Bengal: A Historical Revisiting (1905-1930 C.E.), Sutradhar Dr. Kartik Chandra, Bhowmick, Ramendra Nath, Revisiting Freedom Movement of India A Study on the Freedom Movement in North Bengal, Abhijit Publications, New Delhi, 2022, p. 187

২. ভট্টাচার্য, মহেশ্বর, স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদা, চৌধুরী, শ্রী চন্দন কান্তি, সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনালেখ্য, ২য় খণ্ড, কোচবিহার, ২০১৪, পৃঃ ১৭৬-১৭৯

৩. Sanyal, Dr. Ratna Roy, Impact on Gandhian Movement on the Subaltern People of North Bengal, Bagchi, Anita, Bhattacharya, Dr. Malay Shankar, Indrajit Chakrabarty (ed.), Tribute to an Icon: Essay in the Memory of Prof. D.P. Sinha, Sagnik Book, Kolkata, 2020, p.125

৪. দাস, সত্য রঞ্জন, উত্তর দিনাজপুর, মুখবন্ধ, চৌধুরী, শ্রী চন্দন কান্তি, সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনালেখ্য, ২য় খণ্ড, কোচবিহার, ২০১৪, পৃঃ, ৪৭

৫. Bhowmick, Ramendra Nath, পূর্বোক্ত, pp.187-188

৬. রায়, দিলীপ কুমার, স্বাধীনতা সংগ্রামে জলপাইগুড়ি জেলা, চাকি, দেবব্রত, সম্পাদিত, উত্তরপ্রসঙ্গ, ২০১০ উত্তরের গন চেতনার গতিপ্রকৃতি, কোচবিহার, পৃঃ, ৫৮-৫৯

৭. রায়, স্বপন কুমার, সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কোচবিহার, চাকি, দেবব্রত, সম্পাদিত, উত্তরপ্রসঙ্গ, ২০১০ উত্তরের গন চেতনার গতিপ্রকৃতি, কোচবিহার, পৃঃ, ১৩-১৬

৮. ঘোষ, আনন্দ গোপাল, ও সরকার, শেখর, কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা, ভট্টাচার্য, অজিতেশ, সম্পাদিত, মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৩৯৬-৯৭, পৃঃ, ৩৯৮

৯. Bhowmick, Ramendra Nath, পূর্বোক্ত, pp.192-194
১০. ঘোষ, সমিত, উত্তরবঙ্গে গান্ধীজী এবং সমকালিন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, পণ্ডিত, ডঃ সুলেখা সম্পাদিত, পূর্ব ভারত মানুষ ও সংস্কৃতি বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জুলাই ২০২৪, ISSN: 8591-2319, পৃঃ, ১৫৪
১১. ভট্টাচার্য, মহেশ্বর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮১-১৮৩
১২. ভট্টাচার্য, মহেশ্বর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২-১৮৫
১৩. সরকার, হীরেন্দ্র নারায়ণ, দিনাজপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভট্টাচার্য, অজিতেশ, সম্পাদিত, মধুপর্ণী শারদ সংখ্যা, বালুরঘাট, ১৪০০ বাংলা সাল, পৃঃ, ২৬
১৪. সরকার, হীরেন্দ্র নারায়ণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬
১৫. দাস, কমলেশ চন্দ্র, ইতিহাসের আলোকে পশ্চিম দিনাজপুর, ভট্টাচার্য, অজিতেশ, সম্পাদিত, মধুপর্ণী পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা, ১৩৯৯ বাংলা সাল, বালুরঘাট, পৃঃ ৪০৮,
১৬. সরকার, হীরেন্দ্র নারায়ণ, পূর্বোক্ত, ২৫
১৭. দাস, সত্যরঞ্জন, বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মজুমদার, সরকার, ডক্টর হিমাংশু কুমার, সম্পাদিত, উত্তরদিনাজপুর জেলার স্মরণীয় যারা, বালুরঘাট, ২০১৩, পৃঃ ৭৩
১৮. অমৃত বাজার পত্রিকা, ৩১শে জানুয়ারী ১৯২২
১৯. Sanyal, Dr. Ratna Roy, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫
২০. দাস, সুকুমার, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, কুমার সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১৯৭
২১. সান্যাল, মুকুলেশ, জলপাইগুড়ি জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৮ বাংলা সাল, পৃঃ ৮৮
২২. রায়, স্বপন কুমার, সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কোচবিহার, চাকি, দেবব্রত, সম্পাদিত, উত্তরের গনচেতনার গতি প্রকৃতি, উত্তর প্রসঙ্গ, কোচবিহার, ২০১০, পৃঃ ১২-১৩
২৩. ঘোষ, আনন্দ গোপাল, জাতীয় মুক্তি তীর্থ ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গ বন্দী শিবির, কর, অরবিন্দ সম্পাদিত, কিরাত ভুমি- জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন, জলপাইগুড়ি, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৫৩
২৪. ঘোষ, আনন্দ গোপাল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৩-৪৫৬

নদীয়া জেলায় স্বদেশী আন্দোলন

মেঘমিত্রা বিশ্বাস
ইতিহাস বিভাগ, চাকদহ কলেজ,
চাকদহ, নদীয়া

সারসংক্ষেপ

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন নদিয়া জেলার জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস নেতা তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ছাত্র, যুবক, কৃষক ও কংগ্রেস কর্মীরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। জাতীয় শিক্ষা, রাখীবন্ধন, পিকেটিং ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন ছিল এই আন্দোলনের মূল কর্মসূচি। কার্লাইল সার্কুলারের মাধ্যমে ছাত্রদের দমন করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, বরং 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'র মাধ্যমে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৯০৬ সালে নবদ্বীপে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন ও কৃষ্ণনগরে প্রতিবাদ সভা আন্দোলনকে আরও গতি দেয়। শান্তিপুরে শিবাজী উৎসবের আয়োজন ও সাহেবদের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ১৯০৭ সালে কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরে স্বদেশী সভা ও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কুষ্ঠিয়ায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে বিলাতী দ্রব্য বয়কট করে। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে নদিয়া থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯০৯ সালে শান্তিপুরে এ. সি. ব্যানার্জির সভাপতিত্বে এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জাতীয়তাবাদী নেতারা জেলার সার্বিক উন্নয়নের উপর জোর দেন। রানাঘাটে স্বদেশী চিনি ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন শুরু হয়। নদিয়ার এই আন্দোলন কেবল ব্রিটিশ বিরোধী ছিল না, বরং সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সূচক শব্দ: বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, কার্লাইল সার্কুলার, অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি, জাতীয় বিদ্যালয়।

মূল প্রবন্ধ

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা প্রদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। নদীয়া জেলা ছিল এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। জেলার ছাত্রসমাজ, যুবক, কৃষক এবং কংগ্রেস নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নদীয়া জেলার স্বদেশী আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, রাখীবন্ধন কর্মসূচি, পিকেটিং, বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্থানীয় শিল্পের বিকাশের উদ্যোগে নদীয়া জেলার সংগ্রাম বাংলার বুকে স্বাধীনতার বীজ বপন করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে নদিয়া জেলায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন কৃষ্ণনগরের উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতা তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বকে সামনে রেখে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যান জেলার

কংগ্রেস কর্মী বেচারাম লাহিড়ী, বক্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্য কুমার গুপ্ত, জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।[১]

স্বদেশী যুগে সমগ্র বাংলা জুড়ে আন্দোলনে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল বিস্ময়কর। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নদীয়া জেলার ছাত্র আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ছাত্ররা ব্রিটিশ সরকারের অনুদান প্রাপ্ত বা পোষিত স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী পিকেটিং, মিছিলে যোগ দেয়। সমগ্র বাংলা জুড়ে ছাত্রদের এই স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের ১১ ও ১২ই আক্টোবর কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও শিকারপুর অঞ্চলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ওই সময় নদীয়া জেলার প্রতিটি প্রতিবাদ সভাতেই সাধারণ মানুষ তথা ছাত্র-যুব সমাজ একসাথে শপথ গ্রহণ করে যে, তারা বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করবে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা শুধুমাত্র শান্তিপুর এবং কৃষ্ণগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই প্রতিবাদ নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া, মেহেরপুর, মাজদিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি অঞ্চলেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্ঠিয়ার মুসলিম জমিদার সৈয়দ রোশন আলি খাঁনের নেতৃত্বে কুষ্ঠিয়া অঞ্চলের মুসলিমরা বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হয়। এর ফলে কুষ্ঠিয়া অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলিমদের মিলিত প্রয়াসে আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে কুষ্ঠিয়া অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য রাখী বন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়।

ছাত্রদের স্বদেশী ভাবধারা দমনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন শিক্ষা সচিব রাসেল কার্লাইল ১৯০৫ সালের ১০ই অক্টোবর বাংলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের কাছে এক গোপন সরকারি নির্দেশনামা পাঠান, যা সাধারণভাবে কার্লাইল সার্কুলার নামে পরিচিত। সেই নির্দেশনামার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল— যে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্ররা স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করবে, তাদের বিরুদ্ধে যেন সেই স্কুল-কলেজ প্রশাসন অবশ্যই কড়া পদক্ষেপ নেয়। কার্লাইল স্কুল-কলেজগুলিকে কড়া বার্তা দিয়ে জানান যে, স্কুল-কলেজের কোনো ছাত্র সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলে তাদের যেন অবিলম্বে স্কলারশিপ এবং ভাতা দ্রুত বন্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যেসব শিক্ষার্থী সরকার-বিরোধী কাজে যুক্ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।[২] কার্লাইল জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে কথা বলেন তারা যাতে প্রয়োজনে জেলার স্কুল-কলেজের প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে কিছু পুলিশ নিয়োগ করতে পারে। এই পুলিশ নিয়োগের প্রধান কারণই হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।[৩] অর্থাৎ বকলমে ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে স্তিমিত করার চেষ্টা।

স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, আবার ছাত্রদেরও উচ্চশিক্ষা বিলম্বিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কার্লাইলের তীব্র দমনমূলক নীতি। এই পরিস্থিতিতে কার্লাইলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলকাতায় এক গণ ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। এর নাম ছিল ‘অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি’। সারা বাংলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সোসাইটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নদীয়া জেলায়ও এই সোসাইটির উদ্যোগে স্কুল-কলেজ থেকে বহিস্কৃত ছাত্রদের নিয়ে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৯১৬ এর পরিসংখ্যান অনুসারে নদীয়ার শান্তিপুরে জেলার প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, যা ছিল নদীয়া জেলার একমাত্র জাতীয় বিদ্যালয়। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে যে সকল ছাত্র সরকারি স্কুল থেকে বহিস্কৃত হয়েছিল তারা পড়াশুনা চালিয়ে রাখার জন্য তাঁরা প্রত্যেকে শান্তিপুরের জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হত।[৪] এই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হত ভারতীয় ইতিহাস, প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্মশাস্ত্র, গণিত এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর। সর্বাঙ্গীণ ভাবে জাতীয়তাবাদী ছাত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল জাতীয় বিদ্যালয়গুলি।

১৯০৬ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি প্রায় ৫০০ কংগ্রেস সমর্থক মিলিত হয়ে নবদ্বীপ অঞ্চলে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। পন্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্নের নেতৃত্বে যুবকেরা নবদ্বীপের পোড়ামাতলা মন্দিরের সামনে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে। নবদ্বীপের এই মহতী সভায় সেদিন আমন্ত্রিত ছিলেন বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জলপথে নবদ্বীপ ঘাটে পৌঁছালে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা স্বদেশী গান গাইতে গাইতে তাঁকে বরণ করে নদীর ঘাট থেকে সভায় নিয়ে আসেন। এই সভায় বক্তব্য রাখেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, আবুল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।[৫] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় জেলাবাসীকে স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। এই সুন্দর পরিবেশ জেলার স্বদেশী আন্দোলনকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।[৬] ১৯০৬ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ১৯০৬ সালের ১২ই মার্চ জাতীয়তাবাদী নেতা তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে কলকাতা প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য নদীয়া থেকে কংগ্রেস কর্মীদের নির্বাচিত করা হয়।[৭]

জাতীয়তাবাদের প্রসারের ধারা মহারাষ্ট্রে যেমন শিবাজী উৎসবের প্রচলন হয়েছিল, তেমনি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নদীয়া জেলায়ও শান্তিপুরের জাতীয়তাবাদী কর্মীরা স্বদেশী ভাবধারাকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিবাজী উৎসব পালন করতে শুরু করেন। শিবাজী উৎসব পালনের ক্ষেত্রে শান্তিপুরের কংগ্রেস কর্মীদের পক্ষ থেকে তৎকালীন কংগ্রেস দলের জাতীয় স্তরের নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে ১৯০৬ সালের ৩০শে জুন আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিপিনচন্দ্র পালের শান্তিপুর আসাকে কেন্দ্র করে ৩০ শে জুন শান্তিপুর স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিপিনচন্দ্র পালকে শান্তিপুর স্টেশনে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের কিছু জাতীয়তাবাদী ছাত্র স্টেশন চত্বরে সমবেত হয়েছিল।[৮] সেই সময় একটি গাড়িতে একসঙ্গে ছিলেন মি. শাল ও মি. হিউইট নামে দু'জন সাহেব, তিনজন মেমসাহেব এবং স্থানীয় মিশনারী স্কুলের শিক্ষিকা মিস সুশীলা বিশ্বাস। গাড়িতে সাহেবদের সাথে শিক্ষিকা সুশীলা বিশ্বাসকে বসে থাকতে দেখে ছাত্ররা মনে করে যে, সাহেবরা সম্ভবত সুশীলা বিশ্বাসকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এরূপ ভাবনার ফলে উপস্থিত ছাত্ররা সাহেবদের ওপর চড়াও হয়। ফলে সাহেবদের সাথে ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। এই ঘটনা সরকারি

তরফে 'সাহেব মারা' ঘটনা নামে পরিচিত।[৯] এই অপ্রীতিকর ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশি প্রহরা জোরদার করা হয়। সাহেবদের মারধর করার ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে মোট ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যার মধ্যে ২২ জন ছাত্র ছিলেন। ৩৩ জনের মধ্যে সাতজন ছাড়া যারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেন, তাদের পুলিশের পক্ষ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যে সাতজন দোষ স্বীকার করেননি, তাদের সাত মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়।[১০] সাহেবদের প্রহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৩০ জুন যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তার মধ্যেই বিপিনচন্দ্র পাল শান্তিপুরে আসেন এবং শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। মারাঠা নেতা শিবাজী এবং মুঘল শাসকদের সম্পর্কে তুলে ধরে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি কোনওভাবেই ইংরেজের কাছে মাথা না নোয়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বয়কটের ওপর জোড় দেন।[১১] ১৯০৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ি বাজারে স্থানীয় নেতা জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বদেশী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন বেচারাম লাহিড়ী, সারদাপ্রসন্ন হালদার প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা। এই সভায় স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা স্থানীয় যুবকদের নিয়ে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। এই স্বেচ্ছাসেবক দলের মূল কার্যাবলী ছিল সাধারণ মানুষকে স্বদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করা, যাতে তারা স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করে এবং বিদেশী দ্রব্য বয়কট করে ব্রিটিশ প্রশাসনকে আর্থিকভাবে দুর্বল করতে পারে।[১২]

১৯০৭ সালের ৭ই আগস্ট বয়কট আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার জন্য স্থানীয় জমিদার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও সকলে যাতে সাধ্যমত শুধুমাত্র স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে, সে বিষয়ে শপথ গ্রহণ করা হয়।[১৩] বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শান্তিপুরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা নদীয়া জেলার ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সভায় ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে স্বদেশী ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, ছাত্র সমাজকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত করে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাদের সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলার ওপরে জোড় দেওয়া হয়, যে স্কুলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করবে।[১৪] এই সভায় গৃহীত কর্মসূচী অনুসারে ১৯০৭ সালের ২৩ শে আগস্ট শান্তিপুরে স্বদেশী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।[১৫] শান্তিপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বেচারাম লাহিড়ী ও স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের অভিভাবকত্বে জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চলত। প্রাথমিক ক্ষেত্রে কুঞ্জবিহারী গোস্বামী ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে স্কুলের তহবিল গড়ে তোলা হয়। প্রথমে শান্তিপুরের এই জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২০০।[১৬]

১৯০৭ এর ১৭ই সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ার হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে দেশত্মবোধক গান গাইতে গাইতে শহর পরিক্রমা করে এবং বিলাতী দ্রব্য বয়কটের শপথ গ্রহণ করে।[১৭] নদীয়া জেলার কংগ্রেস কর্মীরা শুধুমাত্র জেলার মধ্যেই তাদের স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচীকে আবদ্ধ করে রাখেননি। তারা জেলার বিভিন্ন স্তরে, রাজ্য স্তরে এবং সর্বভারতীয় স্তরে তাদের কর্মসূচীকে প্রসারিত করেছিলেন। কংগ্রেসের সুরাট

অধিবেশনের তারিখ ঠিক হয় ১৯০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর। এই অধিবেশনে নদীয়া জেলা থেকে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরের এই সভায় সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানেরর জন্য নদীয়া থেকে মনোনীত হন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল ভাদুড়ী, বিশ্বম্ভর রায়, বসন্ত কুমার লাহিড়ী, জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও জানকীনাথ চক্রবর্তী।[১৮] পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাবনা জেলায়। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য নদীয়া জেলা থেকে মনোনীত হন শরত্রাম লাহিড়ী, চন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরি, গগণচন্দ্র বিশ্বাস, হরিমোহন মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৯০৯ সালের ১১ই নভেম্বর শান্তিপুরের জাতীয় বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারের উদ্দেশ্যে এক সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। অরবিন্দ ঘোষ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জাতীয় স্তরের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শান্তিপুরের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ ই নভেম্বর প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৫০ জন ছিলেন বাইরের এবং ২৫ জন ছিলেন মহিলা। এই সভার প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন এ. সি. ব্যানার্জি। তিনিই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহেশগঞ্জের বিপ্রদাস পালচৌধুরি, যশোহরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, কৃষ্ণনগরের বাবু প্রসন্ন কুমার বোস, যদুভূষণ বাহাদুরি, বাছারাম লাহিড়ী, ফরিদপুরের বাবু মথুরানাথ মৈত্র, শান্তিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হরিদাস রায়, কুষ্টিয়ার উমেশচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ।[১৯] কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ'* গানটি দিয়ে শান্তিপুরের এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। সভাপতি এ.সি. ব্যানার্জি তাঁর সম্পূর্ণ বক্তৃতা ইংরেজিতে দেন। তবে সাধারণ মানুষের বোঝার সুবিধার্থে কংগ্রেস কর্মী অমিয়কুমার সান্যাল সেই বক্তৃতার ব্যাখ্যা বাংলা ভাষায় করে দেন। সভাপতি ভাষণ শেষ হবার পর এই সম্মেলনের দায়িত্বে থাকা নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসার কথা ঘোষণা করেন, যেখানে বাইরের প্রতিনিধি, সাধারণ জনগণ কিংবা সংবাদমাধ্যম কেউই থাকতে পারবে না। বৈঠকটি হবে সম্পূর্ণ গোপন।[২০]

শান্তিপুরের সম্মেলনের সভাপতি এ.সি. ব্যানার্জি তাঁর ভাষণে জেলার কর্মীদের জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত করে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে সকল যুবককে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বড়োলাট লর্ড কার্জন যে ভেদনীতি চালিয়েছেন, তার জন্য বসে বিলাপ করলে সমস্যার সমাধান হবে না। এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হল নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলে সংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরদ্ধে লড়াই শুরু করা। তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে সকলকে বোঝান যে, দশের শক্তি একত্রিত করলে যে বিপুল শক্তি সঞ্চয় হবে, তা দেশমাতার মুক্তির জন্য সফল লড়াই করতে সক্ষম হবে। তিনি যুবকদের শুধুমাত্র বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ারই আহ্বান জানাননি, তিনি জেলার উন্নয়নের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নদীয়া জেলার মাটি উর্বর হলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আর্থিক নীতির ধাক্কায় এই জেলার

বিখ্যাত কুটির শিল্প তাঁত শিল্প ধ্বংসের মুখে, চাষ আবাদও ভগ্নপ্রায়। এই মুহূর্তে জেলার অর্থনীতি শক্তিশালী করার এবং জেলাকে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য জেলার যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে, জেলার মানুষের দারিদ্র্যের কারণ খুঁজে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।[২১]

সভাপতি এ.সি. ব্যানার্জি তাঁর বক্তৃতায় নদীয়া জেলার উন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে দেশমাতৃকার সেবার এক সুন্দর সেতুবন্ধন করেন, যা অত্যন্ত অর্থবহ ছিল। তিনি বলেন, "এই স্বদেশী যুগে দাঁড়িয়ে নিজেদের শুধু স্বদেশী বললেই চলবে না। আদর্শ স্বদেশী যুগ সেটাই হবে, যেখানে দৈনন্দিন প্রত্যেকটি জিনিষের চাহিদা আমাদের জেলা মেটাতে পারবে, সম্পূর্ণভাবে বিদেশী দ্রব্য, বিদেশী আদব-কায়দা, স্কুল-কলেজ বর্জন করতে পারবে। আদর্শ স্বদেশী তখনই আমরা হতে পারবো, যখন আমাদের জেলা আমদের প্রতিটি চাহিদা মেটাতে পারবে। এজন্যই প্রয়োজন জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের বিকাশ। শুধু নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয়, সমষ্টির উন্নয়নের কথা আজ থেকে আমাদের ভাবতে হবে।"[২২] তিনি আরও বলেন, জেলার বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ সমিতি স্থাপন করে স্থানীয় অভাব-অভিযোগের বিষয়গুলি দেখতে হবে। তিনি স্বচ্ছ গ্রাম গঠনের ওপর জোড় দেন, যাতে প্রতিটি গ্রামবাসী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবারে সুশিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার উপর তিনি গুরুত্ব দেন এবং বলেন, প্রতিটি গ্রামের উন্নয়নের মাধ্যমে এই জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে 'বয়কট'-এর ওপর বিশেষ জোড় দেন।[২৩] ব্রিটিশ আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ব্রিটিশদের শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ— প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় বয়কট করে তিনি জাতীয়তাবাদের আদর্শে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় পৌরসভা এবং জেলা বোর্ডগুলিতে বেশি সংখ্যায় ভারতীয় প্রতিনিধি প্রবেশে ওপর বিশেষ জোড় দেন।[২৪]

নদীয়া জেলার এই কংগ্রেস সম্মেলনের খবর সমকালীন ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট আইনজীবী বাবু জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাবু হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মৌলবি আবুল কাশেম, ননীগোপাল লাহিড়ী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বাবু হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ব্রিটিশদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে এবং জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ নীতি চালাচ্ছে। নদীয়া জেলার এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেও নিজেদের ব্যস্ততার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি, এমন কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন এ. রসুল, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্র নাথ রায় প্রমুখ। তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও নদীয়াবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁদের বার্তা পাঠান। এই বার্তার মাধ্যমে সম্মেলনে তাঁদের অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখার জন্য গর্জে ওঠার আহ্বান জানানো হয়।[২৫] এই বার্তা সম্মেলনের সভাপতি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত জনগণের উদ্দ্যেশে পাঠ করে শোনান।

শান্তিপুরের এই কংগ্রেস সম্মেলনে কংগ্রেস কর্মীরা জেলাবাসীকে শুধুমাত্র স্বদেশী

মন্ত্রেই দীক্ষিত করেননি, তারা জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এক রূপরেখাও তৈরি করেন। নদীয়া জেলার জনস্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, শান্তিপুরের তাঁত শিল্প, গ্রামীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা, জাতীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ, শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় গঠন প্রভৃতির ওপর জোড় দেন। এই সম্মেলন থেকেই কংগ্রেস কর্মীরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ জোড় দেন। তাঁরা লোকাল বোর্ড, পৌরসভা ও জেলা বোর্ডগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্বের ওপর বিশে জোড় দেন।[২৬] এসব কর্মদ্যোগ থেকে সমজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তৎকালীন নদীয়া জেলার কংগ্রেস কর্মীরা স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে গঠনমূলক স্বদেশীর কথা বলা হয়েছিল, তাতে নদিয়া জেলার রানাঘাট শহর যথেষ্ট দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ নেয়। রানাঘাটের মল্লিকরা এই জেলার কুমারষাটপুরে দেশীয় পদ্ধতিতে চিনি উৎপাদনের জন্য 'মল্লিক এগ্রিকালচার ফার্ম' গড়ে তোলেন। এই ফার্মকে কেন্দ্র করে প্রচুর আখ উৎপাদন শুরু হয়। ফলে জেলার স্বদেশী কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে থাকে। অন্যদিকে এই ফার্মকে কেন্দ্র করে প্রচুর দেশীয় বেকার যুবক এখানে কৃষি ও শিল্পের কাজে নিযুক্ত হলে কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। রানাঘাটের খাঁ পরিবারের উদ্যোগে দেশীয় পদ্ধতিতে ছুড়ি, কাঁচি প্রভৃতি উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। রানাঘাটের কিছু মুসলিম পরিবার মিলে চুড়ি তৈরি করা শুরু করে। চুড়ি তৈরির কাজ থেকে পরবর্তীকালে সেই পাড়ার নাম হয় 'চুড়ি পাড়া'।[২৭] ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে শান্তিপুরে যে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাতে স্বদেশী দ্রব্য এবং কাপড় বিক্রির বিপণন কেন্দ্র খোলা হয়। এই স্বদেশি বিপণন কেন্দ্রের উপস্থিতি ঐ বছরের দোল উৎসবকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।[২৮] সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই স্বদেশী ভাবধারার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরের এই দোলের মেলা চলাকালীন স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা স্বদেশী গান গেয়ে মেলা চত্বর প্রদক্ষিণ করে।[২৯]

নদীয়া জেলার স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছাত্রসমাজের সাহসিকতা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস, কংগ্রেস নেতাদের সংগঠিত প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের পরিকল্পনা নদীয়ার স্বদেশী আন্দোলনকে এক গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ দেয়। শান্তিপুরের জাতীয় বিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার রাখীবন্ধন, কৃষ্ণনগরের প্রতিবাদ সভা এবং রানাঘাটের কৃষি শিল্প উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, নদীয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে নয়, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটানোর দিকেও সচেতন ছিল। এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্ত ভিত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বিশ্বাস ড. মমিনূর রহমান, নদীয়া জেলায় ভারতের মুক্তি আন্দোলন, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ১৩৭।

২. Order Prohibiting the Use of school Students in Connection with political Meeting, Dated 10th October 1905, File No- 86/05, Home Confidential.

(state Archive).
৩. পূর্বোক্ত.
৪.National Schools Condition of in Bengal during 1916, File No-394/16, Serial No- 95/1916,I.B Report. (state Archive).
৫. Amrita Bazar Patrika, 23rd February, 1906, p. 6.
৬. Amrita Bazar Patrika, 23rd June, 1906, p. 6.
৭. Amrita Bazar Patrika, 14th March, 1906, p. 3.
৮. নাগ কল্যানী, শান্তিপুর প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খন্ড, শান্তিপুর, দিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৩০-৩১।
৯. নাথ পূর্ণেন্দু, সামাজিক শান্তিপুর, প্রতিচ্ছবি প্রকাশন, শান্তিপুর, আগস্ট ২০১০, পৃ. ১৪৪।
১০. ----------, Home Public Proceedings of the Government of India, Sept., 1906, N-5.
১১. নাথ পূর্ণেন্দু, তদেব, পৃ.১৪৪।
১২. Amrita Bazar Patrika, 22nd June, 1906, p. 3.
১৩. Amrita Bazar, 7th August, 1907, p.3.
১৪. Amrita Bazar, 13th August, 1907, p.5.
১৫. Amrita Bazar, 27th August, 1907, p.3.
১৬. পূর্বোক্ত.
১৭. Amrita Bazar, 22nd Oct, 1907, p.7.
১৮. Amrita Bazar, 17th December,1907, p.6.
১৯. Nadia district Conference, File No- 231/09 (1-3), Dated 20th November,1909, Home Department political Confidential. (State archive).
২০. পূর্বোক্ত.
২১. পূর্বোক্ত.
২২. পূর্বোক্ত.
২৩. পূর্বোক্ত.
২৪. পূর্বোক্ত.
২৫. পূর্বোক্ত
২৬. পূর্বোক্ত
২৭. ---------, রানাঘাট স্মরণিকা, ২০১৩। (রানাঘাট পুরসভার সার্ধ শতবর্ষে প্রকাশিত) ।
২৮. Amrita Bazar Patrika, 5thMarch, 1907, p. 3.
২৯. পূর্বোক্ত.

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ভাবনায় চতুর্বিধ যোগ: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

ড. অমিত কুমার বটব্যাল
দর্শন বিভাগ
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (স্বশাসিত)

সারসংক্ষেপ

প্রাত্যহিক ঘটনায় জর্জরিত হয়ে মানুষের মধ্যে যখন একটা হাঁপিয়ে ওঠার ভাব চলে আসে, অন্তরে তীব্র ইচ্ছা হয় সংসারের চাওয়া পাওয়ার ঊর্দ্ধে চিরস্থায়ী শান্তি পাবার তখনই ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জিজ্ঞেসা শুরু হয়। এই জিজ্ঞাসার বীজ ক্রমে নানান ফুল - ফলে পূর্ণ গাছের আকার নিয়েছে, আলাদা আলাদা ধর্মের রূপ নিয়েছে দেশকালের ব্যবধানে। রচিত হয়েছে অসংখ্য বই, যেখানে ধর্মের আচার - অনুষ্ঠান, দর্শন প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই নানা মত ও পথের বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক দেশ থেকে আরেক দেশে, সামাজিক আচার ও শিক্ষা ভেদে, এক একটি ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। যেমন সকল মানুষের জন্য এক জামা হতে পারে না, শারীরিক আকৃতি ও রুচি পৃথক হওয়ার কারণে তারা আলাদা আলাদা জমা পরে-সেই রকম একটিই ধর্ম জগতের সব মানুষ অনুসরণ করে না। শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে যেরকম বলা হয়েছে -**রুচীনাং বৈচিত্র্যাং ঋজুকুটিলনানাপ্তহজুষাং** [১] রুচির বিচিত্রতার কারণে মানুষের অনুসন্ধান, সরল ও বক্র, নানা পথ অবলম্বন করে।

সূচক শব্দ: যোগ, চিত্ত, চিত্তবৃত্তি, সমাধি, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার

মূল প্রবন্ধ

যোগ দর্শন হল প্রাচীন ভারতের অন্যতম মৌলিক দর্শন, যা মন ও শরীরের সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-উন্নয়নের মাধ্যমে মুক্তি (মোক্ষ) অর্জনের পথ নির্দেশ করে। ‘যোগ’ শব্দটি সংস্কৃত ধাতু "যুজ্" থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ ‘সংযোগ’ বা ‘ঐক্য’। এটি প্রধানত আত্মা (পুরুষ) ও পরমাত্মার (ঈশ্বর বা ঈশ্বরস্বরূপ চেতন) মধ্যে যোগ বা সংহতির কথা বলে। যোগ দর্শনের মূলগ্রন্থ হল পতঞ্জলি রচিত যোগসূত্র, যেখানে যোগকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এইভাবে—”যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", অর্থাৎ চিত্তের সমস্ত বৃত্তির নিবৃত্তিই যোগ।

যোগ দর্শন প্রধানত আটটি অঙ্গ বা অষ্টাঙ্গ যোগ-এর উপর ভিত্তি করে গঠিত: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই অঙ্গগুলো মিলে এক ব্যক্তি তার দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে এবং অবশেষে জীবন্মুক্তি লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যোগ দর্শনের একজন আধুনিক ব্যাখ্যাতা, যিনি এই প্রাচীন দর্শনকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সামনে বিজ্ঞানসম্মত ও মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় উপস্থাপন

করেন। তাঁর মতে, যোগ কোন বিশেষ ধর্ম নয়, বরং একটি সার্বজনীন বিজ্ঞান যা মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়ক। তিনি রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—এই চার প্রকার যোগের কথা বলেন, যা মানব জীবনের চারটি স্বতন্ত্র প্রবণতার (মনন, প্রেম, কর্ম, মনঃসংযোগ) উপযুক্ত পথ হিসেবে বিবেচিত।বিশেষ করে রাজযোগ-এর প্রতি বিবেকানন্দের গুরুত্ব ছিল বেশি, যাকে তিনি ‘যোগের রাজপথ’ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি পতঞ্জলির যোগসূত্রের আধারে রাজযোগকে মন নিয়ন্ত্রণের একটি বিজ্ঞান হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন:

> “Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal.”
>
> — Swami Vivekananda

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে যোগ চর্চার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ঘটে, চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং একসময় মানুষ তার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তাঁর দৃষ্টিতে যোগ ছিল আত্মোন্নতির পথ, যা ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে এক সার্বজনীন মানবধর্ম হয়ে উঠতে পারে।

যোগের স্বরূপ

যোগ দর্শনের মূল বিষয় হল যোগ। সমস্ত শাস্ত্রই যোগ কথায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থে এমন কোনো কথা বা প্রসঙ্গ নেই যা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগ বা যোগ সাধনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, “যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ”। (১।২) অর্থত চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই সূত্রে চারটি শব্দ আছে - যোগ, চিত্ত, বৃত্তি ও নিরোধ। সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে গেলে আগে এদের অর্থ জানা আবশ্যক।

‘যোগ’ শব্দটি ‘যুজ’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যার একটি অর্থ হল ‘সংযোগ বা মিলিত হওয়া’, অন্য অর্থটি হল ‘সমাধি’। এখানে দ্বিতীয় অর্থে যুজ্ ধাতুর প্রয়োগ হয়েছে। তাই যোগ অর্থে সমাধি বুঝতে হবে। চিত্ত বলতে প্রকৃতির সাত্ত্বিক পরিনাম, যার ওপর নাম হল বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিতে যে সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতন অসংখ্য চিন্তাধারা সব সময় উত্থান-পতন ঘটছে তারই নাম হল বৃত্তি। নিরোধ বলতে অবস্থা বিশেষকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ যেরূপ অবস্থা বিশেষে চিত্তবৃত্তিসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়ে যায়, সেই অবস্থা বিশেষের নাম হল যোগ।

এই প্রকার যোগ বা সমাধি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রজ্ঞাত, অপরটি হল অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তের একাগ্রতাবস্থায় হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, আর পূর্ণ নিরোধাবস্থায় হয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের নিখিল বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না, ধ্যেয়রূপ অবলম্বিত বিষয়ে তখন চিত্তের চিন্তাবৃত্তি বর্তমান থাকে, আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তাও থাকে না, সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হয়ে যায়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সাধনার জন্য যোগীকে যথাক্রমে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা - এই তিনপ্রকার বিষয় অবলম্বন করতে হয়। যোগী একাগ্রতা শিক্ষার জন্য প্রথমে স্থূল শব্দাদি বিষয় অবলম্বন করেন। তারপর গ্রহীতাকে অবলম্বন করে একাগ্রতা সাধনে অগ্রসর হন। একাগ্রতাকালে চিত্তের অবস্থা ঠিক বিশুদ্ধ স্ফটিকের মতন হয়। স্ফটিক যেমন সামনের বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে নিজেও সেইরূপ

হয়ে যায়, বিষয়ান্তর-চিন্তাশূন্য নির্মল চিত্তও ঠিক সেইরূপ উল্লিখিত গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতাকে নিরন্তর চিন্তা করতে করতে সেই সেই বিষয়াকার গ্রহণ করে নিজেও যেন সেই স্বরূপ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তখন ধ্যেয় বিষয় ছাড়া চিত্তের আর কোন পৃথক সত্তা প্রতীত হয় না, চিত্ত তখন বিষয়াকারে পরিচিত হয়। চিত্তের এইভাবে অবলম্বিত বিষয়াকারে অনুরঞ্জিত হওয়া - তা যোগশাস্ত্রে সমাপত্তি নামে অভিহিত। সমাপত্তি কেবল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চিত্তেরই স্বাভাবিক অবস্থা বা ধর্ম। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারভাগে বিভক্ত - সবিতর্ক, সবিচার, আনন্দ ও সাস্মিত। এর মধ্যে বাইরের জগতের কোন একটি স্থূল বিষয় অবলম্বন করে সেই বিষয়ে চিত্তের যে একাগ্রতা অনুশীলন, তাঁর নাম হল সবিতর্ক সমাধি। তাঁর থেকে সূক্ষ্ম তন্মাত্র প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে যে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ তজ্জনিত সাক্ষাৎকার, তাঁর নাম হল সবিচার সমাধি। তাঁর চেয়েও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়রূপ বিষয় অবলম্বনে যে চিত্রের একাগ্রতা তাঁর নাম সানন্দ সমাধি। আর বুদ্ধির সাথে পুরুষের যে অভিন্নতা ভ্রান্তিরূপ অস্মিতা, তা অবলম্বন করে সেই বিষয়ে চিত্তের যে একাগ্রতা, তাঁর নাম সাস্মিত সমাধি। এইভাবে এই চার প্রকার সমাধি অবলম্বন করেী বস্তুর তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হওয়া দরকার। যতক্ষণ পূর্ববর্তী তত্ত্বের প্রত্যক্ষ না হয় ততক্ষণ তা ত্যাগ করে পরবর্তী বিষয় অবলম্বন করতে নেই।

চিত্তের যে রূপ অবস্থায় ধ্যেয় বিষয়টি প্রকৃষ্টরূপে বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ চিত্তাবস্থাই সম্প্রজ্ঞাত শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ের প্রাধান্য থাকলেও ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা এই তিনটিই চিন্তাপথে পড়ে, তাই এই অবস্থায় জ্ঞানকে ঠিক তত্ত্বগ্রাহক বলতে পারা যায় না এবং তাঁর দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষেরও সম্ভাবনা ঘটেনা। যোগীকে সাধন পথে আরও অগ্রসর হতে হয়, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়। এইজন্য সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও তাঁর উপায় নির্দেশের জন্য বলা হয়েছে বিরাম - এর অর্থ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে চিন্তার পরিত্যাগ অথবা নিখিল চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। এর প্রত্যয় অর্থ কারণ তাঁর বৈরাগ্য। অভ্যাস অর্থ একই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন। পূর্ব অর্থ পূর্ববর্তী কারণ। সংস্কার শেষ অর্থ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত জ্ঞান সংস্কার মাত্র যে অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে সেই অবস্থা বিশেষ। অন্য অর্থ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সকল কথার সম্মিলিত অর্থ হল এই যে বিরামের কারণীভূত পর বৈরাগ্যের অভ্যাস হতে যার জন্ম এবং যাতে কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কোনরকম চিত্তবৃত্তি থাকে না তাই হল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি থেকে ভিন্ন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন চিত্তমধ্যে ধ্যেয় বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তা থাকে ও প্রতিনিয়ত অনুরূপ সংস্কার ধারা উৎপাদন করতে থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সেরকম কোনো বৃত্তি থাকে না। হৃদয়বৃত্তি পুনঃ পুনঃ বোরাগ্যের অনুশীলন করতে করতে সমস্ত চিন্তাবৃত্তিই নিরুদ্ধ হয়ে যায় তখন কেবলমাত্র পূর্বের সংস্কার থাকে। যদিও তা কোনো সংস্কার উৎপন্ন করে না, পরে বিলীন হয়ে যায়। এইজন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নিরোধ সমাধি ও নির্বীজ সমাধি নামে অভিহিত করা হয়।

যোগীর চিত্তের তারতম্য অনুসারে নিরোধ সমাধিকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় ভব প্রত্যয় ও উপায় প্রত্যয়। এর মধ্যে যাঁরা প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি অনাত্মা বস্তুকে আত্মা মনে করে সেই বিষয়ে নিরোধ সমাধি সাধনা করেন তাদের সমাধিতে

ভ্রান্তি থাকায় তাঁরা কৈবল্য লাভে কখনও সমর্থ হন না। নির্ধারিত সময়ের পরে তাঁরা পুনরায় সংসারে প্রবেশ করেন। তাদের সমাধি অবিদ্যা পূর্বক হওয়ায় তা ভব প্রত্যয় নামে অভিহিত হয়। আর অপরদিকে যারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়ভূর শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও যোগাঙ্গ সমাধির সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করেন, তাদের সমাধির নাম উপায় প্রত্যয়। কারণ তাঁদের অবলম্বিত সাধনগুলি বস্তুতঃ যোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। তবে উল্লেখযোগ্য যে সমাধি যোগ ভব প্রত্যয়ই হোক, আর উপায় প্রত্যয়ই হোক, সর্বত্রই চিত্তবৃত্তির নিরোধ থাকা আবশ্যক। কারণ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এটাই সমাধির সাধারণ লক্ষণ। এই লক্ষণের বাইরে কোনো যোগ থাকতে পারে না। তাই চিত্তবৃত্তি নিরোধই সব যোগের জীবন। দীর্ঘকালব্যাপী দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা এই বৃত্তি নিরোধ যখন পূর্ণতা পায়, তখন চিত্তভূমিতে আর কোনো বৃত্তি উদ্ভূত হয় না, পূর্ণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিএ আবির্ভাব হয়। এই অবস্থায় পুরুষ (আত্মা) স্বরূপে অবস্থান করলে কৈবল্য প্রাপ্তি বা মুক্তি লাভ ঘটে। এই অবস্থায় জীবের সর্ব দুঃখের অবসান হয়।

সংস্কৃত 'যোগ' শব্দটির একাধিক অর্থ বর্তমান। তবে যোগের আক্ষরিক অর্থ 'যুক্ত হওয়া' বা 'সংযোগ'। আবার 'যোগ' বলতে 'সংযোগ' এবং একপ্রকার তপশ্চর্যা দুই-ই বোঝায়। স্বামী বিবেকানন্দ 'যোগ' শব্দটির মধ্য দিয়ে এই দুই প্রকার বিষয়কেই বুঝিয়েছেন। বিধি-নিষেধ অনুসারে তপস্যা মুক্তিকামী ব্যক্তিকে ঐক্য ও মিলনের অনুভূতি দান করে। বিধি অনুসারে তপশ্চর্যা জ্ঞান সম্বন্ধয়ী বা ভক্তি সম্বন্ধয়ী বা কর্ম সম্বন্ধয়ী হতে পারে, আবার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধয়ীও হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি সমুচ্চয়কেই সমর্থন করেছিলেন। তবে তাঁর মতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, সমন্বিত যোগ একপ্রকারের নয়, বরং জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ এগুলিকে তিনি অমরত্ব উপলব্ধির এক-একটি স্বতন্ত্র পথ বলে দেখিয়েছিলেন। এই পথগুলি একটি অন্যটির পরিপূরক

সার্বজনীন ধর্ম ও চতুর্বিধ যোগ

মানুষের মনে এই জিজ্ঞিসা বারেবারেই জেগেছে - পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে কি কোন সাধারণ সূত্র রয়েছে? এমন কোন সাধারণ ধর্মের কি চিন্তা করা যায় - বিভিন্ন ধর্মগুলি যার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ? প্রত্যেকটি ধর্মের স্বাতন্ত্র্য অটুট রেখেও কি তাদের আরো বড় পরিধির কোন বিশ্বজনীন তত্ত্বের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ হিসেবে গণয় করা যায়?

সার্বজনীন ধর্মের খোঁজ করা হয়েছে বারে বারে। যখনই বিভিন্ন ধর্মগুলির পার্থক্য জন্ম দিয়েছে হিংসা ও শত্রুতার, তখনই তাদের মধ্যে শান্তির সাধারণ সূত্রের অন্বেষণ চলেছে, একটি উদার ধর্মতত্ত্বের আলিঙ্গনে সকল যুযুধমান গোষ্ঠীকে টেনে নেবার চেষ্টা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর সার্বজনীন ধর্মের ধারণাকে বিবৃত করেছেন, যার বিশেষ উল্লেখ মেলে তাঁর একটি বক্তৃতায়।[২] বিভিন্ন ধর্মমার্গ মানুষের প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের ওপরে জোর দিয়েছে। কোনটিতে ভক্তি, কোনটিতে বিচার, কোনটিতে ধ্যান, আবার কোনটিতে কর্মের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষের অন্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য সে নিবেদন করে ভগবানকে - তা যেন বিচিত্র ধারায়, তার প্রকৃতি অনুযায়ী বিয়ে

চলেছে। এই বিভিন্ন প্রধান ধারাগুলি - ভক্তি, বিচার, ধ্যান, কর্ম - এইগুলি স্বামীজী গ্রথিত করেছেন একটি সার্বজনীন ধর্মে। পৃথিবীতে নামাঙ্কিত বিভিন্ন ধর্ম - যথা হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ - যেন এই সার্বজনীন কাঠামোর এক একটি বিশেষ রূপ। ভক্তির প্রাধান্য যেখানে সেটিকে বলা হয় ভক্তিযোগ, বিচার যেখানে প্রধান উপায় তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ, ধ্যান যেখানে প্রধান সেটি রাজযোগ এবং কর্ম যেখানে প্রধান মাধ্যম, সেটি কর্মযোগ।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, জগতের সব কটি প্রধান কর্মের উদ্ভব হয়েছিল এশিয়া মহাদেশে। বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দু, ইসলাম - এই সবকটি ধর্মের প্রবর্তক বা সাধকরাই এশিয়ার কোনো একটি দেশে সর্বপ্রথম প্রচার করেছিলেন। বিশেষত, ভারতবর্ষ ধর্মের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পাশ্চাত্যে মানুষ তাদের বুদ্ধিকে নিয়োগ করেছে বর্হিবিশ্বের অনুসন্ধানে, সেখানে করেছে ব্যতিক্রমী সব আবিষ্কার। ভারতে মানুষ তাদের শক্তি নিয়োগ করেছে মনের সূক্ষ্মতম চিন্তার বিশ্লেষণে, যার ফলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য দর্শন সম্প্রদায়, ধর্ম ও দর্শনকে ঘিরে চলেছে গভীর সাধনা ও আলোচনা। এই চর্চাই আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দের চারটি যোগের ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবিভাজনে পূর্ণতা লাভ করেছে।

স্বামীজী, চারটি যোগের বিস্তার করে, যাবতীয় ধর্মের জন্য একটি সাধারণ পরিকাঠামো তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। খ্রিষ্টান, ইসলাম, হিন্দু প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্মেতেই ভক্তিমার্গকে বহু মানুষ অনুসরণ করে। আবার খ্রিষ্টান ধর্ম দরিদ্র মানুষের সেবার কথা বলেছে বৌদ্ধধর্ম বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সকল মানুষের হিতের জন্য সকল মানুষের সুখের জন্য - এই বাণী উদ্গাতা হিন্দু ধর্মের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতা নিঃস্বার্থ কাজ করতে বলেছে; অতএব এই সবকটিই ধর্মই কর্মযোগের পৃথক করে ভাবতে শেখায়। নিত্য, শাশ্বত সত্যকে, অনিত্য বস্তু থেকে পৃথক করে ভাবতে শেখায়। বিচারের দ্বারা, মানসিক স্তরে, এই পৃথকীকরণ, ক্রমে কর্মেতেও প্রতিফলিত হয়। জ্ঞানযোগের যা মূল অবলম্বন, বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ, তা অনুসরণ করেছে সব ধর্মমতই। একইভাবে, মনসংযমের কথা সাধনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোন সাধনাই ফলপ্রসূ হতে পারে না। রাজযোগ এই মনের সংযমের নানাবিধ উপায় আলোচনা করেছে।

কর্মযোগঃ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মযোগ নামক গ্রন্থে বলেছেন - সকলেই তো আমরা জগতে কাজ করে চলেছি, তাই কর্মের তত্ত্ব সম্পর্কে আর নতুন করে কি জানার রয়েছে।[৩] ভগবদগীতায় বিস্তারিতভাবে কর্মযোগের তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। গীতা গ্রন্থটির পটভূমিকা বড় অদ্ভুত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে, পাণ্ডব ও কৌরবরা সমবেত হয়েছেন মরণপণ যুদ্ধ করার জন্য। তদানীন্তন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি অঙ্গীকার করেছেন যে এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। অর্জুন পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি হয়ে যুদ্ধে যেন দ্রস্টার ভূমিকা নিয়েছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে, সমবেত যোদ্ধাদের অর্জুন একবার দেখে নিতে চাইলেন। সেই অনুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথ দুই যুযুবধান পক্ষের মাঝখানে নিয়ে গেলেন, অর্জুন চোখ মেলে সমবেত রথী-মহারথীদের দেখলেন। সারা ভারতের ক্ষত্রিয়বর্গ, রাজ্যের কর্তৃত্বের

প্রশ্নে, পরস্পরকে হত্যা করার জন্য হাজির হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে, এই সত্য কঠিনভাবে অর্জুনের চোখে ধরা পড়ল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন যে তিনি আর যুদ্ধ করবেন না; আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের হত্যা করে রাজত্ব হয় করাকে রক্তাপ্লুত খাদ্য গ্রহণের সমতুল্য বলে বর্ণনা করলেন। এইভাবে নানা কথায় যুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরে মহাবীর অর্জুন রথে বসে পড়লেন, দিশেহারা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন তাঁকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে।

এরপরেই শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারণ করেন গীতার সেই মহান উপদেশমালা। তিরস্কার করে তিনি বলেন যে, অর্জুনের এই ক্লীবের মত আচরণ কোন ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নয়। সারা ভারতবর্ষেই অর্জুনের মহান যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি রয়েছে - তাছাড়া ক্ষয়িত্ররা ন্যায়ের প্রতিস্থাপক; এই ধরনের যুদ্ধকে তারা স্বর্গের দ্বার খুলে যাবার সঙ্গে তুলনা করে - কেন অর্জুন যুদ্ধ করতে নামবেন না।

কিন্তু এই এত মানুষের হত্যা, যারা অনেকে আবার অর্জুনের আত্মীয়ও বটে, কি পাপ নয়? এই আশঙ্কার কথা শুনেও, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে বলেছেন। যুদ্ধের জিত বা হার সবই যেন তিনি ভগবানকে অর্পণ করে দেন। যে কোনো কাজ মানুষের অন্তরে স্মৃতি, সংস্কার রেখে দিয়ে যায়। এগুলি যেন পরবর্তী কর্মের বীজ। এইভাবে এক জীবন থেকে পর জীবনে, কর্মের পর কর্ম আমরা করে চলি। কিন্তু এই কর্ম ও তার ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিলে, তার আর ভবিষ্যৎ কর্ম উৎপাদনের শক্তি থাকে না-কর্ম তখন কর্মযোগ-এ পরিণত হয়। এমনিতে, কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি যেন আমাদের চর্তুদিকে আরো কর্মের বেড়ি জড়িয়ে দেয়। অথচ, নিরাসক্ত হয়ে কাজ করে গেলে, এই কর্মই তখন ঈশ্বরের পথে মানুষকে নিয়ে যায়, কর্মের বাঁধন তখন ভেঙে যায়, ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে জানার তীব্র ইচ্ছা মনে জেগে ওঠে, শুরু হয় ধর্ম সমন্ধে প্রকৃত জিজ্ঞাসা। শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে -

প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্মাণি উৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ।
কৃতার্থানি অস্তম্ আয়ান্তি প্রাবৃজন্তে ঘনা ইব।।[৪]

বর্ষার অন্তে মেঘ যেমন মিলিয়ে যায়, সেইভাবে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে গেলে, ঈশ্বরমুখী হয়ে গেলে, কর্মের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, কর্ম তখন বিলীন হয়ে যায়। আশ্চর্য জগতের কোনো প্রাণীই এক মুহূর্তও কাজ না করে থাকতে পারে না।[৫] আর কিছু না হোক, সব জীবিত প্রাণীকে প্রশ্বাস গ্রহনরূপ কাজ না করে যেতে হবে। এছাড়া, আমরা সর্বদাই মনে মনে, সচেতন বা অচেতনভাবে, কর্মের চিন্তা করে চলেছি। এই মানসিক পরিকল্পনাই পরবর্তীকালে কায়িক কর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই নিরন্তর কর্মের স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করা - এইটিই কর্মযোগ - ঈশ্বর লাভের একটি পথ।

জ্ঞানযোগঃ জ্ঞানযোগের পথ বিচারের পথ। মিথ্যে ও সত্যের মিশেল থেকে ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে সত্য বস্তুকে তুলে আনতে হবে। এই জন্য দরকার শুদ্ধ, পবিত্র বুদ্ধি। উচ্চ তত্ত্বের চিন্তা বারেবারে করলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। এই গভীর তত্ত্ব আমাদের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে বলছে - আমরা স্বরূপত আত্মা - পবিত্র, অনন্ত,

অনাদি, আসক্তিরোহিত। শরীর, মন, চোখ ও কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এই মহাসমুদ্রের মধ্যে যেন এক একটি দ্বীপ তৈরি করেছে - সৃষ্টি হয়েছে এক একটি জীবাত্মা। ইন্ডিয়াদির মালিন্য, সীমাবদ্ধতা যেন পরমাত্মা থেকে জীবাত্মাকে আলাদা করে রাখে - আমরা নিজেদের সীমিত ও দুর্বল বলে মনে করছি। ব্যক্তি হিসেবে আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো পরিবারে জন্মেছি, বিদ্যা - বুদ্ধিতে আমাদের পরস্পরের পার্থক্য রয়েছে, দৈহিক আকৃতিতেও রয়েছে প্রভেদ। কিন্তু বেদান্তের শিখরচুম্বি তত্ত্ব এই প্রভেদগুলিকে 'ব্যবহারিক সত্য' বলেছে, পারমার্থিক স্তরে আমরা সকলেই সেই এক আত্মা। জীবাত্মা আসলে পরমাত্মারই প্রতিফলন।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। মধ্যাহ্ন আকাশে সূর্য উঠেছে, আর আমাদের সামনে সাতটি ঘড়ায় জল রাখা হয়েছে। আকাশের সূর্য প্রতিফলিত হয়েছে নীচের সাতটি ঘড়াতে, ভ্রম হচ্ছে বুঝি বা সেই সবগুলিই আলাদা আলাদা। আকাশের সূর্য যেন বিম্ব, আর ঘড়ার সূর্যগুলি যেন প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্বগুলি যেন জীবাত্মা, আকাশের সূর্য যেন পরমাত্মা। এইবারে একটা একটা করে বেড়াকে ভেঙে ফেলা হল - যেন এক একটি শরীরের মৃত্যু। সবকটি ঘড়া ভেঙে দিলেও আকাশের সূর্য সেইভাবে জাজ্বল্যমান রয়ে যায়।

কি লাভ হবে এই আপাত-কঠিন তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করে? স্বামী বিবেকান্দ বলেছেন যে, মানুষকে তাঁর স্বভাবগত পবিত্রতার কথা শোনালে সে তাঁর ভুলে-যাওয়া সত্তাকে মনে করতে পারে, তাঁর অন্তরে জেগে ওঠে বিরাট শক্তি। স্বামীজী চিকাগো ধর্মসভায় এই আত্মার মহিমার কথা শুনেয়েছিলেন। শ্রোতাদের আহ্বান করে বলেছিলেন যে, তারা অমৃতের উত্তরাধিকারী। তাদের অন্তরে সিংহের শক্তি রয়েছে, তাঁর 'পাপী' এই নেতিবাচক চিন্তাকে দূরে ফেলে দিতে হবে। মানুষের মধ্যে তখন দুর্জয় সাহস জেগে ওঠে; যে সাহসের উৎস অন্তরে, যা কোনো বাহ্য অবলম্বনের ওপরে নির্ভরশীল নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'জ্ঞানযোগ' বক্তৃতামালায় একটি গল্প শোনাচ্ছেন - সম্রাট আলোকজান্ডার ভারতবর্ষে এসেছেন, মহারাজ পুরুর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। তাঁর শিক্ষাগুরু বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল; তিনি জেনেছেন ভারতীয় মুনি, ঋষি, পন্ডিতদের কথা। তাই ভারতের একজন মুনিকে তিনি দেখতে চান। অবশেষে, তাঁর ইচ্ছা সফল হল - গভীর অরণ্যে, গাছপালার মাঝখানে, এক মুনির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। মুনির সঙ্গে কথা বলে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন, তা৬কে নিজের দেশে, গ্রীসে নিয়ে যেতে চান। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এই মুনি রাজী হন না। আলোকজান্ডার এরপর রুষ্ট হন - মুনি কি জানেন না যে তিনি বিশ্বজয়ী বীর সম্রাট, ইচ্ছা মাত্রেই মুনির ধড় থেকে মুন্ডু আলাদা করে দিতে পারেন, তাঁকে হত্যা করতে পারেন। সম্রাটের এই আস্ফালন শুনে মুনি হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন - 'সম্রাট, এর চেয়ে বড় আহাম্মকের মত কথা তুমি কখনো বলোনি। আমি সেই সর্বত্র বিরাজমান আত্মা, যাকে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না, বায়ু যাকে শুষ্ক করতে পারে না, আগুন যাকে পোড়াতে পারে না।[৬]

যথার্থ আত্মজ্ঞান মানুষের মধ্যে এই নির্ভীকতা জাগিয়ে তোলে - অন্তরের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে আর বাইরের বস্তুকে ভয় পায় না। গীতাতে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন -

অচ্ছেদ্যোহয়ম্, অদাহ্যোহয়ম্ অক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।[৭]

(এই আত্মাকে) কোনো কিছু ছেদ দিয়ে ছেদন করা যায় না, কোনো কিছু দিয়ে দহন করা যায় না, কোনো কিছু দিয়ে ক্লেদাক্ত করা যায় না, কোনো কিছু দিয়ে শোষণ করা যায় না।

মানুষ তাদের অন্তরে এই অসীম আনন্দের সন্ধান পাচ্ছে না কেন? বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্বের প্রবর্তকেরা বলেছেন যে এর কারণ 'অজ্ঞান', 'অবিদ্যা', বা 'মায়া', যা একটা আস্তরণস্বরূপ থাকার কারণে আমরা অন্তরের ঐশ্বর্যের সন্ধান পাচ্ছি না। কবে শুরু হয়েছীই অজ্ঞান, কবে অদ্বৈত তত্ত্বের প্রবর্তকেরা বলেছেন যে এর কারণ 'অজ্ঞান', 'অবিদ্যা', বা 'মায়া', যা একটা আস্তরণস্বরূপ থাকার কারণে আমরা অন্তরের ঐশ্বর্যের সন্ধান পাচ্ছি না। কবে শুরু হয়েছীই অজ্ঞান, কবে পরমাত্মা এই দেশ-কাল-নিমিত্ত (Time-Space-Causation) এর আওতায় পড়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেছেন, সে প্রশ্নের মীমাংসা করা যাবে না। আসলে 'কবে?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেই সময়ের ধারণা এসে পড়ে, আর আত্মা হচ্ছে 'অবাঙ্মনসগোচরম্'- বাক্য ও মনের (ও ফলে সময়েরও) অতীত। অজ্ঞানের নাশ হয়ে আত্মজ্ঞানের উদয়, এইটা বোঝাতে দার্শনিকেরা কখনো 'প্রাক্ অভাব'ও 'ধ্বংসাভাব' এই আলোচনা এনেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় - একটি ফাঁকা জায়গা বহুদিন পড়ে রয়েছে, সেখানে তৈরি হল একটা বাড়ি। অপর একটি জায়গায় আগে একটা কুঁড়ে ঘর ছিল, সেইটা ভেঙ্গে, তাঁর জায়গায় প্রস্তুত হল এক অট্টালিকা। প্রথমটির ক্ষেত্রে, ফাঁকা জায়গা থাকায় সেখানে প্রাক্ অভাব ছিল; সেইটা ভেঙ্গে দিতে এলো শূণ্যতা - ধ্বংস হয়ে অভাবের সৃষ্টি হল, সেই অভাব পূর্ণ করল এক অট্টালিকা।

এই আত্মজ্ঞান কি করে আসবে? নিষ্কাম কর্মের সাহায্যে মনের এই অজ্ঞানের পর্দা ফিকে হয়ে যায়, জ্ঞান সূর্য তখনই প্রকাশিত হয়। বহু জন্ম ধরে মানুষ ভাল-মন্দ নানা কর্ম করে চলেছে, আর এই কর্মগুলি তাঁকে এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে ঠেলে নিয়ে চলেছে। অবশেষে, এক সময়, সে নিজের জন্য কর্ম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন ইচ্ছা হয় পরার্থে কাজ করতে। স্বার্থহীন কর্ম ক্রমে নিষ্কাম কর্মে পরিণত হয়।

এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নিঃস্বার্থ কাজের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে। এই উচ্চতম আত্মতত্ত্ব প্রথমে শুনতে হবে, পরে মনের গভীরে চিন্তা করতে হবে, তারপরে একান্ত চিত্ত হয়ে ধ্যান করে আত্মস্থ করে নিতে হবে। 'ওঁ' - এই চিহ্নটিকে আত্মার প্রতীক হিসেবে চিন্তা করা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে-

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তরক্ষ্যমুচ্যতে। [৮]

'ওঁ'-কার যেন ধনু, আর জীবাত্মা (সাধক) যেন তীর, ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এই তীরের লক্ষ্য বলে কথিত হন।

ভক্তিযোগঃ মানুষের অন্তরে ভালোবাসা একটি তীব্র আবেগ রয়েছে। এই স্নেহের প্রস্রবণ জগতের নানা ঝড়-ঝঞ্জার মধ্যে তাঁকে নিয়ে চলেছে। কর্মের তীব্র ঘর্ষণ যখন মানুষের শরীর-মনকে মথিত করে, তখন এই 'ভালোবাসা' তাঁর অন্তরকে সিক্ত করে

তোলে; জীবনকে করে তোলে সহনীয়, আনন্দদায়ক। এই তীব্র স্নেহের স্রোত খুঁজে বেড়ায় উপযুক্ত গ্রহীতাকে - এটি বিতরিত হয় সংসারের নানা মানুষের মধ্যে - বন্ধু-বান্ধব, স্বামী, সন্তান প্রভৃতি। মানুষের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদকে ঈশ্বরমুখী করে তোলা - এই হচ্ছে ভক্তিযোগের সাধনা।

জ্ঞানের মার্গ বিচারের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে, বুদ্ধিবৃত্তিকে করে তীক্ষ্ণ। অপরদিকে, ভক্তিযোগের সাধনা মানুষকে করে নম্র, বিনয়ী। জ্ঞানমার্গের প্রধান অবলম্বন মস্তিষ্ক, ভক্তিযোগের হৃদয়। জ্ঞানের অনুশীলন কখনো কখনো মানুষের হৃদয় শুষ্ক করে দেয়, ভক্তির স্নিগ্ধ প্রস্রবণ সেখানে যেন শান্তির শ্যামলিমা। জ্ঞান যেন পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার খাড়াই পথ, ভক্তি যেন ধীরে ধীরে পাক দিয়ে দিয়ে পাহাড়ের শিখরে নিয়ে যায়। জ্ঞানের পথ বিচারের সদা উদ্যত তরোয়ালকে দিয়ে জগতের যাবতীয় ঘটনাবলীকে খন্ড-বিখন্ড করে বিশ্লেষণ করে চলেছে; ভক্তির পথ সংসারের সব কিছুতেই ঈশ্বরের বলে জেনে ভালোবাসতে শেখাচ্ছে, সবাইকে নিজের কাছে টেনে নিতে চাইছে।

ভক্তিযোগীর সমগ্র জীবন হয়ে ওঠে ভগবানের উদ্দেশ্যে এক আরতি, সমস্ত কর্মের ভাল-মন্দ সে ভগবানকেই সঁপে দেয়। এই ভাব সঠিকভাবে জীবন আনতে গেলে নিরন্তর অভ্যাস প্রয়োজন। ভক্তিপথে ভগবানের সঙ্গে যেন একটা মানসিক সম্পর্ক স্থাপন হয় - তিনি কহয়ে ওঠেন আমাদের সখা; কখনো বা আমাদের প্রভু; কখনো বা সন্তান, প্রেমাস্পদ বা জননী। ব্যবহারিক জগতের এই বিবিধ সম্পর্ক আমরা ভগবানে অর্পণ করি, তিনি তখন হয়ে যান একান্ত আপনজন। তাঁকে ভালোবেসে, তাঁর জন্য কেঁদে, সাধক ক্রমে ভগবানকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করেন। পরিশেষে সর্বত্র তিনি অনুভব করেন এই প্রেমাস্পদের উপস্থিতি - জীবন তখন পূর্ণ হয়ে যায়। গীতাতেশ্রীকৃষ্ণের আহ্বান তাই আমরা শুনতে পাই -

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাতিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।[৯]

অনন্যচিত্ত হয়ে যারা আমার উপাসনা করে, সেই সকল ভক্তদের প্রয়োজনীয় বস্তুর সংস্থান এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণের দায় আমি (ঈশ্বর) বহন করি।

রাজযোগঃ স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি বই-এর নাম রাজযোগ। এই বইটিতে স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধর্মের মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর কথা আলোচনা করেছেন। এই মার্গে মনের নিয়ন্ত্রনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে - মনের একটি অংশ দিয়ে বাকি অংশের পর্যবেক্ষণই এর মূল ভিত্তি।

যে কোনো ধর্মই সচেতন বা অচেতনভাবে জোর দেয় মনের নিয়ন্ত্রণের ওপর। পাতঞ্জল যোগসূত্রে যেমন বলা হয়েছে -

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।।[১০]

মন যেন বিভিন্ন বৃত্তির আকার না নিতে পারে - এই হচ্ছে যোগ। রাজযোগে প্রাথমিকভাবে প্রত্যাহার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ধ্যান করতে বসে মন নানান

বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। একটা দমকা হাওয়া এসে মনরূপ ঘুড়িকে উড়িয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে চায়। সেই অবস্থায় দক্ষ ঘুড়ি চালক সুতো ছাড়তে শুরু করে। সুতোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ি অনেকটা উড়ে হাওয়ার সঙ্গে অন্যত্র চলে যায়। হাওয়ার ঝাপ্‌টা কমে গেলে ঘুড়ি চালক সুতো গোটাতে শুরু করে, ঘুড়ি তখন সহজে সামলানো যায়। একইভাবে, ধ্যান করতে বসে, বিষয়ের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত মনকে কিছুক্ষণ ছেড়ে দিতে হয়। তারপর যখন সে কিছুটা বিষন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনই তাঁকে টেনে এনে ধ্যানে বসাতে হবে। রাজযোগের অন্যান্য ধাপগুলি হচ্ছে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। আমাদের সকলের অন্তরে একটি নিদ্রিত শক্তি রয়েছে, সেটা যেন কুন্ডলিনী পাকিয়ে রয়েছে শিরদাঁড়ায় শেষ প্রান্তে। এই ‘কুলকুন্ডলিনী’ শক্তির জাগরণ হয় মনের সংযম ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। অবান্তর, ক্ষতিকর বস্তু থেকে মনকে সংযত করে রাখতে হবে; আবার তাঁকে উচ্চতর লক্ষ্যে স্থির করে ধরে রাখতে হবে। মনের নিম্নদেশে অনেক ছোট ছোট চিন্তার বুদ্‌বুদ্‌ উঠেছে। চারিদিকের পরিবেশ ও বিষয় এইগুলি জাগিয়ে তোলে। এই ছোট ছো বুদ্‌বুদ্‌গুলি একত্র হয়ে একটি বড় চিন্তার ঢেউ-এর আকার নেয়। আরও পরের ধাপে, এই চিন্তার ঢেউ একটি কর্মে পরিণত হয়। বাস্তবিক, আমাদের মনের খুব সামান্য অংশেরই সন্ধান আমরা পাই। এর বড় অংশই রয়ে যায় গভীরে। এই গভীর চিন্তার স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় মনকে একাগ্র করলে। চিন্তাগুলিকে যেন আলোকিত করে একাগ্র মনের শক্তি। আমাদের অন্তস্তলে লুকিয়ে থাকা সংস্কারের তখনই সন্ধান পাওয়া যায়, বাহ্য কর্মের পেছনে সূক্ষ্ম চিন্তার প্রভাব বোঝা যায়।

চারযোগের সমন্বয়

ধর্মের এই চারটি প্রধান যোগের মার্গ ধরে চললে মানুষের চরিত্র পালটে যায়। জগতের যাবতীয় ধর্ম - যথা হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি - সঠিকভাবে, নিজের সমগ্র জীবন দিয়ে অনুসরণ করলে, মানুষের মধ্যে উদারতা আসে। অন্তরের পবিত্রতা জগতের নানা ঘটনাকে তখন সঠিক আলোতে দেখতে শেখায়, বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষ ঐক্যের সন্ধান পায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বলা যায় - এক পুকুরের জল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিচ্ছে। কেউ একে বলছে জল, কেউ বলছে একোয়া, কেউ পানি। হরেক রকমের নাম হলেও মূল জিনিস, জলে কোনও পার্থক্য নেই। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি তাই জাতি, ভাশাহ, দেশের বাধা ডিঙিয়ে সকল মানুষকে নিজের অন্তরে স্থান দেয়।

ধর্মের জগতে উচ্চস্তরে ওঠার লক্ষণ কি? কিসের সাহায্যে বোঝা যাবে যে, কোন মানুষ শাস্ত্রে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলি জীবনে প্রতিফলিত করতে পেরেছে? তাঁর ব্যবহারের দ্বারা বাইরের নানা ঘটনার সুখ-দুঃখের আঘাতেও সে ধীর, শান্ত হয়ে থাকবে, সেগুলিকে নিজের ভেতরে হজম করে নিতে পারবে। যেমন বলা হয়েছে -

যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহ্যতে, স্বর্গাদি সুখঞ্চ ত্যজ্যতে,
তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চ।[১১]

যেখানে পরের হাতে পরাজয় প্রভৃতির মহাদুঃখও [তিনি] সহ্য করেন, স্বর্গের মত সুখও ত্যাগ করেন, সেখানে এই তাৎক্ষণিক সুখ ও দুঃখ কত তুচ্ছ!

ধর্মের উচ্চতম সোপানে যে ব্যক্তি উঠেছেন, আমাদের শাস্ত্রের মতে তিনি সর্বজ্ঞ। সর্বজ্ঞ মানে কি তিনি জগতের সব জ্ঞান লাভ করে ফেলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, বাড়ির গিন্নী উনুনের হাঁড়ি থেকে কয়েকটা চাল তুলে নিয়ে বিচার করেন - ভাত সেদ্ধ হচ্ছে কি না, পরিশেষে সন্তুষ্ট হলে হাঁড়ি উনুন থেকে নামিয়ে দেন। তিনি কিন্তু হাঁড়ির কয়েকটি ভাতের দানা হাতে তুলেই পুরো হাঁড়ির ভাত সম্পর্ক সিদ্ধান্ত নেন, সবকটি দানা আলাদা আলাদা করে দেখেন না। ধর্মের উচ্চতম শিখরে যিনি যেতে পেরেছেন - তিনিও এই জগতের একটি, দুটি, তিনটি - এইভাবে কয়েকটি জিনিসের প্রকৃতি আলোচনা করে বুঝতে পারেন - সব সৃষ্ট পদার্থই 'জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি' [১২] জন্মায়, থাকে, বৃদ্ধি পায়, বিপরিণাম হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও পরিশেষ নাশ হয়। সব পদার্থই শেষকালে ধ্বংস হয়ে যায়, চিরকাল থাকে না। এইভাবে সাধারণীকরণ (Generalisation) বা অনুমান-প্রমাণ (Process of Inference) জগতের সব পদার্থের প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা তাঁর মনে এঁকে দেয়। এই বিচার করে তিনি সব জাগতিক বস্তু ত্যাগ করেন - নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন ভগবানকে জানার জন্যে [১৩]। তাঁকে জেনেই মানুষ পূর্ণ হয়, সদা বিনাশশীল এই পৃথিবীর মাঝেও সেই শাশ্বত, সনাতন বস্তুকে লাভ করেন।

উপসংহার

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক বা Emblem পরিকল্পনা করেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। মিশনের সবকটি কেন্দ্রেই এই চিহ্ন দেখা যায়। চিহ্নটি গোলাকৃতি। খুঁটিয়ে দেখলে তাতে দেখা যাবে এইগুলি - একটি সাপের বেষ্টনের দ্বারা একটি বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর মধ্যে রয়েছে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের জল, তাঁর ওপরে ভাসছে একটি পদ্ম। পদ্মের ওপরে একটি হাঁস বসে রয়েছে; তাঁর পেছন, জলের অপর থেকে সূর্য উঠেছে চারিদিক সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত।

এই প্রতীকটিতে স্বামীজী চারটি যোগের প্রকৃতি ও লক্ষ্য বিস্তৃত করেছেন। সমুদ্রের ঢেউ কর্মের দ্যোতক। কাজ সাধারণত মানুষের মনকে চঞ্চল করে তোলে - সেই কাজ, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে পারলে, তা আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথ হয়। প্রতীকের সূর্য জ্ঞানের মার্গকে চিহ্নিত করছে। আধ্যাত্মিক বা জাগতিক, যে কোন জ্ঞানই, মনের অন্ধকার দূর করে - সূর্য এই জ্ঞানযোগের চিহ্ন। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভক্তি প্রকাশিত হয় ফুল-বেলপাতা প্রভৃতির নিবেদনে। প্রতীকের ফুল তাই ভক্তিযোগকে চিহ্নিত করে। সর্বশেষে, প্রতীকের সাপ মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা কুণ্ডলিনী শক্তিকে বোঝায়। রাজযোগে এই বিপুল শক্তির জাগরণের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে - সাপ তাই, রাজযোগের চিহ্ন। একটি, দুটি অথবা সবকটি যোগের সাহায্যে সাধক ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা করে। প্রতীকের হংসটি এই ঈশ্বরের দ্যোতক। স্বামীজী আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, সর্বন্ধন থেকে মুক্তিই সাধনার লক্ষ্য ঈশ্বরকে লাভ যেন মহাসমুদ্রে নদীর মিশে যাওয়া - নদীর তখন আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না, সমুদ্রের সঙ্গে তা একাকার হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. ভুতেশ্বানন্দ ,স্বামী , শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম - অনুচ্ছেদ ৭,উদ্বোধন কার্য্যালয়, পৃ: ৫.
২.Vivekananda, Swami, ‘The Ideal of a Universal Religion’ in Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Mayabati (Vol. II), p. 375.
৩.Vivekananda, Swami, Complete Works of Swami Vivekananda , Advaita Ashrama, Mayabati, (Vol. I), P. 31.
৪.জগদানন্দ, স্বামী (অনুদিত ও সম্পাদিত).‘নৈস্কর্ম্যসিদ্ধি’, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কোলকাতা. শ্লোক ১৮২।
৫. জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী (অনুদিত ও সম্পাদিত). শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৩.৫.
৬.Vivekananda, Swami, Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Mayabati, (Vol. II). P.84.
৭. জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী (অনুদিত ও সম্পাদিত), শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাঃ. শ্লোক ২.২৪. উদ্বোধন কার্য্যালয়.
৮. ভূতেশ্বানন্দ, স্বামী, মুন্ডকোপনিষদঃ শ্লোক ২.২৪, উদ্বোধন কার্য্যালয়.
৯. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাঃ, শ্লোক ৯.২২,উদ্বোধন কার্য্যালয়.
১০. বেদান্তবাগীশ, কালীবর, পাতঞ্জল দর্শন , সূত্র ১.২, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কোলকাতা.
১১. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাঃ, শ্লোক ১৮.১০, উদ্বোধন কার্য্যালয়.
১২. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাঃ, শ্লোক ২.২০,উদ্বোধন কার্য্যালয়.
১৩. সারদানন্দ, স্বামী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গঃ দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, পৃ: ৮২.

বাঙলায় সাংবাদিকতার প্রসার ও রামমোহন রায়

মানিক পাল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শীতলকুচি কলেজ, কোচবিহার

সারসংক্ষেপ
জর্জ হর্ণ সংবাদপত্র প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, পৃথিবীর এক একটি দিনের ইতিহাস সেই দিনের একটি সংবাদপত্র। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যার নাম আমাদের সবার আগে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের সমকালীন পরিস্থিতি তার মধ্যে স্বাধীনতা, যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। রামমোহনের পূর্বে সংবাদপত্র বলতে ছিল ইংরেজি সংবাদপত্র এবং সেগুলি সবই ছিল এদেশে আগত ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত। রামমোহন রায় আপন স্নেহে নিজের বক্তব্যকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সম্বাদ কৌমুদি নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে সম্বাদ কৌমুদী থেকে যথার্থ ভারতীয় সাংবাদিকতার সূত্রপাত হয়, যেটি ছিল একটি লিবারেল সংবাদপত্র। পরবর্তীতে তিনি ফারসি ভাষায় মীরাত উল আখবার, বেঙ্গল হেরাল্ড সহ মোট পাঁচটি সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সাংবাদিকতা ও প্রকাশনাকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধুনিক শিক্ষা ইস্যুতে সংগঠনের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। শুধুমাত্র মাতৃভাষা বাংলায় নয়, ইংরেজি এমনকি ফারসি ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন রামমোহন। তিনি সংবাদপত্রের বাঁক স্বাধীনতা নিয়েও লড়াই করেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতার জাগরণে ও গণতন্ত্রের বিকাশে রামমোহনের ভূমিকা অনন্য। অন্ধকার থেকে আলোর দিশারী রামমোহনের অন্যতম সার্থক পরিচয় সাংবাদিক রামমোহন। তিনিই প্রথম মনে করেছিলেন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার সকল মানুষের একটি স্বাভাবিক অধিকার। এই সর্বজনীন অধিকার এবং ভারতীয়দের কাছে এযাবৎকাল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এই অধিকারের দাবিতে রামমোহনের উদ্যোগ ও প্রযত্ন তাকে ভারতবর্ষের নতুন চেতনার যথার্থ জনক রূপে উপস্থাপিত করেছে।

সূচক শব্দ: বিপ্লব, সংবাদপত্র, গেজেট, দিগদর্শন, সন্ত্রাস, আধুনিক, সমাচার দর্পণ, জুরি, বুর্জোয়া

মূল প্রবন্ধ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে, দেশ যখন অন্ধকুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, অন্ধবিশ্বাস

জীবনধারাকে রুদ্ধ করেছিল, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা লুপ্ত হয়েছিল, জাতি যখন কয়েকটি ক্ষয়ধরা প্রথাকে সারসত্য জ্ঞান করে আঁকড়ে ধরেছিল, সেই সঙ্কট সময়ে রামমোহন রায় ভারত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কঠোর সমালোচকরাও তাঁর অবদান অস্বীকার করতে পারেননি। রামমোহন রায় ভারতীয়দের কাছে শুধুমাত্র একটি নাম নয়, এক অনুভূতি। ভারতীয়দের জীবনের প্রতিটি ছত্রেছত্রে রামমোহনের কৃতিত্ব ছড়িয়ে আছে। তাঁর জন্মের ১২৫ বছর পরেও ভারতীয় তথা বাঙ্গালীদের কাছে তার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

রামমোহনের সময়কালের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসার ঘটেছে ভারতবাসীদের জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। ধর্ম, অর্থ, সমাজ, শিক্ষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত উদার যুক্তিবাদী জাতীয় ঐক্য-সাধনের লক্ষ্যে রামমোহন ছিলেন পাশ্চাত্য প্রভাব প্রসারের পক্ষপাতী। সময়কালে সে প্রভাব পরদেশী শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করার প্রেরণা জোগাবে ঐক্যবদ্ধ উদ্দীপিত দেশবাসীদের এমন এক ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন রামমোহন। রামমোহনের জীবৎকালে ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক পটভূমি সংগ্রামমুখর ছিল। আমেরিকায় ব্রিটিশ প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছিল (১৭৭৬ খ্রিঃ - ১৭৮৩ খ্রিঃ) এবং পরিশেষে তেরোটি রাজ্য নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে, ফরাসী দেশেও ঘটল বিপ্লব, ১৭৮৯ খ্রিঃ বাস্তিল দূর্গের পতন, ১৭৯৩ খ্রিঃ যোড়শ লুই এর ফাঁসি, তারপর সন্ত্রাসের রাজত্ব, নেপোলিয়নের উত্থান, পতন ইত্যাদি। বস্তুত সমকালীন পরিস্থিতি রামমোহনের মধ্যে স্বাধীনতা, যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার জন্ম দিয়েছিল।

ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহনই প্রথম কতকগুলি কর্মধারার সূচনা করেন, যেসব ব্যবস্থা বা ধারা ভারতের ইতিহাসে আগে ছিল না। ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, পাশ্চাত্যের উদার ধ্যান-ধারণা অর্জনের ফলে ভারতীয়দের মনোভঙ্গীতে কোনো জাতীয় পরিবর্তন রামমোহন প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, এই সম্পূর্ণ নতুন বিষয়গুলোর একটি হল রাজ্যশাসনের ব্যাপারে, প্রজাদের মতামত জেনে ও বিবেচনা করে রাজাকে দেশ শাসন করতে হবে এবং প্রজাদের মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।

ভারতের আধুনিকীকরণে মুদ্রণযন্ত্র একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর হতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ হল বাংলাতেই প্রথম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য এসব মুদ্রণযন্ত্র তখন ইউরোপীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হতো। এই ইউরোপীয়দের কেউ কেউ ছিলেন মিশনারি আবার কেউবা স্বাধীনভাবে ভারতে ভাগ্যান্বেষী ছিলেন। এদেশে সাংবাদিকতা সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হিকির হাত ধরেই। ১৭৮০ খ্রিঃ প্রকাশিত জেমস অগস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' এদেশের প্রথম পত্রিকা। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি 'হিকির গেজেট' নামেই অধিক পরিচিত। সাহেব কর্মচারীদের দুর্বলতা প্রকাশ করাই ছিল এর প্রধান কাজ। তারপর ১৭৮৪ খ্রিঃ 'ক্যালকাটা গেজেট' এবং ১৭৮৫ খ্রিঃ 'বেঙ্গল জার্নাল' প্রকাশিত হয়। তবে সংবাদপত্রের প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর

একটি সংক্ষিপ্ত পর্বও আছে। জেমস অগস্টাস হিকির ‘বেঙ্গল গেজেট’ প্রকাশেরও ১৪ বছর আগে উইলিয়াম বোল্টস (১৭৪০ -১৮০৮) কলকাতা থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বোল্টসকে তারপর বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফলে কলকাতায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্র বসান হিকি।

রামমোহনের জীবনী ঘাটলে দেখা যায় যে ২৭ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮০১খ্রিঃ রামমোহন কলকাতায় পা ফেলেছিলেন। এই সময় পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাগতচর্চা মূলত ফার্সি, আরবি,সংস্কৃতের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। ইতিমধ্যে, ১৮০০খ্রিঃ কোম্পানির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, কলেজ খোলার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির সিভিলিয়ান হিসেবে কাজের জন্য ব্রিটেন থেকে এদেশে আসা সাহেবদের বাংলা সহ দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। এরকমই একজন সাহেব ব্যক্তিত্ব ছিলেন জন ডিগবি। ওই সময় থেকেই ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের আলাপ পরিচয়। রামমোহনের উপরিতন কর্মচারী, মনিব ও বন্ধু হিসাবে জন ডিগবির নাম সুপরিচিত। তাঁর কাছ থেকেই রামমোহন ১৮০৫-১৮১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত গভীর ভাবে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন, এর পর থেকেই রামমোহনের মধ্যে এক জাগতিক পরিবর্তন লক্ষ্য যায়।[১] আজকাল যেমন আমরা পাশ্চাত্য জগৎ সমন্ধে জ্ঞান আহরণ করি তেমনই তখনকার দিনে ইংরেজরাই এদেশ সমন্ধে জ্ঞান অর্জন করত আর সবদিক থেকে পাশ্চাত্য জগৎ ছিল দেশীয়দের কাছে এক অজ্ঞাত অপরিচিত জগৎ। ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে রামমোহন পাশ্চাত্য তথা আধুনিক জগতে প্রবেশের চাবিকাটি আয়ত্ত করলেন। সেই চাবিকাটি দিয়ে একে একে ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি , বিজ্ঞান, কারিগরবিদ্যা ইত্যাদি বন্ধ দরজা খুলতে থাকলেন। এই সময়ের মধ্যেই এদেশে সাংবাদিকতা কলকাতার পরিধি ছাড়িয়ে গেছে, ১৭৮৫ খ্রিঃ মাদ্রাজ থেকে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ‘মাদ্রাজ কুরিয়ার’। বম্বে থেকে প্রথম সংবাদপত্র ‘বম্বে হেরাল্ড’ বেয়োয় ১৭৮৯ খ্রিঃ। হিকির ‘বেঙ্গল গেজেট’ এর পর দ্বিতীয় সংবাদপত্র বেরোয় সাপ্তাহিক ‘ইন্ডিয়া গেজেট’। সাপ্তাহিক, মাসিক মিলিয়ে ১৭৯৯ খ্রিঃ মধ্যেই কলকাতা থেকে ২৪টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

১৭৯৮ খ্রিঃ ‘এশিয়াটিক মিরর’ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে এদেশে ইউরোপীয়দের সংখ্যা এত সামান্য যে শুধু ঢিল ছুঁড়েই ভারতীয়রা তাদের হত্যা করতে পারে। এই মন্তব্যকে তৎকালীন গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৯ খ্রিঃ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র উত্থানের জন্যে ভারতীয়দের প্রতি প্ররোচনা বলে গণ্য করেছিলেন। তাই তিনি কতকগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রন আরোপ করেন সংবাদপত্রগুলির উপরে। ফলে অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে এবং শর্ত মেনে যে সকল সংবাদপত্র চালু রাখা হয়েছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বেঙ্গল হরকরা’। এই পত্রিকাতেই ‘টাইটলার’ এবং ‘রামদাস’ ছদ্দনামে রামমোহনের হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মীয় মতামতের চাপান-উতোর প্রকাশিত হয়েছিল।

রামমোহন কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা থাকাকালীন সাংবাদিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশনার আবির্ভাব। এদেশে সংবাদপত্র চালু হবার পর প্রায় প্রথম চার দশক সংবাদপত্র বলতে ছিল ইংরেজি সংবাদপত্র এবং সেগুলি

সবই ছিল এদেশে আগত ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত, যারা আসত মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে অথবা বাণিজ্যের কাজে। ১৮১৮ খ্রিঃ আগে বাংলা ভাষায় কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। এ কাজে অগ্রণী হয়েছিল শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিগণ। ১৮১৮ খ্রিঃ তাঁরা মাসিক 'দিগদর্শণ' ও সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' নামে দুটি বাংলা এবং ইংরাজীতে 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' নামে এক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। শেষোক্ত দুটি পত্রিকা দীর্ঘায়ু হয়েছিল। প্রধানত 'সমাচার দর্পণ' থেকে সংবাদাদি সংকলন করেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানের 'দি স্টেটসম্যান' ইংরাজী দৈনিকটি 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। উল্লেখ্য ঐবছরেই 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকা দিয়ে বাঙালির সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল। এই পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র রায়, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন মুদ্রাকর ও প্রকাশক। এই হরচন্দ্র রায় ছিলেন রামমোহনের ঘনিষ্ঠ। এই পত্রিকায় রামমোহন রায় লিখিত সতীদাহ বিষয়ক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

খ্রিস্টধর্মের অন্তর্গত অনুশাসন ও বিধানগুলির তুলনায় স্বয়ং যীশুখ্রিস্টের বাণী ও নির্দেশের মধ্যেই রামমোহন খ্রিস্টনীতির মূল তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেছিল এবং খ্রিস্ট কর্তৃক নির্ধারিত নৈতিক শিক্ষার প্রচারই ছিল রামমোহনের উদ্দেশ্য, কিন্তু ঘটনাচক্রে পরিণাম দাঁড়াল হিন্দুশাস্ত্রের মহিমা প্রচার। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মিশনারিদের অপ্রাসঙ্গিক আক্রমণের উত্তর দেওয়া ছাড়া তাঁর অন্য উপায় রইল না। সেই উত্তর মিশনারিগণ নিজেদের পরিচালিত 'The Friends of India' ও 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা দুটিতে প্রকাশ করতে অস্বীকার করলে দেশবাসীর সামনে বক্তব্য উপস্থাপনে পত্রিকার বিশেষ কার্যকারিতা তিনি ওই দুটি পত্রিকা অত্যল্পকালের জন্যে প্রকাশ করেই বুঝতে পারেন। অতঃপর আপন বক্তব্য, মতামত ও চিন্তাকে দেশবাসীর কাছে পৌছে দেওয়ার একটি সার্থক মাধ্যম হিসেবে পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। ওই বছরই রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্ম্ম' ছদ্মনামে বাংলা ও ইংরেজী এই দুই ভাষায় ১৮২১ খ্রিঃ 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও 'মিশনারি সম্বাদ' নামে দুটি পত্রিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশ করেন, এই পত্রিকার ইংরেজী অংশ তিনটি নিয়ে 'Brahmunical Magazine' ও প্রকাশ পায়, সেই পত্রিকাগুলিতে তাঁর উত্তর ছাপেন। তবে পত্রিকাগুলি কোনটিই নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি, নিতান্তই সাময়িক উদ্দেশ্যে তিনি পত্রিকা দুটি প্রকাশ করেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে বন্ধ করে দেন।

রামমোহন আপন স্নেহে নিজের বক্তব্যকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য ১৮২৩ খ্রিঃ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত 'সম্বাদ কৌমুদী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন; যার সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে 'সম্বাদ কৌমুদী' থেকে যথার্থ ভারতীয় সাংবাদিকতার সূত্রপাত হয়। 'সম্বাদ কৌমুদী'তে তাঁর সম্পাদ্য ' the support and patronage of all who feel themselves interested in the moral and intellectual improvement of our countrymen.'[২] এটি ছিল উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইহাতে ধর্ম্ম নীতি, রাজনীতি, বিদেশীয় ও দেশীয় সংবাদ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় পারিবারিক সংবাদ থাকত। এটি ছিল রামমোহন প্রভাবিত লিবারেল সংবাদপত্র। ইহার মাসিক মুল্য দুই টাকা, এর প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছিল যে দেশের

কল্যাণের জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, এই পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও পত্রিকার পরিচালনাদি সকল দায়িত্ব রামমোহনই পালন করতেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সক্রিয় ছিল সম্বাদ কৌমুদী। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন সতীর অগ্নিতে আরোহণ বা প্রবেশের শাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু সতীদাহের নয়। রামমোহন বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ কাজ করেছিলেন। রামমোহন বৈষম্যমূলক জুরি ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে সম্বাদ কৌমুদীতে আবেদন প্রকাশ করলেন। রামমোহনের আলোচ্য জুরি বিলের সম্পাদ্য ছিল 'Any Natives, either Hindu or Mohamedan,are rendered by this Bill subject to judicial trial by Chriastians,either European or Native,while Christians including Native Converts are exempted from the degradation being tried either bya Hindu or Mussulman juror,however high he may stand in the estimation of society.This Bill also denies both to Hindus and Mussulmans the honour of a seat in the Grand Jury even in the trial of fellow Hindus or Mussulmans.'[৩] পত্রিকা প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই রামমোহনের সতীদাহপ্রথা বিরোধী ও অন্যান্য প্রগতিবাদী মতামত পছন্দ না হওয়ায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তিনি রামমোহন বিরোধী 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছেড়ে চলে যাবার পর ১৮২২-র আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ সম্বাদ কৌমুদী বন্ধ হয়ে যায় প্রথম বারের জন্য ১৮২৩-র আগস্ট থেকে তা পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১৮২২ খ্রিঃ ১২ই এপ্রিল রামমোহন প্রথম ভারতীয় ফার্সি সাপ্তাহিক 'মীরাত-উল- আখবার' বা 'সংবাদের প্রতিফলন' নামে পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এতে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন 'পারস্য ও হিন্দুস্থানের যেসকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্টপোষকতা করিয়া 'মীরাত- উল- আখবার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণ সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে , আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন , নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবাই নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন'[৪]। বাংলা সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতি মঙ্গলবার এবং 'মীরাত-উল- আখবার' প্রতি শুক্রবার প্রকাশ পেত। এই ফার্সি ভাষার পত্রিকায় রামমোহন লিখিত সম্পাদকীয়, বাকিংহাম সাহেব তাঁর 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ ইংরেজীতে অনুবাদ করে ছাপাতেন। বাকিংহাম সাহেব তাঁর 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের আদর্শ অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রচারক এবং কোম্পানি শাসনের তীব্র সমালোচক ছিলেন, ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কোম্পানির পক্ষে জরুরি হয়ে পড়ল। কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ওই জাতীয় সমালোচনার প্রসঙ্গে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করে, 'The Government in India exercise a delegated authority,derived from the Court of Directors and the Board of Control. The Government of India resides in this country, England, and is,of course,responsible to

the English public in common with the Government of England.It is in this country,therefore, and not in India,that its measures ought to be discussed.'[৫] রামমোহনের অগ্রচারী বিভিন্ন মতামত ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়ে বহুল প্রচার লাভ করুক, তা সরকারের পছন্দ ছিল না। ১৮২২ খ্রিঃ ১১ই অক্টোবরে 'মীরাত-উল- আখবার'এ আয়ারল্যাণ্ড সম্পর্কীয় এক সংবাদে দেখা যায় ইংল্যান্ডের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মী রাজা আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক ধর্মী প্রজাদের প্রতি কীরূপ বৈষম্য-মূলক আচরণ করেছেন। আবার ঐ বৎসরেই খ্রিস্টধর্মের ত্রিতত্ত্ববাদ বিষয়ে রামমোহনের এক মন্তব্যকে সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য মি. বেয়লে (W. B. Baylay) অতীব দোষাবহ (Exceedingly Offensive) বলে বর্ণনা করেছিলেন।

অন্য যে পত্রিকাটির সঙ্গে রামমোহন যুক্ত ছিলেন সেটি হল মণ্টগোমারী মার্টিন প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বঙ্গ দূত'। বেঙ্গল হেরাল্ড পত্রিকার স্বত্বাধিকারীদের একজন ছিলেন রামমোহন রায়। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন ইংরেজি, বাংলা, ফার্সি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাতে যে কটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তার সবগুলির চরিত্রই ছিল মোটামুটি এক সবগুলিরই লক্ষ্য ছিল জনহিতৈষী অথাৎ শুধু সংবাদ পরিবেশন, ইহলোক সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিভিন্ন বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত করা, বিশ্ব প্রগতিতে ও কর্তৃত্ব মুক্ত, উদার মানবিক তথা স্বাধীন চিন্তাদর্শে দীক্ষা দেওয়া। 'সম্ভবত তিনিই এযুগের প্রথম শিক্ষিত ভারতবাসী যিনি ইউরোপের রেনেসাঁস থেকে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ব্যাপী অধ্যায়টির সামাজিক তাৎপর্য পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করেন। এই পর্বেই ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের ক্রম বিলুপ্তি ও সংগঠিত নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিরূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রম-অভ্যুত্থান। রামমোহন এই সর্বতোমুখী সামাজিক পট-পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে কেবল যে সচেতন ছিলেন তা নয়, তাঁর কালের সমস্ত রাজনৈতিক ,সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তাঁর মতে , এটিই ছিল প্রধান উৎস। রামমোহন গোষ্ঠীর মুখপত্র বেঙ্গল হেরাল্ড পত্রিকার ১৩জুন, ১৮২৯ তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে এই মনোভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত'।[৬]

কলকাতায় জীবনের শেষ ৯ বছরে মোট পাঁচটি কাগজের সঙ্গে রামমোহন যুক্ত ছিলেন। এ থেকে সংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়, অথাৎ মুদ্রণ সংস্কৃতি তথা সাংবাদিকতা সংস্কৃতি থেকে পৃথকভাবে রামমোহনকে ভাবা যায় না, তা সঙ্গতও নয়। তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য ভারতীয় যিনি তাঁর যুগের সুযোগকে যথার্থ ভাবে ব্যবহার করেন এবং সাংবাদিকতা ও প্রকাশনাকে সামাজিক রাজনৈতিক ইস্যুতে জনমত সংগঠনায় প্রয়োগ করেছিলেন। 'রামমোহন স্বয়ং সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ব্যাপারে জেরেমি বেন্থাম ও মন্তেস্কু-এর সমর্থক ছিলেন, অতএব পত্রিকায় যেভাবে সংবাদ ও রচনাবলী প্রকাশিত হতো তৎকালীন উন্নত সংস্কৃতিমনস্কতার ছাপ থাকত'।[৭]

'লর্ড হেস্টিংস জানুয়ারি, ১৮২৩ খ্রিঃ ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলে মধ্যবর্তী সময়ের জন্য অস্থায়ী ভাবে বড়লাটের দায়িত্ব পেলেন জন অ্যাডাম। এই সময়ে স্কটদেশীয় পাদরি ডক্টর ব্রুস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ক্লার্কের চাকুরী নিলেন। 'ক্যালকাটা জার্নাল' ধর্ম যাজকদের এরূপ চাকুরী গ্রহণকে কঠোর সমালোচনা করা হল। এই অসম্মানজনক বক্তব্যের জন্য সম্পাদক বাকিংহামকে দু-মাসের মধ্যে এদেশ ছেড়ে যাবার আদেশ দিলেন

বড় লাটসাহেব (১২, ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩)। তাঁর সহকর্মী স্যান্ডফোর্ট আর্নটকেও বন্দি করে লন্ডনগামী জাহাজে চড়িয়ে দেওয়া হল। বড়লাট অ্যাডাম সাহেব এখানেই থামলেন না। তিনি সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রন করে এক অর্ডিন্যান্স জারি করলেন(১৪ মার্চ, ১৮২৩)। এই আদেশ বলে সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারীর ও সম্পাদকের পক্ষে চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক হল। সরকার-নিষিদ্ধ বিষয়ে রচনা প্রকাশ করলে সংবাদপত্র বাতিল করার নিয়মও চালু হল। সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনের জন্য ১৭ মার্চ এই অর্ডিন্যান্স তৎকালীন বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকনাটার-এর নিকট উপস্থাপন করা হয়। তিনি ৩১ মার্চ শুনানির দিন ধার্য করলেন; আপত্তি জানানোর সময় সীমাও ছিল ঐ তারিখ পর্যন্ত।'[৮]

রামমোহন রায় এবং তাঁর সহযোগীগণ ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় সরকারের নিকট গণ আবেদন জানানোর প্রচেষ্টা চালালেন, কিন্তু মতভেদ হওয়ায় ৩০ মার্চ পর্যন্ত মাত্র পনেরোটি সাক্ষর সংগ্রহ করা গেলো। সরকারের পক্ষেও বিবেচনা করার সময় মিলল না। তখন কেবলমাত্র ইংরাজীতে এক আবেদন রামমোহন ও অপর পাঁচজনের (চন্দ্রকুমার ঠাকুর , দ্বারকানাথ ঠাকুর , হরচন্দ্র ঘোষ , গৌরীচরণ ব্যানার্জী এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর) সাক্ষর সহ ৩১ মার্চ বিচারপতির নিকট পেশ করা হয়। তিনি তা কোনোভাবে বিবেচনা না করেই প্রেস অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করে দিলেন। তিনি তাচ্ছিল্য ভরে জানালেন, এ কাজের জন্য সরকারকে তিনি আগেই কথা দিয়েছিলেন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রন অর্ডিন্যান্স আইনে পরিণত হল। তাঁদের স্মারক লিপি সাংবাদিকতা তথা ব্যক্তির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপরে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রথম প্রতিবাদ। ভারতবর্ষের মানুষ ব্যক্তির মতামত প্রকাশের অধিকার বা স্বাধীনতার কথা ইতিপূর্বে কখনও চিন্তা করেনি এবং ওই অধিকারের ধারণাও কোনোদিন ভারতীও চেতনায় জন্মাবার সুযোগ পায়নি। এদেশের কর্তার ইচ্ছেতেই কর্ম হয়ে এসেছে, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতামতের প্রকাশ ছিল অকল্পনীয়। উল্লিখিত স্মারক পত্রের অবলম্বন স্বরূপ অধিকার বোধ এবং সেই অধিকারের দাবি ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুধু অভিনব নয়, এক মহান যুগান্তরের সুচনাও বটে।

স্মারকলিপিটিতে আরও পাঁচজন সাক্ষর করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাষাভঙ্গি এবং যুক্তিপ্রণালী থেকে স্পষ্ট হয় যে লিপিটি রচনা করেছিলেন রামমোহন, তাই এটিকে রামমোহনের রচনা বলেই গণ্য করা হয়। এই রচনায় তিনি আইন সম্বন্ধে যে অসামান্য প্রামান্য ও গভীর অনুধাবনার পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোনও পেশাদার ইংরেজ আইনজ্ঞের বিশেষ গৌরবের ও আত্মপ্রমাদের কারন হতে পারত। এযাবৎ রামমোহন দেশীয় ধর্মসমাজ জাত বা দেশীয় ঐতিহ্যজাত অর্থাৎ বিশেষ ভাবে ভারতীয় অধিকার গুলি নিয়েই সংগ্রাম করেছেন। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে তার অবদান সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তিনি একাই এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তক একথা বলা চলে না, এবং এক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ার তো বটেই, হাইড ইস্ট থেকে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, তারিণী চরণ মিত্রের মত রক্ষণশীলদের, এবং মিশনারিদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার সমস্ত মানুষের একটি স্বাভাবিক অধিকার, তা বিশেষ কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়, বিশেষ কোন জাতির একান্ত

অধিকারও নয়। এই সর্বজনীন অধিকারে এবং ভারতীয়দের কাছে এযাবৎকাল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই অধিকারের দাবিতে রামমোহনের উদ্যোগ ও প্রযত্ন তাকে ভারতবর্ষের নতুন চেতনার যথার্থ জনক রূপে উপস্থাপিত করেছে।

অর্ডিন্যান্সের আইনে রামমোহনের পত্রিকাগুলি কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং 'মীরাতে'র প্রকাশও বন্ধ হয়নি। তবে ওই অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে রামমোহন 'মীরাত উল আখবারে'র প্রকাশ বন্ধ করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করলেন এবং আইন অমান্যের নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন। যা মহাত্মা গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগী আইন-অমান্য সংগ্রামের প্রস্তাবনা বিশেষ। এছাড়া প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের নীতি প্রতিষ্ঠা করে। রামমোহন পত্রিকা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিকার চেয়ে ইংল্যান্ডেশ্বরের নিকট আবেদনপত্রও পাঠিয়েছিলেন যা ব্রিটিশরাজের নিকট ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে প্রেরিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডেশ্বরের উদ্দেশ্যে রামমোহন যে দীর্ঘতর আবেদনটি প্রেরণ করেছিলেন তাতে তিনি জানান, 'that it may be permitted by means of the press or by some other means equally effectual, to bring forward evidence regarding the acts of Government which affect the general interest of the community,that they also may be investigated and reversed, when those who have the power of doing so,become convinced that they are improper or injurious.'[৯] ৫৫ টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এবং সেই আবেদন পত্রে উপস্থাপিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষের মূল বক্তব্যটি সর্বকালেই প্রযুক্ত হতে পারে। রাজা রামমোহনের আবেদনপত্রটির ভাষাজ্ঞান অভাবনীয়, তাঁর যুক্তিবিন্যাস এবং স্বাধীনতাকামী মানসিকতার সংক্ষেপে বর্ণনা দুরূহ। বর্তমানেও সেই যুক্তি প্রয়োগ করেই 'প্রেস ফ্রিডম'-এর উপযোগিতা বিচার করা হয়ে থাকে। রাজা রামমোহন রায় তাঁর আবেদনপত্রে স্বীকার করেছেন যে কোম্পানির শাসনে নেটিভদের প্রাণ, ধন ও ধর্ম সুরক্ষিত হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকায় শিক্ষা ও সচেতনতার বিস্তার ঘটেছিল। মিশনারি পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' স্বীকার করে যে তাদের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই।

ইংল্যান্ডেশ্বরের নিকট তাঁর আবেদনপত্রটিতে রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে অনুরূপ কোনো পদ্ধতিতে যাতে সরকারি কর্মচারীদের সমাজবিরোধী কার্যাবলীর প্রকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা যেন করা হয়, যার মাধ্যমে সমাজের হানিকর কর্মকাণ্ডের অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করা সম্ভব হয়। কর্তব্যচ্যুত সরকারী কর্মচারীদের যাতে বোঝানো যায় যে এরূপ কর্ম অসমীচীন অত্যন্ত হানিকারক। সেজন্যই শাসক এবং শাসিত উভয়ের পক্ষেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা উপযোগী। সদুদ্দেশ্যে সচেতন সরকারের কাছে তার রক্ষাকবচই হল সংবাদ মাধ্যম, কাজেই সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত কোনো সমালোচনাকেই সরকারের ভয় করা উচিত না। শিক্ষিত নাগরিকরা এই সংবাদপত্রের সঙ্গেই সর্বদা যুক্ত থেকে সরকারের ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপকে সমর্থন করে সরকারকে সুস্থিত করে তোলেন। ফ্রি প্রেস কখনই কোনো বিদ্রোহ ঘটায়নি কাজেই সরকারের 'প্রেস ফ্রিডম' এর বিরোধিতা করা উচিত

না। সংবাদপত্রের দোষ দেখাতে না পেরে সংবাদপত্র ভবিষ্যতে বিদ্রোহ মুলক হয়ে উঠতে পারে এরূপ প্রচার করে দমন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা একেবারেই অযৌক্তিক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কারনেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অপশাসনের প্রকাশ ঘটে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা নিরসন করে মানুষের অসন্তোষ দূর করে, ফলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই 'প্রেস ফ্রিডম' বিরোধিতা মানেই বিদ্রোহের পুনরুত্থান। রামমোহন ইংল্যান্ড -এর 'The King in the Council'-এর কাছে অনুরোধ করেছেন যাতে প্রজাগণকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সত্য এবং স্বাভাবিক মনোভাব প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। আবেদনপত্রে তিনি ইংল্যান্ডেশ্বরকে লিখেছেন 'A free press has never yetcaused a revolution in any part of the world, because, while men can easily representthe grievances arising from the conduct of the local authorities to the supreme Government, and thus get them redressed, the grounds of discontent that excite revolution are removed ; whereas, where no freedom of the press existed, and grievances consequently reminded unrepresented and unredressed, innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe, or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready for insurrection'[১০] প্রজাগণ সরকারের কাছ থেকে তদন্ত এবং ন্যায় বিচার লাভে উন্মুখ, তারা যেন বিচারহীন, আইনের সমর্থনহীন আদেশ মান্য করতে বাধ্য না হয়, আরও আবেদন জানিয়েছেন যাতে ভারতীয় নেটিভগণকে স্থায়ী নিপীড়ন ও অবনমনের মধ্যে নিক্ষেপ না করা হয়। তাঁর মতে প্রজাগণকে যদি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না দেওয়া হয় তাহলে ভারতবর্ষের মতো উপনিবেশও গণঅভ্যুত্থানের পথ বেছে নেবে এবং আমেরিকার মতো স্বাধীন হবে।

এই আবেদনপত্রটির সাথে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির নিকট পেশ করা আবেদন পত্রের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল থাকলেও এই আবেদন পত্রটি তথ্যবহুল এবং দীর্ঘতর। উভয় রচনাই ভাষা এবং যুক্তিবিন্যাসের জন্য সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। রামমোহনের প্রথম আবেদন পত্রটিকে মিস কলেট জন মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাজিটিকার' সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং দ্বিতীয় আবেদন পত্রটি সম্পর্কে কর্নেল স্ট্যানহোপ রামমোহনকে এক পত্রে (৯ জুন, ১৮২৫) জানিয়েছিলেন, তিনি বোর্ড অব কন্ট্রোলের সেক্রেটারি মারফত আবেদন পত্রটি রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তা গৃহীত হয়েছে। রামমোহনের আবেদন পত্রে যে জ্ঞানগর্ভ যুক্তিবিন্যাস ও বাকবৈদগ্ধ প্রকাশ পেয়েছে তা স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের কাছে বিস্ময়কর। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের কঠোর প্রচেষ্টা দেখে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কও উদার মত পোষণ করেছিলেন এবং তা নানা বিদ্দজনের দ্বারা সমাদৃত হয়েছিল। তবে বড়লাটের উত্তরসূরি লর্ড মেটকাফই ১৮৩৫ সালে নতুন আদেশ জারি করে সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

'Asiatic Mirror-এর পূর্ব উল্লিখিত ভারতবাসীদের ঢিল ছোঁড়া বিষয়ক মন্তব্য যদি ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের কাছে ঘোরতর আপত্তিকর হয় তবে রামমোহনের সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের আশঙ্কা প্রকাশকেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য হতে পারত। চার্লস মেটকাফ ১৮৩৫- এর ৩রা আগস্ট আপন দায়িত্বে মুদ্রনযন্ত্র সম্বন্ধে নতুন আইন প্রণয়ন করে

১৮২৩- এর প্রেস অর্ডিন্যান্স লোপ করেন, তখন শিক্ষিত সমাজ এক সভায় রামমোহনকে কৃতজ্ঞতা ও সংবর্ধনা জানান। সেই সভাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর ভাষণে কিভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন ইংল্যান্ডের রাজাকে তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাহস করে স্পর্ধা লঙ্ঘন করেছিলেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহী রূপে চিহ্নিত অপদণ্ডিত হওয়ার বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা বর্ণনা করেন।'[১১] রামমোহন সাধারণত ক্ষমতা প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন তবে শক্তির প্রয়োগ বাধ্যতামূলক হলে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে আপোষহীন হয়ে পড়েন। অন্যায়ভাবে আইনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজে নিবৃত্ত করাই হল তাকে বাধ্যতা করা। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ ও ফরাসি বিপ্লবের উত্তপ্ত আবহাওয়াতে। ইংল্যান্ডেশ্বরের নিকট আবেদনপত্রে রামমোহন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আকবর ও ঔরঙ্গজেবের মতো ব্যক্তিত্বের অবস্থান বিশ্লেষণ করে বোঝান যে পৌর এবং ধর্মীয় উদারতা সর্বকালেই সুফলপ্রসূ এবং শাসক ও শাসিত উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক। রামমোহনের আবেদনে নাগরিকগণের শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভুমিকা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপযোগিতার প্রসঙ্গ সুস্পষ্ট হয়েছে। রেভারেণ্ড উইলিয়াম অ্যাডাম বোস্টনে রামমোহনের উপর 'the life and labors of Rammohun' এক ভাষণে বলেছিলেন ' He established and conducted two native papers, one in Persian and the other in Bengali, and made them the medium of conveying much valuable political information to his country men.[১২] রামমোহনের স্বাধীনতাকামী মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া গেছে। এই আবেদন নির্বিচার অপশাসনের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের এক অন্যতম নজির।

সরকারের প্রজার প্রতি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ সরকারের পতনের পথকেই প্রসারিত করে, কাজেই রামমোহনের মতে জোর করে কাউকে কোন কাজে বাধ্য করা ঘোর অন্যায়। সেই কারণেই যখন সতীদাহ প্রথাকে আইনত নিষিদ্ধ করার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক রামমোহনের মতামত চান তখন রামমোহন তার বিরোধিতা করেন কেননা তিনি মনে করেন এই আইন প্রণয়ন করার মানেই হল জনসাধারণকে সতীদাহ প্রথা নিবৃত্তিতে বাধ্য করা। পক্ষান্তরে রামমোহন এক আরব্ধ আন্দোলন করেছিলেন সেই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, জনসাধারণের মনে চেতনা জাগানো যাতে জনসাধারণ আপন শুভ বুদ্ধিতে সতীদাহ প্রথা থেকে নিবৃত্ত হয়। রামমোহন মন্দ কাজের বিরুদ্ধে কোনো আজ্ঞাপত্র চাননি তিনি চেয়েছিলেন ব্যাক্তির মন্দ কাজ না করার স্বাধীনতা ব্যবহারের উপযুক্ত মানসিক পরিবেশ। আজ্ঞাপত্র ও স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্যবোধ তখন ইউরোপেই নবজাত ও অস্বচ্ছ। ভারতবর্ষে যে বণিকসংঘ একচেটিয়া বাণিজ্যের আজ্ঞাপত্র নিয়ে এসে বাণিজ্য শুরু করেছিলো তাদের শাসনকালেই অর্থাৎ ভারতবর্ষে যথার্থ ঔপনিবেশিকতা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই, রামমোহনের আশু চেতনাতে আজ্ঞাপত্র ও স্বাধীনতার অর্থ-পার্থক্য ধরা পড়েছিল। তাঁর জোরালো বক্তব্য ছিল 'loyalty and attachment as the bond between the Government and the people'[১৩] প্রেস অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদ করার মধ্যেই আজ্ঞাপত্র এবং স্বাধীনতার মৌল তাৎপর্যের বিভাজন-ক্রিয়ার সুস্পষ্ট সূচনা হয়।

প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে রামমোহনের কর্মপন্থা রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের নীতি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩১ খ্রিঃ লন্ডনে অনুষ্ঠিত রাউন্ড টেবল কনফারেন্স প্রসঙ্গে এল এস এস ও মালি মন্তব্য করেন 'A Round Table Conference in London to discuss India's future, with Indians taking a full share in the discussions, would have been a preposterous and incredible suggestion to Englishmen of the Company's days.It might never have come about had the great Rammohan not taken the lead and three Tagores,Ghosse and Banerji,not joined with him in starting the process that led to it'[১৪] সাংবাদিক রামমোহন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'Report on the Native Press of Bengal' শীর্ষক ১৮৫৯ খ্রিঃ পেশ করা প্রতিবেদনে রেভারেন্ড জেমস লঙ লিখেছেন-'রামমোহন রায় পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও জাগ্রত মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য বক্তৃতার চেয়ে সংবাদপত্রই অধিকতর শক্তিশালী মাধ্যম।

ভারতের গণ চেতনা উন্মেষ প্রগতিবাদী সমাজকল্যাণমূলক চিন্তাধারার উদ্বোধনে সংবাদপত্রের যে ভূমিকা রয়েছে তার পথিকৃৎ রামমোহন। অথচ সে সময়ে ভারতে সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং সংবাদপত্র প্রকাশ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তবুও রামমোহন পিছিয়ে যাননি। নিজে অর্থ ক্ষতি স্বীকার করেছেন এবং তাঁর প্রেরণার ঔজ্জ্বল্যে বন্ধুবর্গ সংবাদপত্র প্রকাশে সহযোগী হিসেবে এগিয়েও এসেছিলেন। শুধুমাত্র মাতৃভাষা বাংলায় নয়, ইংরেজি, ফারসি ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন রামমোহন। সংবাদপত্রের বাঁক স্বাধীনতা নিয়েও লড়াই করেন। সংবাদপত্রের বাক স্বাধীনতার অর্থ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিকাশ। সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতার জাগরণে ও গণতন্ত্রের বিকাশে রামমোহনের ভূমিকা অনন্য। অন্ধকার থেকে আলোর দিশারী রামমোহনের অন্যতম সার্থক পরিচয় সাংবাদিক রামমোহনের। সংবাদপত্রকে জনশক্তির সফল হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠায় রামমোহন এক ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। এ দেশে সাংবাদিকতাকে মর্যাদা দিতে এবং জনগণের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করতে রামমোহনের অবদান আমাদের বারবার স্মরণ করতে হবে। যেখানে তিনি নতুন যুগের নতুন ভাবনায় আলোকিত।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়, বঙ্গীয়- সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা,১৩৪৯(বঙ্গাব্দ), পৃ.২৪-২৫

২। Ray, Niharranjan, (Edited) Rammohun Roy A Bi-Centenary Tribute, National Book Trust, New Delhi, 1974. P.116

৩। Dr.Nag, Prof. Barman, (Eds), The English Works of Rammohan Roy-part IV (1947), pp.102-103.

৪। দত্ত, বিজিত কুমার, আধুনিক ভারতের রূপকার রামমোহন রায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নতুন দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ. ৫২-৫৩

৫। Mazumder, R.C, (ed) British Paramountcy and Indian Renaissance, part II, 1965, p.231

৬। বিশ্বাস, দিলীপ কুমার, রামমোহন সমীক্ষা, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৩২৩

৭। ঘোষ, মুরারি, অনন্য রামমোহন অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ও যুগনায়ক, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮, পৃ.৩৮

৮। পাল, রামসিংহ, রচনাবলীর আলোকে রামমোহন: রামমোহন কথা ও কৃতি, মিত্রম প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই, ২০০৬, পৃ.২০৭

৯। Dr. Nag, Prof. Barman, (Eds) The English Works of Rammohan Roy;-part IV (1947), p.21

১০। Pruthi, Raj, Brahmo Samaj and Indian Civiliation, New Delhi, Discovery Pub. House, 2004, p.189

১১। দাসগুপ্ত, সুরজিৎ, রামমোহন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০০১, পৃ.৪৭

১২। Ray, Niharranjan, (Edited) Rammohun Roy A Bi-Centenary Tribute, National Book Trust, New Delhi, 1974. P.115

১৩। Sen, Amiya Kumar, Raja Rammohun Roy,The Representative Man, Calcutta Text Book Society, Kolkata, 1954.p.112

১৪। Mazumde, R.C, History of the Freedom Movement in India, Firma klm private limited, Kolkata, 1963.P. 312

ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষ বনাম দেশীয় পৌরুষ: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদে পৌরুষ প্রতর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরুষ ভাবনা

অপূর্ব ঘোষ
ইউনিভার্সিটি রিসার্চ স্কলার (জে.আর.এফ.)
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
শুভঙ্কর কুণ্ডু
প্রাক্তন এম. ফিল. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ঔপনিবেশিক বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা পর্ব। এই সময় থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদে পৌরুষের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শক্তি তথা ব্রিটিশ শাসকরা পাশ্চাত্য পৌরুষের ধারণাকে সামনে রেখে বাঙালি পুরুষ সমাজকে ‘মেয়েলি’ বলে প্রতিপন্ন করার নিদারুণ চেষ্টা শুরু করে। এর প্রত্যুত্তরে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বাঙালির পুরুষত্ব প্রমাণের সবরকমের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও বুদ্ধিজীবী মহলে বাঙালি পুরুষদের দৈহিক স্বাস্থ্য, শারীরিক শক্তি, পেশী বহুলতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বাড়তে থাকে। ব্রিটিশদের আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একাংশ দেশীয় বিকল্প তথা তাপসিক পৌরুষ (ascetic masculinity) এর ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করেন, যেখানে শারীরিক বল নয়, আধ্যাত্মিকতা ও আত্মসংযমের মতো বিষয়গুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে তাপসিক পৌরুষের ধারণা দিয়ে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষকে প্রতিহত করা সবসময় সম্ভবপর ছিল না বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা শেষমেশ পেশীবহুল শারীরিক বল-সর্বস্ব আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণাকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। তাই বাঙালি পুরুষকে শারীরিকভাবে বলশালী ও পেশীবহুল হিসেবে গড়ে তুলতে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই বাংলায় আখড়া সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি জাতীয়তাবাদে পৌরুষ সংক্রান্ত এই প্রতর্কের ইতিহাসকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে তাপসিক পৌরুষের প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরুষ সংক্রান্ত ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

সূচকশব্দ: স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, আধিপত্যবাদী পৌরুষ, ব্রহ্মচর্য, তাপসিক পৌরুষ, মেয়েলি।

মূল প্রবন্ধ

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে তাঁদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে বিভিন্নভাবে নানান যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁদের অন্যতম যুক্তি ছিল এই যে, তাঁরা উৎকৃষ্ট, কারণ ব্রিটিশ জাতি হল পুরুষোচিত জাতি, এবং ভারতীয়রা নিকৃষ্ট, কারণ তাঁরা 'মেয়েলি জাতি'। আর যেহেতু ব্রিটিশ জাতি হল পুরুষোচিত জাতি, তাই সমগ্র মেয়েলি জাতির উপর পুরুষোচিত জাতি হিসেবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার অধিকার তাঁদের ছিল।[১] তাই সম্ভবত ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাও নিজেদের পৌরুষের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তিকে খণ্ডন করতে। এই পৌরুষ সংক্রান্ত প্রতর্ক ও রাজনীতি আলোচনার পূর্বে সর্বাপেক্ষা জরুরি পৌরুষ এবং আধিপত্যবাদী পৌরুষ সম্পর্কে সম্যক ধারণা। পুরুষত্ব বা পৌরুষ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুজান জেফর্ডস্ বলেছেন পুরুষত্ব হল কিছু চিত্রকল্প বা প্রতিমূর্তি, মূল্যবোধ, আগ্রহ এবং কর্মকাণ্ডের সমাহার যা একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সার্বিক সফলতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[২] অর্থাৎ, পৌরুষ বলতে তিনি কিছু মূল্যবোধ, রূপকল্প ও ক্রিয়াকলাপকে বুঝিয়েছেন যা একজন তথাকথিত সফল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কৃতিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, পৌরুষ বা পুরুষত্ব হল কিছু গুণাবলী যা তথাকথিত পুরুষের 'স্বাভাবিক' বৈশিষ্ট্য। তবে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, এই পৌরুষের ধারণা একটি সমাজ নির্মিত ধারণা এবং সমাজ ভেদে আদর্শ পৌরুষের চারিত্রিক পরিবর্তন আসতেই পারে। অর্থাৎ, প্রাক-ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমাজে পৌরুষের ধরণ বা ভাবনা পাশ্চাত্য পৌরুষের ধারণার সঙ্গে মানানসই না হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা পাশ্চাত্যে আঠারো ও উনিশ শতকে, বিশেষ করে ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতার যুগে, উদ্ভুত কঠোর দ্বিবিভাজিত লিঙ্গভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণার উপর নির্ভর করেই ভারতীয় পৌরুষকে বিচার-বিশ্লেষণ করা শুরু করে। পৌরুষের আধিপত্যবাদী ধারণাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আর.ডব্লিউ.কন্নেল এর মতে, আধিপত্যবাদী পৌরুষ এমন একটি সাংস্কৃতিক অবস্থা বা ধারণাকে বোঝায় যার সাহায্যে পৌরুষের একটি নির্দিষ্ট ধরন অন্য সকল ধরনের থেকে উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হয়। এবং এই আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণা সামাজিক জীবনে একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে ক্ষমতাশীলের আসনে বসায়, বিশেষকরে এই ধারণা সমাজে নারী বা নারীত্বের উপর পুরুষ বা পুরুষত্বের আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করে।[৩] কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের এই আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণাকে ভারতীয় নারীদের পদানত করতে ব্যবহার করেনি, বরং ব্যবহার করেছিল ভারতীয় পুরুষদের পদানত করতে যাঁরা ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষের কাঠামোতে ছিলেন বেমানান। সুতরাং, এই আধিপত্যবাদী বা হেজিমনিক পৌরুষের প্রয়োগ ছিল ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের চাল ভারতীয় পুরুষদের উপর নিজেদের কর্তৃত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য। এই ঔপনিবেশিক পৌরুষের ধারণায় 'আদর্শ' পৌরুষ এর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সামরিকবাদ, আগ্রাসন, হিংসাত্মক প্রতিরোধ, শারীরিক বল ইত্যাদিকে ধরা হত।[৪] এর পাশাপাশি উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিকে মেয়েলিপনার নামান্তর বলে গণ্য করা হত। এই নারীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিকাংশ ভারতীয় পুরুষকে, বিশেষ

করে বাঙালি পুরুষকে, চিহ্নিত করা হল 'মেয়েলি', দুর্বল জাতি হিসেবে। সিকতা ব্যানার্জীর মতে, প্রাচ্যকে নারীকরণ করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতীয় পুরুষ সমাজকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে তুলে ধরা এবং বলা হলো, যেহেতু তাঁরা মেয়েলি তাই তাঁরা পরাজিত। তাঁদের পরাজিত অবস্থাই তাঁদেরকে দুর্বল, অনাগ্রসী ও সামরিকবাদে অনাগ্রহী করে তুলেছে, যা কিনা মেয়েলিপনার সমার্থক।[৫] ব্রিটিশদের এই হেজিমনিক পৌরুষের ধারণায় খ্রিষ্টান-পৌরুষের ছায়া দেখতে পাওয়া যায় যেখানে শারীরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা, নীতি-নৈতিকতার মত বিষয়গুলোকেও আদর্শ পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বলে গণ্য করা হত।[৬] পৌরুষের সংজ্ঞাকে তাঁরা বহুমাত্রিক করে তোলে এবং সিকতা ব্যানার্জীর মতে এই বহুমাত্রিক সংজ্ঞা একটি লিঙ্গায়িত লেন্স তৈরি করে যার সাহায্যে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের পুরুষদের পৌরুষের বিচার-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত ছিল।[৭] ভারতীয় তথা বাঙালি পুরুষের মেয়েলিয়ত্ব সংক্রান্ত ইংরেজ সাহেবদের দাবি বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের নিজেদের পৌরুষ সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে যা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে পৌরুষ সংক্রান্ত ডিসকোর্স বা প্রতর্ককে জোরদার করে তোলে।

'মেয়েলি বাঙালি' তকমা ও বাঙালির প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় পুরুষদের মেয়েলিতত্ত্বের জনপ্রিয়তম মুখ হিসেবে বাঙালি পুরুষদেরকে ব্রিটিশরা তুলে ধরতো। বাঙালি পুরুষদের সম্পর্কে ব্রিটিশদের ব্যবহার করা বিশেষণগুলির মধ্যে 'ভীতু', 'কাপুরুষ', 'মেয়েলি' ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। টমাস মেকলে বাঙালি পুরুষদের নারীসুলভ দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কটাক্ষ করে লেখেন, "বাঙালি পুরুষদের দৈহিক গঠন এতটাই দুর্বল যে তা অনেকাংশে মেয়েলি।...তাঁর কিছু অর্জনের চেষ্টা বা সাধনা ক্ষণস্থায়ী, তাঁর বহু যুগল নারীসুলভ নমনীয়, তাঁর চলাফেরা ধীরুজ। অনেক বছর ধরে সে আরও শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান জাতির পুরুষের দ্বারা পদদলিত হয়ে আসছে।...সে এতটাই দুর্বল যে, কোনও ধরনের পুরুষালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সে কার্যত অপারগ।"[৮] উনিশ শতকের শেষদিকের একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক জি.ডব্লিউ. স্টীভেনস্ কটাক্ষ করে লেখেন যে, "বাঙালি পুরুষদের মেয়েলি পায়ের গড়ন দেখেও তাঁদেরকে বাঙালি বলে নাকি চিহ্নিত করা সম্ভব"![৯] এছাড়াও জর্জ ম্যাকমান, জেমস্ মুনরো প্রমুখ ব্রিটিশ প্রশাসকদের লেখায় বাঙালি পুরুষের মেয়েলিপনার উদাহরণ পাওয়া যায়।[১০]

মেয়েলিয়ত্বের অপবাদ ও অপমানের জবাব দিতে গিয়েই বাঙালি মননে পৌরুষ এর ধারণাটি দৃঢ় হল। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা অনুভব করলেন যে, বাঙালি পুরুষদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। তাঁরা আরও অনুভব করলেন যে বাঙালি পুরুষরা দৈহিক সক্ষমতার দিক থেকে সত্যিই পিছিয়ে আছে। এই ধারণার প্রকাশ পেতে থাকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রপত্রিকায়। যেমন, চিকিৎসা-সম্মিলনী নামের একটি সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জনৈক ব্যক্তি লেখেন, "এদেশীয়রা দুর্ব্বল ও স্বল্পজীবী বলিয়া যে প্রায় বিদেশীয় ও অনেক চিন্তাশীল স্বদেশীয় লোকের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে"।[১১] চিকিৎসক ও সমালোচক

পত্রিকায় প্রকাশিত 'বীর্য্য' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রী বঙ্কুবিহারী রায় নামের একজন কবিরাজ বাঙালি পুরুষদের দৈহিক দুর্বলতা ও তদজনিত দুর্দশা সম্পর্কে লেখেন,

"কেন আজ বাঙ্গালী জাতি এত ঘৃণিত, এত অবসন্ন, এত অধঃপতিত? কেন আজ বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না? একবার দাঁড়িয়া, একবার বাঙালিত্ব ভুলিয়া, উর্দ্ধে উঠিয়া নিরপেক্ষ দর্শকের চক্ষে চাহিয়া দেখ, বাঙ্গালী আজ কিরূপ অবনত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ঘৃণিত, পদদলিত! যেন বিস্তৃত কর্দ্দম পরিপূর্ণ দুর্গন্ধ জলাভূমে লক্ষ লক্ষ কৃমিকীট নিবিড় পঙ্কমধ্যে বুকে হাটিয়া চলিয়াছে।...বাঙ্গালীর সাহস নাই, তাই বাঙ্গালীর এত দুর্দ্দশা।"[১২]

বাঙালি পুরুষদের নারীসুলভতা এবং শারীরিক বলের ক্রমাবনতি বিষয়ে আলোচনা রাজনারায়ণ বসু-র সেকাল আর একাল (১৮৭৪) গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "শারীরিক বলবীর্য্য - এ বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন আমাদের পিতা ও পিতামহ বড় বলবান ছিলেন। সে কালের লোকের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান লোকদিগকে কিছুই বল নাই বলিলে হয়।"[১৩] একই রকমভাবে ভেষজ ও স্বাস্থ্য পত্রিকাতে শ্রী রমেশ চন্দ্র রায় নামের এক ব্যক্তি বাঙালির মেয়েলিপনার ও শারীরিক বলবীর্যহীনতা বৃদ্ধি সম্পর্কে লেখেন,

"...(পূর্বে) লোকেদের স্বাস্থ্য ছিল, দেহ বলিষ্ঠ ছিল এবং কর্ম্মে উদ্বেগ-আবেগ না থাকিলেও লোকেরা কর্ম্মঠ ছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কিছুটা হলেও, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এমন কি ধনীদের মধ্যে, রীতিমত কুস্তি ও অপরাপর কসরৎ, লাঠিখেলা ও বাইচ খেলা, শিকার ও রণনৃত্য প্রভৃতি দ্বারা দেহচর্চা করার প্রথা ছিল।...এখন বাঙ্গালার আবহাওয়া দূষিত হইয়াছে; বাঙ্গালী স্ব-বৃত্তি পরায়ণ হইয়া ভীষণ বেগ ও উদ্বেগ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতেছে; তাহার খাদ্যে পর্ব্বত-প্রমাণ ভেজাল এবং পুষ্টিকর খাদ্য খাঁটি ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না; তাহার বেশ-বাহুল্য ঘটিয়াছে এবং নানারূপ কৃত্রিম উত্তেজনার দ্বারা সারাদিনই তাহার অপুষ্ট দেহকে উত্তেজিত রাখার প্রয়োজন হয়; ভাবে, বেশে, ভূষায়, কণ্ঠস্বরে এমন কি মনোবৃত্তিতে আজ বাঙ্গালী পুরুষ মেয়েলিয়ানা দুরস্ত করিয়া কৃতার্থ হইতেছে।"[১৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতে অনুরূপ বিষয় পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায়, "বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই না। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিষয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।"[১৫]

সুতরাং, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ অনুভব করলেন যে 'মেয়েলি বাঙালি'র অপবাদ ঘোচানো দরকার এবং এর বিপরীতে বাঙালিকে পুরুষালি করে তোলাও প্রয়োজন।[১৬] এর থেকেই 'জাতীয় স্বাস্থ্য'র ধারণা জনপ্রিয় হতে শুরু করে। চিকিৎসা-সম্মিলনী, অণুবীক্ষণ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত ও এগুলোতে বাঙালির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত প্রতর্ক শুরু হয়।[১৭] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ফিজিক্যাল কালচার ও আখড়া সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয় বাংলায়।[১৮] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত 'মেয়েলি বাঙালি' তকমার বিরুদ্ধে এবং তাকে প্রতিহত করতে বাঙালি জাতীয়তাবাদে অনুপ্রেরণিত বুদ্ধিজীবী মহল বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন এবং

এর মধ্যে অন্যতম একটি পন্থা ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষের মডেলের বিরুদ্ধে বিকল্প দেশীয় পৌরুষকে তুলে ধরা।[১৯] স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাণপণে এই কাজটি করারই চেষ্টা করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পৌরুষ ভাবনার নানা দিক

উনবিংশ শতকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের বিভিন্ন রচনা ও বাণী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কিভাবে তাঁর জাতীয়তাবাদ বিষয়ক চিন্তাধারায় পৌরুষ এর ধারণা গুরুত্ব পেয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে ব্রিটিশরা ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালির মেয়েলিপনাকে কটাক্ষ করত। তাই বিবেকানন্দ একটি বিকল্প দেশীয় পৌরুষের ধারণাকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি জোর দেন আধ্যাত্মিক পৌরুষের ধারণার উপর। তিনি মনে করতেন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত সভ্যতার দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও তা পিছিয়ে ছিল আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে।[২০] বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক পৌরুষ সম্পর্কিত মতামত আক্ষরিক অর্থেই ছিল রাজনৈতিক, কারণ তিনি ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষকে আধ্যাত্মিকতা দিয়ে নসাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, কোনও বস্তুগত সভ্যতা দীর্ঘমেয়াদি ভাবে টিকে থাকতে পারে না দৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তি ছাড়া, এবং ভারতবর্ষ বাস্তবিক অর্থেই ছিল আধ্যাত্মিকতার স্বর্গ।[২১] স্বামীজি জাতিগঠন ও জাতিগত পুনর্জাগরণের জন্য পৌরুষ পুনর্স্থাপনকে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বলেই মনে করতেন। ভয় ও দুর্বলতাকে পরিত্যাগ করে শক্তি বা বল প্রদর্শনের মন্ত্র উপনিষদ থেকে তিনি তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়,

"...উপনিষদ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর।... উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' এই শব্দ বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে - আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ' বা ভয়শূণ্য এই বিশ্লেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ' - ভয়শূন্য হও।...উপনিষদূক্ত এই তেজস্বীতাই আমাদের জীবনে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি, শক্তি - ইহাই আমাদের চাই।"[২২]

বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক পৌরুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত ছিল তাপসিক পৌরুষ তথা আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্যের কঠোরতা। এক্ষেত্রে তিনি তীব্র অনুশাসন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তথা তপস্যার মধ্য দিয়ে এক তাপসিক পুরুষ শরীর নির্মাণের উপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এমন কঠোর অনুশাসনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া তাপসিক পুরুষ শরীর ও মন সবধরনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রলোভন ও উদ্দীপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এই কারণে তিনি পৌরুষ নির্মাণের জন্য সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রলোভন/উত্তেজনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করার উপর জোর দিয়ে বলেন, "মনকে সংযত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথম ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে। বাহ্য ও অন্তর বিষয়ে মনের গতি-রোধ করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করা - ইহাই হইল শম ও দম শব্দের অর্থ। মন বা অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম হইল শম এবং চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রের সংযম হইল দম।"[২৩] বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী অতি-পৌরুষের বিপক্ষে প্রতিরোধ হিসেবে এবং সুদৃঢ় পৌরুষ সংরক্ষণের এক দেশীয় বিকল্প পন্থা হিসেবে কৌমার্য সংরক্ষণ তথা বীর্য

ধারনের মাধ্যমে দেশীয় পৌরুষ নির্মাণকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তবে হিন্দু পুরুষদের যৌন-সহবাসে যে তাঁর সম্পূর্ণ আপত্তি ছিল তা নয়। তবে তিনি গুরুত্ব দেন সংযমী যৌনতার উপর। তাঁর মতে, বিবাহ ও যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সন্তান উৎপাদন। জাতিগঠন, দেশপ্রেমী বীরযোদ্ধা উৎপাদনের জন্য প্রজননমূলক যৌনাচারের ভূমিকাকে তিনি অস্বীকার করেননি। তবে যৌনাচারণের আনন্দময় ভূমিকাকে অসম্পূর্ণ অস্বীকার বা বর্জনের কথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "যে অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তানের উৎপাদন হয়, তাহা ভগবানেরই প্রতীক-স্বরূপ। একটি নূতন জীব যেন এক প্রবল শুভ বা অশুভ সংস্কার লইয়া জগতে আসিতেছে। একটি পবিত্র নূতন জীবকে জগতে আনিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মিলন। সুতরাং ভগবানের নিকট উহা তাহাদের এক সর্ব্বোচ্চ মিলিত প্রার্থনা।...একি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, না পশু প্রবৃত্তির চরিতার্থতা? হিন্দু বলে 'না, না, কখনই না'।"[২৪]

স্ত্রীসঙ্গ বা মাত্রাতিরিক্ত কামেচ্ছাময় নারী বা 'কামিনী'কে স্বামীজি পুরুষদের কৌমার্য রক্ষার ক্ষত্রে বিপদজনক বলে মনে করতেন।[২৫] ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযমী বীর্যবান পুরুষ নির্মাণের প্রকল্পে নারীর যৌনতাকে এক মুখ্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তুলে ধরেন বিবেকানন্দ, যা তাঁর মতে বাঙালির জাতিগত অবক্ষয়ের সঙ্গেও সম্পর্কিত। পুরুষের দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্য ও বল অক্ষুন্ন রাখতে তিনি নারীর আদর্শ স্বরূপ হিসেবে 'জননী' অবয়বকে গুরুত্ব দেন। হিন্দুধর্মে নারীর সনাতনরূপ হিসেবে 'মাতা'কে প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজি নারীত্বের এক 'অযৌন রূপকল্প'কে নির্মাণ করার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন,

"নারীর নারীত্ব কি শুধু এই রক্তমাংসের শরীরের সহিত জড়িত? দৈহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিতে হইবে - এমন আদর্শ চিন্তা করিতেও হিন্দু ভয় পায়। না, না, নারী, রক্তমাংসের সহিত সম্বন্ধ এমন বস্তুর সহিত তোমাকে কখনও জড়াইতে পারিব না! তোমার নাম চিরকালের মত পবিত্র হইয়া আছে; কারণ 'মা' এই একটি শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোনো শব্দ আছে, যাহার সম্মুখীন হইতে কাম সাহস করে না, বা যাহাকে কোনও পশুত্ব স্পর্শ করিতে পারে না? ভারতে হইল ইহাই আদর্শ।"[২৬]

বিবেকানন্দ ভারতীয় নারীর 'জননী' প্রতিমূর্তি নির্মাণের মধ্যমে পাশ্চাত্য নারীত্বের ধারণাকে প্রতিহত করার চোষ্টা করেন। তাঁর মতে, পশ্চিমে নারীকে 'আদর্শ পত্নী' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা ভারতীয় 'জননী'র আদর্শ থেকে ভিন্ন; "পাশ্চাত্যে নারী - স্ত্রী শক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রীশক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। ভারতের একটা সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারীশক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত।...আর ভারতের নারীত্বের পরাকাষ্ঠা হইল মাতৃত্ব - সেই অপূর্ব্ব স্বার্থ-লেশহীন, সর্ব্বংসহা, ক্ষমাস্বরূপীনি মা-ই আমাদের আদর্শ। স্ত্রী তাঁহার পশ্চাদনুসারিণী ছায়া। মায়ের জীবন গঠনই তাহার একমাত্র কর্তব্য।"[২৭] বিবেকানন্দের মতে, এর ফলে ভারতীয় পুরুষরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তিতে অধিক বলীয়ান, কারণ পাশ্চাত্যে স্বামীর পত্নী সহবাসে বীর্য অধিক ক্ষয় হয়। এর বিপরীতে, ভারতীয় পুরুষরা নারীশক্তিকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করায় সংযম রক্ষা করে দেহ-মনে সার্বিক বলবান হয়ে উঠতে পারে।[২৮] ফলে বিবেকানন্দের দেশ ও জাতি-গঠন প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনুশাসিত পুরুষ শরীর এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত পৌরুষ নির্মাণের

কাঠামোগত ভিত্তি ছিল ব্রহ্মচর্য পালন এবং নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু, এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্ব-বিরোধীতা আছে। নারীর যৌনতা যদি ক্ষতিকারক এবং নারীকে অযৌন প্রতিমূর্তি হিসেবে ভাবা হয়, তাহলে একজন নারী বিবাহ ও যৌন সহবাস ছাড়া কীভাবে জননী হতে পারেন?[২৯]

যৌনতা এবং লিঙ্গ-অভিব্যক্তিগত এই টানাপোড়েন স্বামীজির চিন্তনে ও কথায় বারবার ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে তিনি ব্রহ্মচর্যের উপর গুরুত্ব কেবলমাত্র অবিবাহিতদের জন্য নয়, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিবাহিত পুরুষদের জন্যও একই সংযম ধারণের উপর গুরুত্ব দিতে বলেন। তিনি দাবি করেন যে, বীর সন্তানদের জন্মদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত যৌন-সংসর্গ অপ্রয়োজনীয় ও নিষিদ্ধ। ফলে দেখা যায় যে, স্বামীজির ভাবনায় যৌন-অবদমনের ধারণা জাগ্রত ছিল এবং এই বৃহত্তর ব্রহ্মচর্য প্রকল্পের সাফল্যের জন্য তিনি নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণে তৎপর ছিলেন। তাঁর ভাষায়,

"ভারতীয় রমণী আপন শরীর পুরুষকে বিলাইয়া দিবার কল্পনাও করিতে পারেন না। 'দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা' (এতদ্দ আইন অনুসারে যে-কোন বিবাহিত স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর উপর সহবাসের দাবী করিতে পারে এবং স্বামী বা স্ত্রী রাজী না হইলে তাহার শাস্তি হইতে পারে) বলিয়া বর্ত্তমানে ইংরেজরা এক নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবাসীরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে নারাজ। পুরুষ যখন স্ত্রীর দৈহিক সংস্পর্শে আসে, তাহার পূর্ব্বে স্ত্রী কতই না প্রার্থনা ও মানত করিয়া উপযুক্ত সংযত ভাব অবলম্বন করে।"[৩০]

অর্থাৎ, স্বামীজির মূল বক্তব্য হল এই যে, প্রজননের উদ্দেশ্যবিহীন যৌনতায় সংযম পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতীয়দের বেশি ছিল এবং সেই কারণেই ভারতীয়দের জাতিসত্তাগত উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক পৌরুষের দিক থেকে সমৃদ্ধ হবার মূল কারণ। উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকায় ও পারিবারিক সন্দর্ভে (family manuals) বাঙালি পুরুষদের দৈহিক শক্তির অবনমনের জন্য অল্পবয়সে বিবাহ ও প্রয়োজন অতিরিক্ত বৈবাহিক যৌনতা ও বীর্যক্ষয়কে দায়ী করা শুরু হয়।[৩১] এই প্রেক্ষিতে স্বামীজির সুদৃঢ় পৌরুষ সত্তা নির্মাণ প্রকল্প ও তার সংরক্ষণের বিকল্পপন্থা হিসেবে ব্রহ্মচারী জীবনাদর্শকে তুলে ধরা বেশ প্রাসঙ্গিক। বিবেকানন্দ তাঁর রাজযোগ এ দাবি করেন যে, কৌমার্য পালন এবং বীর্যধারণের মধ্যে দিয়ে অন্তর্নিহিত কামশক্তিকে মহাজাগতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।[৩২] বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য পৌরুষ ধারণার উপর গুরুত্ব দিলেও দেখান যে, দেশীয় শব্দ 'বীরত্ব'-এর পাশ্চাত্য (ইংরেজি) সমার্থক শব্দ 'virtue' হলেও এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য স্বতন্ত্র ও অনেক ব্যাপক। দেশীয় ব্রহ্মচর্য এবং বীর্যধারণ ভাবনার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে পৌরুষ শক্তির ধারণ ক্ষমতা। স্বামীজির মতে, পাশ্চাত্য ধারণায় বীর্য (semen) হল সন্তান উৎপাদনের বীজ, কিন্তু বাংলা ভাষায় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃহত্তর তাৎপর্য যা সাহস, বীরত্ব ও শৌর্যের প্রতীক।[৩৩] উল্লেখ্য, প্রায় একইরকম বক্তব্য পাওয়া যায় পূর্বোল্লিখিত শ্রী বঙ্কুবিহারী রায় লিখিত "বীর্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধে।[৩৪] যাইহোক, পৌরুষ সংক্রান্ত প্রতর্কে স্বামীজির কাছে ব্রহ্মচর্য জীবনদর্শন হয়ে ওঠে ব্যক্তিপুরুষ থেকে সমষ্টিগত বা জাতিহত সমৃদ্ধির অনস্বীকার্য মাধ্যম।

বিবেকানন্দের চেতনায় বাঙালির পৌরুষহীনতার ভীতি জাগ্রত ছিল সর্বদা। সুধীর কাকার-এর মতে পৌরুষহীনতার আশঙ্কা এবং পৌরুষ বাসনার তীব্র আকাঙ্খার এই সংঘাতের মধ্যেই নিহিত ছিল তৎকালীন বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অতি-পুরুষালি রাজনৈতিক সংস্কৃতির উত্থানের বীজ।[৩৫] ইস্পাত-কঠিন শরীর গঠন এবং সংযমী জীবনচর্চার অংশরূপে প্রাত্যহিক বিভিন্ন ব্যায়াম, ভার-উত্তোলন এবং দেশীয় ও পাশ্চাত্য খেলাধুলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিবেকানন্দ নিজে নিয়মিত ব্যায়াম, ওজন তোলা, ডাম্বেল নিয়ে শরীরচর্চা, সাঁতার ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরচর্চা ও কসরৎ করতেন। এছাড়াও ঘোড়সওয়ারি, পর্বতারোহণ এবং নানা ধরণের ঔপনিবেশিক খেলাধুলো যেমন, ফুটবল, সাইকেল প্রতিযোগিতা, গল্ফ ইত্যাদির প্রতি আগ্রহী ছিলেন।[৩৬] শরীরচর্চা এবং ঔপনিবেশিক খেলাধুলোর মাধ্যমে তিনি কেবলমাত্র বাঙালি পুরুষদের পেশীগত বা শারীরিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে চাননি। বরং এর মাধ্যমে তিনি বাঙালির 'নারীসুলভতা' দূরীভূত করে দৈহিক, মানসিক শক্তিবৃদ্ধি ও সক্রিয়তা, প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন।

সুতরাং দেখা যায়, বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে তাপসিক পৌরুষ-ভাবনা তথা প্রতর্ক সম্পৃক্ত, এবং তাপসিক পৌরুষ নির্মাণের সঙ্গে কঠোর অনুশাসন, সংযম ও প্রায়োগিক অনুশীলনের বিষয়গুলি জড়িত। তাপসিক পৌরুষ নির্মাণের জন্য এই সংযম, অনুশাসন ও প্রায়োগিক অনুশীলনের বিষয়গুলি জড়িত। তাপসিক পৌরুষ নির্মাণের জন্য এই সংযম, অনুশীলন তথা অনুশাসনের বিষয় ফরাসী দার্শনিক মিশেল ফুকো-র "technologies of the self" এর ধারণার কথা মনে করিয়ে দেয়। ফুকোর মতে, ক্ষমতার আধার (যেমন রাষ্ট্র ও সমাজ) নির্মিত বেঁধে দেওয়া মাপকাঠির সঙ্গে মানানসই হবার মাধ্যমে 'সুখী' থাকার জন্য ব্যক্তি নাগরিককে নানারকম অভ্যাস, অনুশীলন, চর্চার মাধ্যমে নিজের সত্তাকে পরিবর্তন করতে হয় এবং এই সকল অভ্যাস, অনুশীলন, অনুশাসনই হল "technologies of the self"।[৩৭]

স্বামীজি পৌরুষ প্রতর্কে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রূপকল্প নির্মাণকে গুরুত্ব দেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নির্মাণ প্রকল্পে তাঁর পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গভাবনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ভারতীয় ইতিহাসের ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর মত শক্তিশালী নারীচরিত্রের গুরুত্বকে স্বীকার করলেও ভারতীয় নারীর রূপকল্পের 'আদর্শ' হিসেবে সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ পৌরাণিক নারী চরিত্রকে তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়, "হে ভারত ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী....।"[৩৮] মহাকাব্যিক-পৌরাণিক চরিত্র 'সর্ব্বংসহা' সীতাই তাঁর কাছে কাঙ্খিত ভারতীয় নারীর আদর্শ সত্তা। তাঁর কথায়,

"ভারতের বালক-বালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় রমণীগণের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ-আকাঙ্খা পরম-বিশুদ্ধ-স্বভাবা, পতি-পরায়ণা, সর্ব্বংসহা সীতার ন্যায় হওয়া। এই সমুদয় চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর বিভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন,...সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি-স্বরূপা, যেন মূর্তিমতী

ভারতমাতা"।[৩৯]

বিবেকানন্দ নারী ও নারীত্বের সনাতন রূপ তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পৌরুষ/নারীত্বের এই লিঙ্গ দ্বৈতকল্প বা বিভাজনকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তিনি আসলে নারীর রূপকল্প নির্মাণের মাধ্যমে পুরুষের সঙ্গে শক্তি-সামর্থ, সাহসিকতার মত বিষয়গুলিকে এবং বিপরীতে নারীত্বের সঙ্গে দুর্বলতা, ভীরুতা, অসহায়তার মত বিষয়গুলিকে যুক্ত করেন।[৪০]

আশ্চর্যের বিষয় হল, বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক তথা তাপসিক পৌরুষের কথা বললেও তিনি তার মধ্যে পেশীশক্তি, শারীরিক বল ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেন যেগুলো ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি অনুভব করেন যে, বাঙালি পুরুষরা শারীরিকভাবে দুর্বল। তাই তিনি বাঙালি পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেন,

"আমাদের যুবকদের প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও - তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি।... তোমাদের তাই বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে।"[৪১]

তিনি আরও বলেন যে, বাঙালিদের প্রয়োজন শক্তি সঞ্চার। বাঙালি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবং তিনি এমন বাঙালি পুরুষ দরকার বলে মনে করতেন যাঁদের লোহার মতো পেশী ও ইস্পাত নির্মিত স্নায়ু, আর যার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষত্রীয় তেজ যাঁদের মধ্যে উপস্থিত থাকবে।[৪২] বিবেকানন্দ শারীরিক শক্তি, তেজ ইত্যাদি তথাকথিত পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের উপরই জোর দেন। যেমন তিনি বলেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। ভারতবর্ষ শক্তিহীন কারণ শক্তির অবমাননা এখানে বেশি।"[৪৩] তিনি আরও বলেন, "মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।"[৪৪] বিবেকানন্দ পৌরুষ নিয়ে এতটাই ভাবিত ছিলেন যে, তিনি বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবকেও ভালো চোখে দেখেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাঙালি পুরুষরা মেয়েলি হয়ে যেতে পারে এবং তা পৌরুষ এর পক্ষে বিপদজনক। এ প্রসঙ্গে নরসিংহ প্রসাদ শীল তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বিবেকানন্দ তাঁর এক বন্ধুকে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে গোটা ওড়িশা মেয়েলি জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং বাংলাও প্রায় সেই পথে।[৪৫] অর্থাৎ, বিবেকানন্দের পৌরুষ ভাবনায় পেশীশক্তি, তেজ, শৌর্যবীর্যই ছিল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আধ্যাত্মিক পৌরুষের কথা বললেও নিজেকে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষ থেকে প্রভাবমুক্ত করতে পারেননি। বিবেকানন্দের পৌরুষ সর্বস্ব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থই লিখেছেন, "হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের গৌরবময় ধারণার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল স্বদেশপ্রেম। যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জাতির পুরুষত্বকে ফিরিয়ে আনা যাকে ঔপনিবেশিক প্রভুরা অস্বীকার করত। ভারতীয়

(তথা বাঙালি) জাতির পুরুষত্বকে ফিরিয়ে আনার এই উদ্দেশ্য লোকচিত্তে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে।"[৪৬]

বঙ্কিমের দেশীয় পৌরুষ

বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙালি পুরুষদের প্রতি ব্রিটিশদের দেওয়া 'মেয়েলি' তকমাকে ভাঙতে চাইতেন। তাই তিনিও একটি বিকল্প দেশীয় পৌরুষ এর ধারণা দিয়ে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেন। বঙ্কিম ভালো করেই জানতেন যে, বাঙালিরা শারীরিকভাবে দুর্বল, তাই তিনি যে বিকল্প দেশীয় পৌরুষ এর তত্ত্ব খাড়া করেন সেখানে পেশীশক্তি বা শারীরিক বলের পরিবর্তে 'বাক্যবল' ও 'বুদ্ধিবল' এর উপর বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, 'বাহুবল' কেবল ধ্বংসসাধন করে এবং তা হল পশুর বৈশিষ্ট্য; পরিবর্তে 'বুদ্ধিবল' ও 'বাক্যবল' এর মাধ্যমেই মানবসভ্যতার যাবতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি হয়:

"বাহুবল পশুর বল - বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলো বকিতে পারিলেই বাক্যবল হয় না। বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্বসকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন - বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি"।[৪৭]

সুতরাং, বঙ্কিম বাঙালির শারীরিক শক্তির তথা তথাকথিত পুরুষত্বের অভাবকে 'বাক্যবল' ও 'বুদ্ধিবল' দ্বারা পূরণ করার চেষ্টা করেন এবং কার্যত এই 'বাক্যবল' ও 'বুদ্ধিবল'কেই বিকল্প দেশীয় পৌরুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে বঙ্কিম নিজে খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, শারীরিক শক্তি বা বাহুবল যেকোনও দেশের জন্যই জরুরি। এ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্টসাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ।...ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ - বাহুবলের অভাব।"[৪৮] বঙ্কিম জোর দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, মেয়েলি, শারীরিক শক্তির অভাব, দুর্বলতা, ভীরুতা ইত্যাদি ছিল উনিশ শতকের বাঙালি পুরুষদের বৈশিষ্ট্য; বাঙালি চিরকাল এমন ভীরু-কাপুরুষ ছিল না। তাঁর ভাষায়, "সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়।...উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা যদি সত্যি বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে।... কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব তাহার মাথায় বজ্রপাত হউক, তাঁহার কথা মিথ্যা"।[৪৯] এখান থেকেই বঙ্কিমের পৌরুষ সম্পর্কে ধারণার মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি বলেছেন যে, বাহুবল নয়, বুদ্ধি ও বাক্যবল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে আবার তিনিই বলেন যে, বাহুবল জরুরি।

বঙ্কিম খুবই সতর্ক ছিলেন ব্রিটিশদের দেওয়া 'মেয়েলি হিন্দু' তকমা সম্পর্কে। তাঁর নিজের ভাষায়, "Effeminate Hindoos' ইউরোপীয় দিগের মখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক।"[৫০] সুতরাং, বঙ্কিমের কাছে ভারতীয় হিন্দুদের পৌরুষকে

পুনঃস্থাপন বা প্রমাণিত করা অনেক বেশি জরুরি বলে মনে হয়। তাই তিনি প্রথমে ব্রিটিশ শাসনকে আক্রমণ করে বলেন যে, ব্রিটিশরা ভারতীয়দেরকে 'মেয়েলি হিন্দু' বলা সত্ত্বেও তাঁরা বহুবার ভারতীয়দের হাতেই পরাজিত হয়েছেন এবং ভারতীয়দের সাহায্য নিয়েই এদেশে তাঁরা শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন: "... আবার ইউরোপীয় দিগের মুখেই ভারতীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে - মহারাষ্ট্র এবং শিখের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন।"[৫১] অর্থাৎ, তিনি চেষ্টা করেন প্রমাণ করতে যে, ভারতীয় হিন্দুরা দুর্বল নয় পুরোপুরি। তবে তিনি স্বীকার করে নেন যে, ভারতীয় হিন্দুদের দুর্বলতাও ছিল। তাঁর ভাষায়, "আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে তাহা ন্যূন্য, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অনীহতায় তাহার হ্রাস ঘটিয়া থাকিবে।"[৫২] বঙ্কিম ভারতীয় হিন্দুদের সেই বীরত্বকে তুলে ধরতেই তাই কৃষ্ণচরিত্র-র মত গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণচরিত্রতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একজন আদর্শ পুরুষ, সাহসী, ন্যায়পরায়ণ, বলবীর্যশালী পুরুষ হিসেবে তুলে ধরেন।[৫৩] তবে একটা বিষয় হল, এখানে সচেতন ভাবে বঙ্কিম কৃষ্ণের যে চরিত্র তুলে ধরেছেন সেই কৃষ্ণ কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব বা অন্য কোনও বৈষ্ণব পদকর্তার বা পুরাণের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং তিনি মহাভারত-এ বর্ণিত কৃষ্ণের চরিত্রকে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ সম্ভবত বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণকে যেভাবে কামুক ও কখনও কখনও জেন্ডার ফ্লুইড চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে তাকে বঙ্কিম আদর্শ পৌরুষ এর প্রতিনিধি বলে মানতে চাননি। তাই মহাভারত এর কৃষ্ণকেই আদর্শ পৌরুষ এর প্রতীক বলে গ্রগণ করেন।[৫৪] সম্ভবত বঙ্কিম গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 'রাধাভাব' ও 'সখীভাব'-এর সাধনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এই সমস্ত জেন্ডার ফ্লুইডিটির বিষয়গুলো যে তথাকথিত পৌরুষ এর পক্ষে বাধা তা সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল।

উপসংহার

বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র - দু'জনেই বিকল্প দেশীয় পৌরুষের তত্ত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করলেও, তাঁরা ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁরা একদিকে বলেছেন দেশীয় পৌরুষের কথা, আবার তাঁরাই আধিপত্যবাদী পৌরুষের মূল উপাদানগুলির (যেমন, পেশীবল) উপর জোর দিয়েছেন। যেহেতু বিবেকানন্দ ও বঙ্কিম - উভয়ই ছিলেন জাতীয়তাবাদীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস, তাঁদের পৌরুষ এর ধারণা জাতীয়তাবাদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছিল। শুধুমাত্র বঙ্কিম বা বিবেকানন্দের মাধ্যমেই নয়, ক্রমাগত ভাবে বাঙালি পুরুষদের প্রতি ব্রিটিশদের আনা 'মেয়েলি' অপবাদ ও আধিপত্যবাদী পৌরুষের তত্ত্বের দ্বারা নিজেদের পৌরুষের জয়গান বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছিল এবং 'মেয়েলিপনা'র অপবাদ ঘোচাতেই তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর তৈরি করা পৌরুষের আধিপত্যবাদী ধারণাকেই আঁকড়ে ধরেন। তাই বলাই যায় যে, কার্যত ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী পৌরুষের ধারণাই আদর্শগত অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল বিশ শতকের প্রথমপর্বে

বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরিত্রগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে। বিবেকানন্দ বা বঙ্কিম - কেউই উগ্র জাতীয়তাবাদ বা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কখনও কোনও কথা প্রত্যক্ষভাবে বলেননি, বরং তাঁরা কেবল পশ্চিমি জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করতে তার বিপরীতে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেশীয় জাতীয়তাবাদকে দাঁড় করানোর কথা বলতেন। কিন্তু, তাঁদের জাতীয়তাবাদে পেশীশক্তি, শারীরিক বল তথা 'বাহুবল', তেজ ইত্যাদির বিষয়গুলি পরবর্তীতে বাংলার বিপ্লবীদল ও বিপ্লবীদেরকে অনুপ্রাণিত করে এবং এই জন্যই বিবেকানন্দ ও বঙ্কিম হয়ে ওঠেন বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনের উৎসগত প্রেরণা।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Roy, Abhik and Michele L. Hammers. "Swami Vivekananda's Rehtoric of Spiritual Masculinity: Transforming Effeminate Bengalis into Virile Men". Western Journal of Communication, Vol. 78, No. 4, July-September, 2014, pp. 550-551; Chowdhury, Indira. The Frail Hero and the Virile History: Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal, New Oxford University Press, 1998, p. 2.

২. Jeffords, Susan. The Remasculization of America: Gender and the Vietnam War, University of Indiana Press, 1989, p. xiii.

৩. Connell, R.W. Masculinities, California University Press, 1995, p. 77.

৪. Ibid, p. 213.

৫. Banarjee, Sikata. "Gender and Nationalism: The Masculinization of Hinduism and Female Political Participation in India". Women's Studies International Forum, Vol. 20, No. 2, 2003, p. 170.

৬. Vance, Norman. The Sinews of the Spirit: The Ideal of Christian Manliness in Victorian Literature and Religious Thoughts, Cambridge University Press, 1985, p.10.

৭. Banarjee, Sikata. op.cit, p. 170.

৮. Sen, Sudipta. "Colonial Aversions and Domestic Desire: Blood, Race, Sex and Decline of Intimacy in Early British India", Sexual Sites, Seminal Attitudes: Sexualities, Masculinities and Culture in South Asia, Edited by Sanjay Srivastava, Sage Publication, 2004, p. 49.

৯. "By his legs you shall know Bengali The Bengali's leg is either skin and bones or else it very fat or globular, also turning at the knees, with round things like a woman's. The Bengali's leg is leg of slave." See, Steevens,W. In India, William Blackwood and Sons, 1899, p. 75.

১০. MacMunn, George. The Martial Races of India, Sampson, Low and Martson & Co., 1933; Krishnaswami, Revati. Effeminism: The Economy of Colonial Desire, University of Michigan Press, 1998, p. 74.

১১. অজানা। "জাতীয় দৈহিক পুনরুজ্জীবন"। চিকিৎসা-সম্মিলনী, বৈশাখ ১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৫), পৃ. ৩৭।

১২. রায়, শ্রীবঙ্কুবিহারী। "বীর্য্য"। চিকিৎসক ও সমালোচক, খণ্ড ২, সংখ্যা ১২, ১৮৯৫, পৃ. ৩১২।
১৩. বসু, রাজনারায়ণ, সেকাল আর একাল, ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৮৮ (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪), পৃ. ৩১।
১৪. রায়, শ্রীরমেশ চন্দ্র। "মেয়েলী বাঙ্গালী"। ভেষজ ও স্বাস্থ্য, শ্রাবণ এবং ভাদ্র, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (১৯৩৪) পৃ. ৩-৭, ৮-১৩।
১৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। "বাঙ্গালার কলঙ্ক", বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য খণ্ড), (সম্পা.), যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৩৩।
১৬. Majumder, Boria. "The Vernacular in Sports History". Economic and Political Weekly, Vol. 37, No. 29, 2000, p. 3069.
১৭. বিস্তারিতের জন্য দেখুন, বসু, প্রদীপ। (সম্পা.)। সাময়িকী: পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন, খণ্ড ১, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
১৮. Rosselli, J. "The Self-Image of Effeteness: Physical Education and Nationalism in 19th Century Bengal". Past and Present, Vol. 86, No. 1, 1980, pp. 121-148; Basu, Gautam. "Bengali Body Building Movement and the Historical Shield Victory: 1870-1911", Social History of Sports: The Indian Context, Edited by Chittabrata Palit, Kunal Books, 2014, pp. 105-118.
১৯. Chattopadhyay, Saayan. "Bengali Masculinity and the National-Masculine: Some Conjectures for Interpretations". South Asian Research, Vol. 31, No. 2, 2011, p. 274.
২০. Roy, and Hammers. op.cit, p. 448.
২১. Sen, A.P. Swami Vivekananda, Oxford University Press, 2000, p. 85.
২২. বিবেকানন্দ, স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৭৪, পৃ.৩৩৫।
২৩. তদেব, পৃ ৩৮৩-৩৮৪।
২৪. বিবেকানন্দ, স্বামী। ভারতের নারী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৪।
২৫. Sil, Narasingha P. Swami Vivekananda: A Reassessment, Susquehanna University Press, 1997, p. 118.
২৬. বিবেকানন্দ, স্বামী। ভারতের নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭-৮।
২৭. তদেব, পৃ. ৬-৯।
২৮. Sen, A.P. op.cit, p. 118.
২৯. Roy and Hammers, op.cit, p. 556.
৩০. বিবেকানন্দ, স্বামী। ভারতের নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।
৩১. উদাহরণ ও বিস্তারিতের জন্য দেখুন, ঘোষ, সূর্যনারায়ণ। বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী, মুন্সি মওয়াবক্স প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত, ১৮৮৪, পৃ. ৩২; অনামী। সুখ সম্ভোগ রত্নাকর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৮৮৯; অজানা। "জাতীয় দৈহিক পুনরুজ্জীবন", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৫১; কবিরত্ন, অবিনাশচন্দ্র। "দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান: অভিগমন বা স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ"। চিকিৎসা সম্মিলনী, বৈশাখ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৫), পৃ. ১৩৩-১৪২; অনামী। "ভারতের অবনতি"। অণুবীক্ষণ, পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ (১৮৭৫), পৃ. ১৯২-১৯৬; সেনগুপ্ত, শ্রীপ্যারীমোহন। "হস্তমৈথুনে বালক ও নবযুবকগণ"। চিকিৎসা-সম্মিলনী, ১২৯৯ (১৮৯২), পৃ.২০৫-২০৭।
৩২. Choudhury, Indira. op.cit, p. 130.
৩৩. Ibid, p. 130.

৩৪. রায়, শ্রীবঙ্কুবিহারী।পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮।
৩৫. Kakar, Sudhir. The Inner World: A Psycho-Analytic Study of Childhood and Society in India, Oxford University Press, 1978, pp. 174-175.
৩৬. Chatterjee, Amitava and Souvic Naha. "The Muscular Monk: Vivekananda, Sport and Physical Culture in Colonial Bengal". Economic and Political Weekly, Vol. XLIX, No. 11, March 15, 2014, pp. 26-27.
৩৭. ফুকোর ভাষায়, "(T)echnologies of the self, which permit individuals to effect by their own means or with the help of others a certain number of operations on their own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform themselves...", দেখুন, Foucault, Michel. "Tenhnologies of the Self", Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, Edited by Luther H. Martin et al, University of Massachusetts, 1988, p. 18.
৩৮. বিবেকানন্দ, স্বামী। ভারতের নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।
৩৯. তদেব, পৃ. ৪২।
৪০. Roy and Hammers. op.cit, p. 554.
৪১. বিবেকানন্দ, স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪।
৪২. প্রভানন্দ, স্বামী। অমৃতবাণী: শ্রী রামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও বিবেকানন্দের বাণী সংকলন, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, এয়োদশ মুদ্রণ, জুন ২০০৫, পৃ.২৮।
৪৩. তদেব, পৃ. ৪০।
৪৪. বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী। স্বামীজির আহ্বান, উদ্বোধন কার্যালয়, ৪৩তম মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ (২০১৫), পৃ. ১-২।
৪৫. Sil, Narasingha P. op.cit, p. 117.
৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। পলাশি থেকে পার্টিশন: আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৩, পৃ. ১৮৪।
৪৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। "বাহুবল ও বাক্যবল"। বঙ্গদর্শন, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৫, ভাদ্র ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৭), পৃ. ২৫৬।
৪৮. তদেব, পৃ. ২৫৬।
৪৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। "বাঙ্গালার কলঙ্ক", বঙ্কিম রচনাবলী, খণ্ড ২, (সম্পা.), যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ. ২৮৮।
৫০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। "ভারত কলঙ্ক: ভারত পরাধীন কেন?"। বঙ্গদর্শন, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (১৮৭২), পৃ. ৯।
৫১. তদেব, পৃ. ৯।
৫২. তদেব, পৃ. ১০।
৫৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। কৃষ্ণচরিত্র, হেয়ার প্রেস, ১৮৮৬।
৫৪. Kaviraj, Sudipta. The Unhappy Consciousness: Bankimchandra Chattopadhyay and the Formation of Nationalist Discourse in India, Oxford University Press, 1995, pp. 77-78.

পূর্ব ভারতের অন্যতম স্বদেশব্রতী শিক্ষাবিদ : ড. ত্রিগুণা সেন (১৯০৫-১৯৯৮)

কুন্তল দেবনাথ
স্নাতকোত্তর ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ড. ত্রিগুণা সেন ছিলেন একজন সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক কর্মী এবং সমাজকর্মী। ১৯০৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর পূর্ব ভারতের আসামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' (BTI) থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন এবং ১৯৩৩ সালে মিউনিখের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরের উপাধি লাভ করেন। ছাত্রবস্তাতেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের মত বিপ্লবী গোষ্ঠীর সাথে তাঁর যোগাযোগের ফলে তিনি সহজেই ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসেন এবং এর ফলে তাঁকে প্রথমে জেলবন্দি এবং পরে বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয়। ড. সেন জীবনের একটি বৃহৎ সময় যাদবপুরে কাটিয়েছিলেন। এই সময় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (CET)-কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরিত করতে তিনি উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদন করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শক্ত ভীতের উপর দাঁড় করানোর পর আরও বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে শরিক হয়ে পড়েন ড. সেন—শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী এবং পরে পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রী হিসেবে—সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষানীতির ১৯৬৮ রূপায়নের তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সুবিদিত। মাতৃভূমির প্রতি সাদা নিবেদিত প্রাণ ত্রিগুণাবাবু এই সময়কালেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম নেপথ্যচারীর ভূমিকা পালন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে শিক্ষাবিদ হিসাবে ত্রিগুণা সেনের বহুবিধ কর্মকাণ্ড আলোচনার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো যে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা কিভাবে দেশের শিক্ষা কাঠামো উন্নয়নে সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করেছিল।

সূচক শব্দ: ড. ত্রিগুণা সেন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষানীতি, ইত্যাদি।

মূল প্রবন্ধ

সালটা ১৯০৫। লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগের প্রতিবাদে উত্তাল দেশপ্রেমিকরা। ইতিমধ্যেই জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি 'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলন বিকাশ লাভ করেছিল। এই ধারাবাহিকতার প্রথম মহান গঠনমূলক প্রচেষ্টা ছিল ১৯০৫ সালে স্থাপিত

'National Council of Education', Bengal.[১] ১৯১০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিচালনা করে। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, তাঁর 'Education for Industrialisation' গ্রন্থে কলেজের ছাত্রদের 'যাদবপুরিয়ান'[২] (Jadavpurians) বলে প্রশংসা করেছেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, তারা "বৃহত্তর যাদবপুর এবং বৃহত্তর বাংলার, প্রকৃতপক্ষে, বৃহত্তর ভারতের স্থপতি" হবেন।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য শিক্ষাবিদ ড. ত্রিগুণা সেন নিজে একজন 'যাদবপুরিয়ান'। তিনি ছাত্র, শিক্ষক এবং পরে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসাবে একটি গৌরবময় ভবিষ্যতের কল্পনা ও নির্মাণ করেছিলেন। ফলস্বরূপ ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বিনয় কুমার সরকারের ভবিষ্যৎবাণী এভাবেই সত্য হয়েছিল—যাদবপুর 'বৃহত্তর যাদবপুর' হয়ে উঠেছিল। তবে, বিনয় সরকারের কল্পনার চেয়ে এটি আরো বৃহৎ ছিল, কেননা অধ্যাপক সরকারের কল্পনামতো এটি কেবলমাত্র একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসাবেই বিকশিত না হয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। যাইহোক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ড. সেনের টুপিতে একমাত্র পালক ছিল না।

তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) এবং পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর ডিরেক্টর হিসাবে, ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনের সদস্য হিসাবে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (BHU)-এর উপাচার্য হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী এবং পরে পেট্রোলিয়াম, ও রাসায়নিক মন্ত্রী হিসেবে দেশের জন্য মূল্যবান পরিষেবা প্রদান করেছেন।[৩] ড. সেনের এই বহুমুখী কর্মকাণ্ড ও সাফল্য, তাঁর সৃজনশীল কল্পনাশক্তি এবং সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেয়।

কর্মধারার প্রেক্ষাপট

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্লোগান তুলেছিলেন: 'Agitate', 'Education' এবং 'Organize'[৪]; অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে (বঙ্গভঙ্গ) আন্দোলন করা, ছাত্রদের জাতীয় ধারার শিক্ষা দেওয়া এবং NCE, Bengal-কে সংগঠিত করা। বঙ্গভঙ্গের কারণে স্বদেশী আন্দোলন এবং বয়কট আন্দোলনের যে সূত্রপাত ঘটেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল'-এর ভিত্তি তৈরি হয়েছিল।[৫] তবে, বঙ্গভঙ্গ NCE প্রতিষ্ঠার পেছনে তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে কাজ করেছিল, এর প্রেক্ষাপট রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বাংলার নবজাগরণের গর্ভ থেকে[৬] এবং বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা তাদের এতদিনকার সংগ্রামকে জাতীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকলেও, যে ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা তাঁর জীবন ও কর্মধারার গতিপথ নির্ধারণের প্রেক্ষাপট হিসাবে সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রসঙ্গে আলোচনার যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে।

এ দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূচনা থেকেই ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষা ছিল মূলত ভাষা ও সাহিত্যচর্চা মূলক। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড

আমহার্স্টের কাছে তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে লিখেছেন যে, আমাদের প্রয়োজন—'Useful Science'—'আবশ্যকীয় বিজ্ঞান শিক্ষা'।[৭] তবে কর্তৃপক্ষ সেদিন তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন।

উনিশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বাংলায় কারিগরি শিক্ষা ও বাংলা মাধ্যমের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। ১৮৮৭ সাল থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের প্রায়-বার্ষিক প্রস্তাবমালা[৮], যার লক্ষ্য ছিল টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্য আন্দোলন। গুরুদাস ব্যানার্জি[৯], বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়[১০], এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষার স্বপক্ষে জোরালো সাওয়াল করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের'[১১] প্রবন্ধটি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার খামতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। সতীশচন্দ্র মুখার্জীও কারিগরি ও শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় শিক্ষাব্রতীরা তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে "Over-literary, all-too-academic, unscientific and unindustrial"[১২] বলে আক্রমণ করেছিলেন।

ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তার প্রথম ধাক্কায় স্বভাবতই জোর পড়েছিল স্বাধীন শিক্ষার উপর। ১৯০৫ সালের অক্টোবর, নভেম্বরে কার্লাইল সার্কুলার ও লায়ন সার্কুলারের হাত ধরে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের উপর উপনিবেশিক দমনপিরনের খড়্গ নেমে আসলে[১৩] বিকল্প জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে অনুভূত হতে লাগলো—এইরকম পরিস্থিতিতে রংপুরে প্রথম একটি 'ন্যাশনাল স্কুল'[১৪] গড়ে উঠেছিল। এরই চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯০৫ এর ১১ই মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ভাষায়, "The first great constructive effort of the swadeshi movement... the eldest and the first born progeny of the swadeshi cause"[১৫], NCE, Bangal-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'সজীব মঙ্গল'[১৬] বলে অভিহিত করেছিলেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল, To Organize a System of Education-'Literary, Scientific and Technical on National Lines and Under Exclusively National Control'।[১৭]

গঠিত হলো জাতীয় কলেজ। তবে প্রথম থেকেই পরিষদের পরিচালক বর্গের মধ্যে একাডেমিক বিতর্ককে[১৮] কেন্দ্র করে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম সমন্বিত 'National College'; অন্যদিকে তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 'Society for the Promotion of Technical Education' (SPTE) দ্বারা পরিচালিত 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' (BTI) তাদের সমান্তরাল অস্তিত্ব বজায় রাখে।[১৯] যদিও পরবর্তীকালে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই দুটি প্রতিষ্ঠান ঘটনার চাপে—যেমন স্থানাভাবে—একত্র হয়ে যেতে বাধ্য হয়।[২০] তবে কালক্রমে জাতীয় কলেজটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং BTI অনেকাংশে সফল হয়েছিল। কেননা লোকের বেশি আগ্রহ ছিল ব্যবহারিক টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে, বাস্তব প্রয়োজনের দিকে।

তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'পরিষদ' সরকারকে যুদ্ধোপযোগী সমরাস্ত্র দিলে ব্রিটিশ সরকারও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়টির প্রতি এতদিনকার ক্ষোভ পরিত্যাগ করে কিছুটা নরম মনোভাব গ্রহণ করে।[২১] এ প্রসঙ্গে অমিত ভট্টাচার্য বলেছেন, NCE-র পুরোধা

ব্যক্তিদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট উপনিবেশিক সরকার-বিরোধী মনোভাব ছিল; অন্যদিকে সরকারের প্রতি SPTE-র মনোভাব ছিল মূলত সহযোগিতামূলক।[২২] তাই বলে আমরা কখনো এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে, জাতীয় প্রকৌশল কলেজ তার ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব পুরোপুরি বর্জন করেছিল। কেননা ত্রিগুণা সেনের মত এই কলেজের বহু ছাত্র পরবর্তীকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ঠিক এইরকম একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমাদের আজকের আলোচ্য ড. ত্রিগুনা সেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' (BTI)-এর সঙ্গে যুক্ত হন—প্রথমে ছাত্র, পরে শিক্ষক এবং আরো পরে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসাবে। ড. সেনের কর্মবহুল জীবন ও সম-সময় নিয়ে আলোচনা হেতু আমরা তাঁর শৈশবকাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতেই পারি।

স্বদেশব্রতী শিক্ষার্থী

১৯০৫ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর আসামের একটি ডাকঘরে ত্রিগুণা চরণ সেন জন্মগ্রহণ করেন—বাবা ও মায়ের নাম যথাক্রমে গোলকনাথ সেন এবং সুশীলাসুন্দরী দেবী। তাঁর মামা ছিলেন প্রখ্যাত I.C.S তথা ব্রতচারী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ গুরুসদয় দত্ত। গুরুসদয় দত্তের উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবাদী প্রভাব তরুণ ত্রিগুণার বাল্যজীবনের উপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল।[২৩] তিনি ১৯২১ সালে শিলচর সরকারি হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ১৯২৩ সালে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে আই. এস. সি. পরীক্ষা পাশ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যাদবপুরে অবস্থিত কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন। শুরু হলো ড. সেনের কলকাতা জীবন—প্রকৃত অর্থে স্বদেশব্রতী হয়ে ওঠার সংগ্রাম। তাঁর আগ্রহের কারণেই জাতীয় কলেজের 'স্বদেশী চেতনা' তাঁর মধ্যে অতি দ্রুত সঞ্চারিত হয়। বিশেষ করে যেভাবে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক এই কলেজের ডিপ্লোমাকেই স্বীকৃতি না দেবার ঘটনা[২৪] অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মত তাঁকেও বিচলিত করেছিল। অথচ এই কলেজের কৃতি ছাত্ররা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গেই গবেষণা বা কাজ করার সুযোগ পেত।[২৫]

ইতিমধ্যেই শিলচরে থাকাকালীন তিনি জাতীয় আন্দোলনের গুঞ্জন শুনেছিলেন। ফলে কলকাতায় এসে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দল ও কর্মীদের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।[২৬] একজন স্বদেশ প্রেমী হিসাবে তিনি তাঁর শিক্ষায়তন হিসাবে BTI-কে বেছে নিয়েছিলেন। কেননা এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রী অরবিন্দ এবং রাসবিহারী ঘোষের মত দেশপ্রেমিকদের নামের সাথে যুক্ত ছিল।[২৭] জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে তখনো অরবিন্দ ঘোস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের স্বদেশ চেতনা ছড়িয়ে ছিল।

একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী হিসাবে পরবর্তীকালে ত্রিগুণাবাবুর যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, তার সূচনা সম্ভবত হয়েছিল যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। এই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে জাতীয় চেতনা বিকাশ ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের জন্য কলেজের অনেক ছাত্রকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়েছিল, অনেককে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জেলে পাঠানো হয়েছিল; এমনকি কলেজে

পড়াকালীন ত্রিগুণা সেন যে হোস্টেলে থাকতেন, সেই হোস্টেল থেকেই গোপীনাথ সাহা একদিন অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে গুলি করতে বেরিয়েছিলেন[২৮]—এই ধরনের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ড. সেনের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটায় এবং তিনি তৎকালীন বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময়কালেই তিনি তাঁর বিশেষ বন্ধু প্রথম চক্রবর্তীর মাধ্যমে বিপ্লববাদী অনুশীলনী সমিতির কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন।[২৯] জানা যায় তিনি এই সময় যুগান্তর দলের হুগলি গোষ্ঠীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।[৩০] স্বভাবতই তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দৃষ্টি তাঁর উপরে পতিত হয়—পরবর্তীকালে এই জন্য তাঁকে অনেক দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিষয়ে আমরা আবার পরে আলোচনা করব।

তাছাড়া, যান্ত্রিক বিদ্যার যন্ত্রণায় ছাত্রদের আবদ্ধ না রেখে, পাশাপাশি তাদের সমাজবিজ্ঞান শিখনের মাধ্যমে জাতীয় কলেজ ত্রিগুণাবাবুদের নিছক কেরিয়ারিস্ট না বানিয়ে সমাজ সচেতন প্রযুক্তিবিদ হিসাবে গড়ে তুলতে যে বহুলাংশে সফল হয়েছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, ভারতীয় দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হতো[৩১] এবং এই বিষয়গুলির উপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অম্বিকাচরণ সেনের মত বিশিষ্ট কবি ও পন্ডিতের দ্বারা বিভিন্ন বক্তৃতার আয়োজন করা হতো।[৩২] এই বিষয়গুলিই ড. সেনের স্বদেশব্রতী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ এবং বিকশিত করেছিল।

ড. সেন ১৯২৬ সালে BTI থেকে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন এবং পরের বছর (১৯২৭) ওই কলেজেই একজন 'ইনস্ট্রাক্টর'[৩৩] হিসেবে যোগ দেন এবং সেখানে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি ওই বছরই বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট (BTI)-এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়—কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (CET)। জাতীয় কলেজের কর্তৃপক্ষ সবসময় চাইতেন যে তাদের শিক্ষকেরা বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে আরো দক্ষ হয়ে উঠুক।[৩৪] কেননা তখনও ভারতবর্ষে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা ছিল মূলত সাহিত্যচামূলক। কর্তৃপক্ষের এই অনুপ্রেরণা ত্রিগুণাবাবুর মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এবং তিনি 'ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট' থেকে বৃত্তি নিয়ে[৩৫] ১৯২৯ সালে জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বিনয় কুমার সরকারের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, "Two scholars of the N.C.E. (Triguna Sen and Bata Ghosh) sent to Germany for Doctorate with the help, in part, of stipends from the Deutsche Akademie (German Academy) of Munich.[৩৬]

পাশ্চাত্যে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

'S.S. Victoria' নামক বণিক জাহাজে যাত্রাপথে ত্রিগুণাবাবুর সঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে পরিচয় হয়[৩৭]—আমরা পরবর্তীতে দেখব এই পরিচয় বারে বারে ত্রিগুণাবাবুর কার্যকলাপকে বহুলাংশে প্রবাহিত করেছিল। জার্মানিতে ডক্টরেট করার সময় তিনি বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে যোগাযোগ করার প্রচেষ্টায় কখনোই সরে আসেননি। মিউনিখে গবেষণার কাজ করার সময় ত্রিগুণা

ভারতীয় বিপ্লবী তারকনাথ দাসের সাথে যোগাযোগ করেন—বিপ্লবী তারকনাথ তখনও জার্মানিতে পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতার উৎসাহ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৩৮] এমনকি তিনি ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে জার্মানিতে বসবাসকারী N.C.E-র গবেষকদের 'Deutsche Akademie'-র সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে সাহায্য করেন।[৩৯] একই সময়ে বিখ্যাত পন্ডিত বিনয় কুমার সরকারের সঙ্গে ত্রিগুণাবাবুর পরিচয় হয়। তিনিও তখন জার্মানিতে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই দুইজনের স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় শিক্ষার প্রতি দৃপ্ত মনোভাব ড. সেনকে যে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। এই মনোবলের জোরেই তিনি জার্মানিতে তাঁর প্রয়োজনীয় বিধিবৎ কাগজপত্রে লিখতে অস্বীকার করেছিলেন যে, তিনি 'ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনাধীন'—জোড়ের সাথে বলেছিলেন, "No, I am an Indian, plane and simple", "neither more nor less".[৪০]

জাতীয় শিক্ষার আদর্শের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ত্রিগুণা সেন কিন্তু শুধুমাত্র একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না—সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নানা প্রান্তেই ছিল তার অবাধ বিচরণ। তাইতো ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মিউনিখ সফরের সময় ড. সেন-সহ ভারতীয় ছাত্ররা তাঁর সামনে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করে।[৪১] আমরা সকলেই জানি ছাত্র জীবন থেকেই ত্রিগুণাবাবু 'গ্রন্থকীট' ছিলেন না—ছিলেন একজন সামাজ সচেতন স্বদেশ সন্তান। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই ১৯৩০ সালে জার্মানিতে তিনি প্রায় একার চেষ্টায়-'Indian Students Union'[৪২] গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিতে ভারতীয় ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের মধ্যে স্বদেশ চেতনার প্রসার। তিনিই ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। তাছাড়া জার্মানিতে বিদেশি ছাত্রদের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া 'স্টুডেন্ট কার্ড' পুনরায় চালু করতে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়।[৪৩]

যাইহোক জার্মানিতে থাকাকালীন (১৯২৯-৩২) ত্রিগুণা সেন মিউনিখের 'Idraulisches Institut' (Hydraulic Institute)-এর গবেষণাগারে তিন বছর কাজ করেছিলেন।[৪৪] এই তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ১৯৩৩ সালে তিনি মিউনিখের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগর্ভস্থ পয়:প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। এরপর কিছু সময়ের জন্য (প্রায় ৬ মাস) তিনি মিউনিখের বাভারিয়ান প্রাদেশিক জল সরবরাহ কর্মশালায় এবং খাল নির্মাণ অফিসে কাজ করার পর[৪৫] অবশেষে ১৯৩৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।

জীবনের সংকটকালীন পর্ব

আমরা জানি তিরিশের দশকটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ থেকে অনুশীলন যুগান্তর দলের কার্যকলাপে তখন সারা বাংলা উত্তাল। যুবশক্তি তখন স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নে উদ্বেল।[৪৬] এই বিদ্রোহী মনোভাবকে দমন করার লক্ষ্যে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয় ছাত্র যুবদের। ছাত্রবয়স থেকেই অনুশীলন সমিতির মতাদর্শ বিশ্বাসী

ড. সেন প্রবাসেও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। জার্মানি থেকে দেশে ফিরে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[৪৭] তাঁর এই সক্রিয়তাগুলির জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেফতার করলো ইংরেজের পুলিশ। প্রথমে বিভিন্ন পুলিশ লক-আপ তারপর প্রেসিডেন্সি জেল এবং অবশেষে তাঁকে বহরমপুর ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়।[৪৮]

প্রায় এক বছর পর ত্রিগুণাবাবুর জেল থেকে মুক্তি ঘটলেও, শর্তসাপেক্ষে তাঁকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং পুলিশি প্রহরায় তিনি আসামে প্রেরিত হন। সেই সময় পূর্ব পরিচিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কাছে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ দেবার আবেদন জানান ড. সেন। রাধাকৃষ্ণান সম্মতি দিলেও, ত্রিগুণা সেনকে উপনিবেশিক সরকার বাংলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি, বরং তাঁকে 'Second Route'[৪৯] বেছে নিতে বলে। তবে আমরা জানি, আসাম থেকে বাংলা প্রবেশ না করে দক্ষিণ ভারত যাওয়া ছিল অসম্ভব। পরবর্তীকালে গুরুসদয় দত্তের অনুরোধে স্যার J.J. Ghandy ড. সেনকে জামশেদপুরের টাটা ইস্পাত কারখানায় একটি উচ্চপদস্থ চাকরির প্রস্তাব দিলে, তখনো একই কারণে তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারেননি।[৫০]

শেষপর্যন্ত ১৯৪৩ সালে তৎকালীন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ণধার বিধানচন্দ্র রায় ও স্নেহাংশ আচার্য ত্রিগুণাবাবুকে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির বিশেষ প্রশাসনিক অফিসার পদে[৫১] নিয়োগ করেন। এক নামহীন লেখক জানিয়েছেন, তখন প্রতিষ্ঠানটি একটি বাস্তব সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল।[৫২] শ্রী Y. V Naranje-র কাছে ড. সেনের লেখা একটি চিঠি থেকে জন্য যায়, নিজের 'Alma mater'-এর কাজে যোগ দিতে এবার তিনি ইংরেজ সরকারের বাংলায় প্রবেশ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে[৫৩] যাদবপুরে এসে কাজে যোগ দেন। এরপর থেকে জীবন জুড়ে যাদবপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই হয়ে দাঁড়ায় এই স্বদেশ ব্রতীর সাধনক্ষেত্র। তারপর থেকে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলি অনেক কমে গিয়েছিল এবং যাদবপুর কলেজ এবার থেকে বিপর্যয়ের দিকে নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দিকে যাচ্ছিল।

কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির কর্ণধার

১৯৪৩ সালে ত্রিগুণা সেন যখন বিশেষ প্রশাসনিক অফিসার হিসাবে যাদবপুর কলেজে যোগদান করেন, দেশে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রযুক্তিশিক্ষা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকারের। যুদ্ধের প্রয়োজনেই যাদবপুরে যুদ্ধ প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং তৈরি হলো 'Manufacturing Department'[৫৪]—সরকার নিজের প্রয়োজনেই এই বিভাগের দিকে আর্থিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিল। এছাড়া সরকার ১০৪ জন শিক্ষার্থীর বিশেষ শিক্ষণের ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করছি, ওই সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গোপাল হোসিয়ারি কোম্পানির কাছে সরকার সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অর্ডার দিলে এই স্বদেশি শিল্প সংস্থা কিন্তু চাপের মুখেও সরকারের এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি।[৫৫] বলাই যায় একই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একই অঞ্চলের অন্তর্গত যাদবপুর ও গোপাল হোসিয়ারি দুটি বিপরীত ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

নতুন উদ্যমে পথ চলা যাদবপুরের জাতীয় কলেজ তার প্রথম সমাবর্তনে মিলিত হলো ১৯৪৪-এ। সেই বছরই ৮০০ টাকা মাসিক বেতনে ত্রিগুণা সেন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হলেন।[৫৬] তাঁর প্রচেষ্টাতেই ওই বছরে এতদিনকার 'ডিপ্লোমা' প্রদানকারী কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং 'ডিগ্রী' কলেজে রূপান্তরিত হলো।[৫৭] অগ্রগতির নতুন পথের নব কর্ণধার হিসাবে ড. সেন কলেজের Alumni Association, ব্যক্তিগতভাবে প্রাক্তন ছাত্র, পৌরসভা, সরকার সবার কাছে কলেজের উন্নতির জন্য সাহায্যের আহ্বান জানালেন।[৫৮] অনেকটা সফলও হলেন এই কাজে। তাছাড়া তিনি ১৯৪৫ সালের ২৮ অক্টোবর ইন্দোরে গোবিন্দরাম সাক্সেরিয়া চ্যারিটি ট্রাস্টের সম্পাদকের সাথে দেখা করেন, যাতে তাদের তহবিল থেকে যাদবপুর কলেজের জন্য যথেষ্ট অনুদান পাওয়া যায়[৫৯] এবং নিজেও ১৯৪৬ সালে Alumni Associations-এর রজত-জয়ন্তীর বছরে ১,২৫০ টাকা অ্যাসোসিয়েশনকে দান করেন।[৬০] তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই প্রাক স্বাধীনতা পর্বে সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৪৪), জহরলাল নেহেরু ও জন মাথাই (১৯৪৫)-এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাদবপুর কলেজের সমাবর্তনে অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।[৬১]

মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ

শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মেও আত্মনিয়োগ করেন—ড. সেনের নেতৃত্বে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাজ সচেতন ছাত্ররা ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময়, দুঃস্থ মানুষদের খাদ্যের অভাব মোচনের জন্য কলেজে একটি ক্যান্টিন খুলেছিলেন।[৬২] ১৯৪৬-এর 'কমিউনাল রায়তে'র সময় ড. সেন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন যাদবপুরের ক্যাম্পাসে।[৬৩] তাছাড়া কলেজের 'ব্লু আর্থ' ওয়ার্কশপ নির্মাণে নিয়োজিত নোয়াখালীর ৯৩ জন মুসলমান শ্রমিককে ড. সেন ও তাঁর ছাত্ররা রক্ষা করার জন্য জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিল।[৬৪] এই মানবিকতার ধর্মকেই তিনি আজীবন ছাত্রদের মনে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন কখনোই চাননি যে তারা শুধু ক্যারিয়ারিস্ট রোবটে পরিণত হোক।

১৯৪৭ সালে দেশ একই সঙ্গে বিভক্ত ও স্বাধীন হলো। নতুন আসার আলো জাগ্রত হল সর্বত্র। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও পেল সরকারি স্বীকৃতি। বিভিন্ন সময়ে এই ঐতিহ্যশালী কলেজ পরিদর্শনে আসলেন, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, নোবেল জয়ী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ এমনকি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[৬৫] ১৯৪৭-এ পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যখন কলকাতায় চলে আসে তখন ড. সেন শিয়ালদহ স্টেশনে শরণার্থী শিবিরে নিজের ছাত্রদের নিয়ে উদ্বাস্তুদের খাবার ও জল পরিষেবা প্রদান করেন।[৬৬] পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় তখন কলেজের মূল সংগঠন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি। সেই সময় তাঁর উৎসাহে ও কলেজের অধ্যক্ষ ত্রিগুণা সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদের জন্য তিন বছরের 'Overseers Course'[৬৭] চালু হল। সমাজ সচেতনতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল যাদবপুরের জাতীয় কলেজ। ক্যাম্পাসের বাহিরে ও পার্শ্ববর্তী উদ্বাস্তু অধ্যুষিত

অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার প্রসারে তৎপর হলেন ত্রিগুণা সেন, বিশেষ করে স্থানীয় বিজয়গড় কলেজের কর্মসমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে ত্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের থেকে অর্থ আদায়ের সাহায্য করে মহাবিদ্যালয়টির উন্নতি সাধনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৬৮] মূলত উদ্বাস্তুদের কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ করার প্রয়োজনেই ড. সেনের প্রচেষ্টাতেই যাদবপুর ক্যাম্পাসে গড়ে উঠলো যাদবপুর পলিটেকনিক। এখান থেকে ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের 'ডিগ্রী' অর্জনের সুবিধার্থে যাদবপুর কলেজে স্থাপিত হলো সন্ধ্যা কোর্স। একই প্রাঙ্গণে ক্রমশ গড়ে তোলা হলো প্রিন্টিং টেকনোলজির কলেজ, সেন্ট্রাল গ্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠান। ড. সেনের হাত ধরে কলেজটি চলতে লাগলো অগ্রগতির নতুন পথে। এই কলেজকেই M. Fouchet (ফ্রান্সের) পশ্চিম বিশ্বের মহান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর সমতুল্য বলে অভিহিত করেছিলেন।[৬৯]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম রূপকার

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতের সমসাময়িক সমস্যাগুলি সমাধান প্রকল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা উপর পূর্ণ প্রত্যয় জ্ঞাপন করেন।[৭০] নবগঠিত রাষ্ট্রের পরিকাঠামগত উন্নয়ন প্রভৃতির লক্ষ্যে দেশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি কর্মীদের প্রশিক্ষণকে সংগঠিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়—স্থাপিত হতে থাকে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি' (I.I.T)-র মত বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সারাদেশের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই বাদ যায়নি যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মত জাতীয় ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। ১৯৫৫ সালের মধ্যে সি.ই.টি দৃঢ়ভাবে দেশের শিক্ষার মানচিত্রে নিজেকে তুলে ধরেছিল। কিন্তু N.C.E-র প্রতিষ্ঠাতাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন অপূর্নই থেকে গেল—স্বপ্নদর্শী ড. সেনেরও বহুদিনের স্বপ্ন ছিল, যাদবপুরকে সুষম জাতীয় শিক্ষার আঙ্গিকে কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি শাখা সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে N.C.E-কে ঘিরে থাকা দুটি প্রধান সমস্যা—তহবিলের অভাব এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাব ইতিমধ্যেই অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছিল—ইতিপূর্বেই তা আমরা আলোচনা করেছি। তবুও বিদেশে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। কারণ কাউন্সিল ডিগ্রি প্রধানের আইনগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল না।[৭১] আবার কাউন্সিলের স্বতন্ত্রতা এবং এর ঐতিহ্যের কারণে এর কর্তৃপক্ষ সমসাময়িক কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে N.C.E-র অন্তর্ভুক্তি লাভের কথা ভাবতে পারেনি। এইসব কারণের জন্যই ১৯৫৪ সালের আগস্টে ত্রিগুণা সেন-সহ N.C.E কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়ার জন্য আবেদন করে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কাছ থেকে যাদবপুরের CET-কে বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত করার সুপারিশ আসে।[৭২]

শেষপর্যন্ত ১৯৫৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা N.C.E-র সভাপতি ড. বিধানচন্দ্র রায় বিধানসভায় 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল' উত্থাপিত করেন। বিলে পরিষ্কার যে, 'An act to establish and incorporate a university

at Jadavpur in the district of 24-parganas in West Bengal'।[৭৩] বিলটি বিধানসভার অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে অতীন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল ভট্টাচার্য, হরিপদ চ্যাটার্জী[৭৪] প্রমুখের বিরোধিতা সত্বেও পাস হয়ে যায়। সতীশচন্দ্র মুখার্জি-সহ NCE-র পুরোধা ব্যক্তিরা যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সফল সমাপ্তি পর্বে আমরা দেখি ত্রিগুণা সেনকে।

অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য বলেছেন, দুটি উপাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার পিছনে কাজ করেছিল। প্রথম উপাদান স্বয়ং অধ্যাপক ত্রিগুণা সেন, যিনি ১৯৪৪ সালে CET-র প্রিন্সিপাল ও কর্ণধার হয়েছিলেন। দ্বিতীয় উপাদান ওই একই বছরে ডা. বিধানচন্দ্র রায় NCE-র সভাপতি হন এবং ১৯৪৭ (১৯৪৮) সালে তিনি নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন।[৭৫] এর আইনি দিকটি সামলেছিলেন বিধানচন্দ্র রায় এবং ত্রিগুণা সেন যাদবপুর কলেজকে তিনটি ফ্যাকাল্টি—আর্টস, সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করেন।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর বা উপাচার্য পদে নিযুক্ত হলেন ত্রিগুণাবাবু। প্রথম থেকেই কলা, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলাই ছিল ত্রিগুণা সেনের লক্ষ্য। এই লক্ষ বাস্তবায়নের সাথী হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই পেয়েছিলেন রেজিস্ট্রার প্রবীর চন্দ্র বসুমল্লিক, গোপাল চন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র গুহ এবং হীরালাল রায়ের মতো শিক্ষকদের। আগে থাকতেই প্রকৌশল বিভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, তাই কলা ও বিজ্ঞান বিভাগকে প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ড. সেন যেমন তুলনামূলক সাহিত্য বা ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের[৭৬] মত নতুন বিষয় সমূহ চালু করলেন, তেমনি দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের আহ্বান জানালেন তিনি। এদের মধ্যে আমরা অমর্ত্য সেন, বুদ্ধদেব বসু, সুশোভন সরকার প্রমুখের নাম করতে পারি।[৭৭] তাছাড়া বহিরাগত পরীক্ষার্থী এবং স্কুল ও কলেজে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা যাতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করতে পারে, তার জন্য তিনি একটি খন্ডকালীন 'Night Classes'[৭৮] খোলার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক উপযোগীতার পরিসর প্রসারিত করেন।

যাদবপুরকে একটি এডুকেশনাল হাব হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ড. সেন সেখানে কে. জি. থেকে পি. জি. শিক্ষাক্রম প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। ফলে গড়ে ওঠে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ১৯৫৭ সালে গড়ে তোলেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠ—ইউনিভার্সিটিরই ক্যাম্পাসে। ত্রিগুণা সেনের পরামর্শ অনুযায়ী লীলা চৌধুরী নামে এক শিক্ষানুরাগী মহিলাকে এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।[৭৯]

সমাজব্রতী শিক্ষক

শুধুমাত্র একাডেমিক বিষয় বা পড়াশোনা নয়—ত্রিগুণা সেন তাঁর ছাত্র, সহকর্মী ও শিক্ষকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী এলাকায় সামাজিক কর্মে যোগদানের অনুপ্রেরণা যোগান। ১৯৫৯-৬০ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালিকাপুর অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে ত্রাণ ও রিলিফের ব্যবস্থা করতে এবং ১৯৬৪ সালে বিহারে

খরায় কবলিত মানুষদের পুনরোদ্ধারে ড. সেনের ভূমিকা প্রশংসিত।[৮০] তাছাড়া তাঁরই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুস্থ ছাত্রদের সাহায্যার্থে 'Poor Students Aid Fund', 'The Youth Welfare Committee', 'Students Recreation Centre', 'Cheap Store', 'Cheap Canteen' প্রভৃতি গড়ে তোলা হয়।[৮১]

তাঁকে মানুষের দাবির কাছে মাথা নত করে কলকাতার মেয়র হিসাবেও কিছুকাল (১৯৫৮-৫৯) কাজ করতে হয়েছিল।[৮২] এই সময় তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে দুর্গাপুর শিল্পনগরী, বিধান নগর ও পাতাল রেলের প্রাথমিক পরিকল্পনা রুপায়ন করেছিলেন।[৮৩] খাদ্যে ভেজাল নিরোধেও তাঁর অবদান যথেষ্ট স্মরণীয়। ১৯৫১ সালে ডা. অরুণ সেন যখন 'Students Health Home' (SHH) শুরু করেন, তখন ড. সেন এর গঠনে সহায়তা করেছিলেন এবং ১৯৫৯ সালে তাঁর নির্দেশেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় SHH-এর সর্বজনীন সদস্য হয়ে ওঠে। তিনি যখন কলকাতার মেয়র ছিলেন তখন তাঁর উদ্যোগে খানিকটা বিধানচন্দ্র রায়ের অমতে মৌলালীর মোড়ে কলকাতা পৌরসভার দেওয়া জমিতেই জনগণের অর্থে গড়ে ওঠে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অট্টালিকা।[৮৪] তাছাড়া, তৎকালীন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, কলকাতার মেয়র হিসেবে ত্রিগুণাবাবুর উদ্যোগেই প্রথম স্কুল ফাইনাল ও ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম দশ স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়।[৮৫]

জনজীবনের প্রতি ড. সেনের কর্তব্য ভিন্ন মাত্রায়ও প্রকাশ পায়। তিনি ১৯৫৭ সালে কিছুদিন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর হিসাবেও কাজ করেন এবং পরে ১৯৬৩ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের সেন্ট্রাল বোর্ডের অন্যতম ডিরেক্টরও মনোনীত হয়েছিলেন।[৮৬] ১৯৬৪ সালে তাঁকে ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ইত্যাদির সদস্য ছিলেন।[৮৭] অসংখ্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ তিনি ১৯৬৫ সালে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণে ভূষিত হন।

তবে, উপরোক্ত পথগুলিতে অধিষ্ঠান করলেও, তখনো যাদবপুরের উপাচার্য হিসাবে তিনি কাজ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত কোঠারি কমিশনের অন্যতম সদস্য[৮৮] হিসাবে কাজ করবার সময় এই সম্পর্ক বাস্তবত শিথিল হতে শুরু করে। বিশেষ করে কমিশনের বিভিন্ন সাব-গ্রুপ যথা 'Task force on Manpower' 'Task force on Professional', 'Vocational and Technical Education' (ড. সেন এই গ্রুপের Convener ছিলেন)-এর অন্যতম সদস্য[৮৯] হিসাবে তাঁকে এই সময় প্রায় সর্বক্ষণ পরিশ্রম করতে হত। শেষপর্যন্ত ১৯৬৬ সালে নীতিগত কারণে ত্রিগুণা সেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ছাড়লেন—কেননা শিক্ষা কমিশনে তাঁরই সুপারিশ ছিল, কোনও উপাচার্যেরই দশ বছরের বেশি ওই পদে থাকা উচিত নয়।[৯০]

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর পর, আরো বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে শরিক হয়ে পড়েন ত্রিগুণাবাবু। এরপর রামকৃষ্ণ মিশনের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য মনস্থির করলেও ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার, বিশেষ করে

রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণানের বিশেষ অনুরোধে তাঁকে মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (BHU)-এর ১১-তম উপাচার্যের দায়িত্ব নিতে হয়।[৯১] বিশ্ববিদ্যালয়টি তখন প্রবল ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল। ইউনিভার্সিটি প্রবেশের মুখেই তিনি বিপুল সংখ্যক বিক্ষুব্ধ ছাত্রের সম্মুখীন হন। কিন্তু গভীর স্নেহ ও যুক্তিবাদী কথায় খুব শীঘ্রই তিনি ছাত্রদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন।[৯২] 'হিন্দি বলিয়ে', 'হিন্দি বলিয়ে' বলে যেখানে সর্বত্র চিৎকার ওঠে, সেই যুক্তপ্রদেশ, এখনকার উত্তরপ্রদেশে কিনা একজন বাঙালি পরিস্থিতির সামাল দিয়েছিলেন! এর উত্তর মিলবে অন্য পথে—উত্তর ভারতের উচ্চ পদাধিকারীদের মতো আভিজাত্যের ভান না করে ড. সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সর্বত্র ঘুরে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়টি শান্ত হয়ে যায়।

রাজ্যসভার সদস্য

এর পরেই ড. সেনকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের পিছনে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণানের ভূমিকা ছিল বলে অনুমিত হয়।[৯৩] তাঁকে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। শিক্ষকমন্ত্রী হলে প্রথমেই তাঁর কাজ হয় কোঠারী কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ কতটা গ্রহণ/বর্জন করা হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এ বিষয়ে সংসদের সদস্যদের নিয়ে একটি খসড়া কমিটি গঠন করেন তিনি।[৯৪] কমিটির সুপারিশ ও ত্রিগুণাবাবুর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঞ্চলিক বা মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নীতিগত ভাবে গৃহীত হয়।[৯৫]

তবে খুব বেশি দিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর পদে তিনি থাকতে পারেননি। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৯ সালে তাঁকে পেট্রোলিয়াম এবং রাসায়নিক, খনি ও ধাতু মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। তখন নির্বাচিত ফান্ডে মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে টাকা দেওয়া হতো, যা ত্রিগুণা সেনের পক্ষে তা দেওয়া আদর্শ বিরোধী—তিনি তা দেননি। ফলে তাঁকে প্রথমে পেট্রোলিয়াম ও রসায়নিক দফতরের দায়িত্বে ও পরে মন্ত্রিসভা থেকেই বিদায়ের দেওয়া হয়।[৯৬] ১৯৬৯ সালে পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই ড. সেনকে তেল ও ওষুধ শিল্পের জাতীয়করণ প্রশ্নটির মোকাবিলা করতে হয়েছিল।[৯৭] অর্জুন অরোরা, ভূপেশ গুপ্ত, কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী, প্রমূখ সাংসদদের জাতীয়করণের দাবির মুখে ড. সেনকে অপ্রস্তুতিতে পড়তে হয়েছিল, কেননা ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন ড. সেনের ওপর কংগ্রেসের চাপ ছিল।

১৯৭১-এর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস চমকপ্রদ ফল করল। এই নির্বাচনের পর ত্রিগুণাবাবুরকে পুনরায় রাজ্যসভায় সাংসদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হল। তবে, মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়নি। তবে সম্ভবত সেরা দায়িত্বটিই তাঁর উপর অর্পিত হলো—ভারত সরকারের হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন তিনি। ড. সেন ভারত সরকার ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে সেতু বন্ধক হিসেবে কাজ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত হিসাবে ড. সেন আগরতলায় যান এবং শরণার্থী শিবির, ইয়ুথ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন ও স্বাধীন

বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সম্প্রচার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।[৮৯] কেন্দ্রীয় সাংসদ হিসেবে তাঁর কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কমিউনিস্ট সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "বাংলাদেশের যখন অভ্যুত্থান হল, তখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে যেভাবে নেমে সাহায্য করেছিলেন, অলিখিত সেই বিবরণ কেউ কোথাও পাবে না। তিনি চিরকালই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। সেই শ্রদ্ধার পরিমাণ আরো বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময়ে।"[৯৯]

নীরবতার দিকে

কংগ্রেসের সাথে বিরোধ ঘটায় ১৯৭৪ সালে সংসদীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করে ড. সেন বৃহত্তর জনজীবন থেকে সরে আসেন এবং সবকিছু ছেড়ে প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুসরণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে, আধ্যাত্মিক গুরু আনন্দময়ী মায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তবে আনন্দময়ী মায়ের নির্দেশে তাঁর আশ্রম পরিচালিত বারাণসীর হাসপাতাল নির্মাণে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[১০০] দীর্ঘ ১৫ বছর পর কানখালের আশ্রম ত্যাগ করার পর ত্রিগুণাবাবু কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন থেকে অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নই তাঁর প্রদান ধ্যান-জ্ঞান। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েও সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ ত্রিগুণাবাবু খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে জন্য তিনি নিরন্তর কাজ করে যান।[১০১] এই দীর্ঘ কর্মময় জীবনের শেষে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

উপসংহার

ভারতের রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে ড. ত্রিগুণা সেন একটি সুপরিচিত নাম, যিনি শিক্ষার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ছিলেন। কেননা তিনি মনে করতেন, সামাজিক রূপান্তর এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রথম শর্ত উন্নত থেকে উন্নততর শিক্ষা। সুপরিচিত শিক্ষাবিদ হলেও, রাজনীতি ছিল তার অস্থি-মজ্জায়। ইতিমধ্যেই ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন—যিনি তাঁর মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ছিলেন স্বদেশব্রতী। তাঁর আগ্রহের জন্যই তৎকালীন বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতির সাথে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তাছাড়া কিছুকাল কলকাতার মেয়র হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে সংসদীয় রাজনীতিতে যোগদান করে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে শরিক হন। তবে এই মানবতাবাদী কোনদিনই সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন থেকে সরে আসেননি। সর্বদাই নিজের বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিভিন্ন সামাজকর্মে—তা বন্যা হোক, খরা হোক, কিংবা উদ্বাস্তুদের রিলিফের ব্যবস্থা করা। শেষ জীবন পর্যন্ত দেশের শিল্পায়ন, শিক্ষা বিস্তার ও বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য তিনি চিন্তা করেছিলেন। সমাজের জন্য রেখে যান গভীর এক মূল্যবোধ। শেষ বিচারে তিনি ছিলেন আদ্যন্ত একজন স্বদেশব্রতী, সমাজব্রতী, মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ—এই হোক তাঁর শেষ পরিচয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Surendranath Banerjee, "National Council of Education", The Dawn and Dawn Society's Magazine, ed. Satish Chandra Mukherjee, Vol. lX (Kolkata: Jadavpur University & NCE, Bengal, 2007), pp. 227 - 228

২. Benoy kumar sarkar, Education for Industrialisation: An Analysis of the Forty years' Work of Jadavpur College of Engineering and Technology (1905-45), (Calcutta: Chuckervertty chatterjee & Co. Ltd, 1946), p. 191

৩. Indira Chowdhury, Siddhi Bhandari & Archit Guha, Lessons in Living: Stories from the Life of Triguna Sen, (Kolkata: National Council of Education, Bengal, 2018), pp. 6-7

৪. Anuradha Chanda and Kunal Chattopadhyay (ed.) Convocation Addresses of Jadavpur University 1956-1996, (Calcutta: Jadavpur University, 1997), p. 82

৫. Ananda Lal, Rama Prasad De & Amrita Sen, The Lamp in The Lotus: A History Of Jadavpur University, (kolkata: Jadavpur University, 2005), p. 1

৬. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, The Origins Of The National Education Movement (1905-1910), (kolkata: Jadavpur University, 1957), pp. 3-4

৭. D. K. Biswas and P. C. Ganguli (ed.), The Life and Letters of Raja Rammohun Roy, (Calcutta: Sadharan Brahmo Samaj, 1962), Appendix II, p.458

৮. Annie Besant, How India wrought for Freedom: the Story of the National Congress Told from Official Records, (Madras: Theosophical Publishing House, 1915), p.53

৯. শরৎকুমার রায়, বঙ্গগৌরব: স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় (প্রকাশক), কলিকাতা, ১৯২১, পৃ. ৫০।

১০. Prafulla Chandra Ray, Life And Experiences Of A Bengali Chemist, (Calcutta: Chuckervertty chatterjee & Co. Ltd, 1923), p. 289

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শিক্ষার হেরফের", রবীন্দ্র রচনাবলী (১১খণ্ড), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), পৃ.পৃ. ৫৩৭-৫৪৫।

১২. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, The Origins Of The National Education Movement (1905-1910), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১৩. Amrita Bazar Patrika, 25 October 1905.

১৪. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, The Origins Of The National Education Movement (1905-1910), প্রাগুক্ত, পৃ.২৭-৩১।

১৫. Surendranath Banerjee, "National Council of Education, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২৮।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "জাতীয় বিদ্যালয়" রবীন্দ্র-রচনাবলী, (১৪ খন্ড) (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২), পৃ. ৩৩৫।

১৭. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, The Origins Of The National Education Movement (1905-1910), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

১৮. তদেব, পৃ. ৪৭-৪৮।
১৯. রমাপ্রসাদ দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে, (কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ২০২৩), পৃ. ৭৭।
২০. সুশোভন সরকার, ইতিহাসের দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, (কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ২০২৩), পৃ. ১৬।
২১. Sasanka Shekar Bagchi, The National Council of Education, Bengal, kolkata, 1956, পৃ. ২১।
২২. অমিত ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাসে ও ব্যক্তিদর্পণে (১৯০৬-২০১৭), (কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০২৩), পৃ. ১৭।
২৩. আরিফুর রহমান (সম্পা.), "মুক্তিযুদ্ধের অন্য রণাঙ্গনে ত্রিগুণা সেন", ঢাকা টাইমস, (জুন ১, ২০১৬)। https://old.dhakatimes24.com/2016/01/06/97549/print.
২৪. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
২৫. Benoy Kumar Sarkar, Education for Industrialization, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ৩৪৫-৪৯।
২৬. Anonymous author, "TRIGUNA", Dr. Triguna Sen : Man And His Work, ed. S. C. Sen Gupta & Others, (Calcutta: Jadavpur University press, 1967), পৃ. ২।
২৭. Satyabrata Dutta, Dr. Triguna Sen: A profile in Parliament (1967-1974), (Calcutta: NCE, Bengal, 2008), পৃ. ২১৬।
২৮. Triguna Sen, "Vijaya Greetings to Students, Teachers and Office Staff of Jadavpur University", Dr. Triguna Sen : Man And His Work, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
২৯. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
৩০. অঞ্জলি বসু (সম্পা.), সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৫৮।
৩১. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee, The Origins Of The National Education Movement (1905-1910), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৬১।
৩২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনগুলি, (কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯৭৯), পৃ. ৩০।
৩৩. The Lamp in the Lotus, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।
৩৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনগুলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৩৫. Memorabilia: Dr.Triguna Sen a collection of reminiscences of Dr.Triguna Sen from his students, colleagues, admirers and acquaintances possessed because of their association with this great memorable luminary in the academic world, (kolkata: Alumni Association, NCE Bengal & Jadavpur University, 2005), পৃ. ৪।
৩৬. Benoy Kumar Sarkar, Education for Industrialization, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৩৭. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৩৮. Tapan Kumar Mukherjee, Taraknath Das Life and Letters of A Revolutionary in Exile, (Calcutta: National Council of Education Bengal, 1998), পৃ. ৭৪।
৩৯. Benoy Kumar Sarkar, Education for Industrialization, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৪০. Anonymous author, “TRIGUNA”, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
৪১. The Modern Review for January, 1931, পৃ. ২৬০।
৪২. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
৪৩. শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, “যাদবপুর ও তার প্রথম উপাচার্য”, আনন্দবাজার পত্রিকা, (আগস্ট ৪, ২০১৮)। https://www.anandabazar.com/editorial/article-on-former-union-minister-and-the-first-vice-chancellor-of-jadavpur-university-1.842288.
৪৪. Benoy Kumar Sarkar, Education for Industrialization, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।
৪৫. তদেব, পৃ. ২২২-২৩।
৪৬. অমলেন্দু দে, অনুশীলন সমিতির ইতিহাস, (কলকাতা: অনুশীলন সমিতি শতবর্ষ উদযাপন কমিটি ২০১৩), পৃ. ৬১।
৪৭. Animesh Manna, ‘Socio Political View of Dr. Triguna Sen: A Critical Analysis’, International Research Journal of Management Sociology & Humanity, vol. 14, No. 5, (2023), পৃ. ৪৩৮।
৪৮. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।
৪৯. Letter to Shri Y. V. Naranje, Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।
৫০. তদেব।
৫১. Benoy Kumar Sarkar, Education for Industrialization, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
৫২. Anonymous author, “TRIGUNA”, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
৫৩. Letter to Shri Y. V. Naranje, Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।
৫৪. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
৫৫. Amit Bhattacharyya, Swadeshi Enterprise in Bengal 1921-47, (kolkata: Setu Prakashani, 2007), পৃ. ১৯০।
৫৬. Amitabha Mukherjee, Fifty Years of National Education: The Story of an Experiment, (Calcutta: NCE, Bengal, 1992), পৃ. ১৫০।
৫৭. Bimal Chanda, “Dr. T. Sen and My Alma Mater”, Dr. Triguna Sen: Man and His Work, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৫৮. Amitabha Mukherjee, Fifty Years of National Education, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-৫০।
৫৯. Benoy kumar sarkar, Education for Industrialisation, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৬০. তদেব, পৃ. ৩৬।
৬১. রমাপ্রসাদ দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
৬২. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
৬৩. তদেব।
৬৪. Triguna Sen, “Vijaya Greetings to Students, Teachers and Office Staff of Jadavpur University”, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১১৫-১৬।
৬৫. রমাপ্রসাদ দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
৬৬. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
৬৭. তদেব, পৃ. ৮২।
৬৮. দেবব্রত দত্ত, বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ. ৬১।
৬৯. Benoy kumar sarkar, Education for Industrialisation, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।

৭০. S. Gopal, selected works of Jawaharlal Nehru, vol. 8, (New Delhi: Orient Longman, 1972), পৃ. ৮০৭-০৮।
৭১. The Lamp in the Lotus, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
৭২. রমাপ্রসাদ দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।
৭৩. West Bengal Act XXXIII of 1955, Calcutta Gazette, 14 November, 1955, পৃ. ১।
৭৪. Amitabha Mukherjee, Fifty Years of National Education, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-৮০।
৭৫. অমিত ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাসে ও ব্যক্তিদর্পনে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
৭৬. The Lamp in The Lotus, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৫১।
৭৮. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।
৭৯. P. K. Guha, “Dr. Triguna Sen: A Master-Builder”, Dr. Triguna Sen: Man and His Work, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
৮০. হিমেন্দু বিশ্বাস, আমি ও আমার সময়, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৯৫-৯৭।
৮১. অমিত ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
৮২. Editorial: “Mayor who was Taxi-Driver”, The Hindu, (May 3, 1957).
৮৩. অঞ্জলি বসু (সম্পা.), সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।
৮৪. শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, “যাদবপুর ও তার প্রথম উপাচার্য”, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রাগুক্ত।
৮৫. অতুল্য ঘোষ, কষ্ট কল্পিত, (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ৩৩১।
৮৬. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।
৮৭. অঞ্জলি বসু (সম্পা.), সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।
৮৮. Education and National Development, Report of the Education Commission 1946-66, vol. 1, (Delhi: National Council of Education Research and Training,1970), Appendix ll, পৃ. ২৬০।
৮৯. তদেব, Appendix lV, পৃ. ২৭৩-৭৪।
৯০. সম্পাদকীয় প্রবন্ধ: “কলকাতার কড়চা: জীবন থেকে শিক্ষা”, আনন্দবাজার পত্রিকা, (জুলাই ৯, ২০১৮)।https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/kolkatar-korcha-triguna-sen-the-first-vice-chancellor-of-jadavpur-university-1.829101.
৯১. তদেব।
৯২. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-২৪।
৯৩. Satyabrata Dutta, Dr. Triguna Sen: A profile in Parliament (1967-1974), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৯৪. M. Mahmood, ‘Language Politics And Higher Education In India’, The Indian Journal of Political Science, Vol. 35, No. 3, (1974), পৃ. ২৮৫।
৯৫. Editorial: “Varsity teaching in local languages”, The Hindu, (July 19, 1967). https://www.thehindu.com/archive/varsity-teaching-in-local-languages/article19303139.ece.
৯৫. বরুন সেনগুপ্ত, ইন্দিরা একাদশী, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৭৭৭), পৃ. ৫৯।
৯৭. Satyabrata Dutta, Dr. Triguna Sen: A profile in Parliament (1967-1974), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

৯৮. আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ৬৩-৬৪।

৯৯. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "আচার্য ত্রিগুণা সেন : স্মৃতিতর্পণ", সময়কাল ও মূল্যবোধের সংকট, (কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ২০০৯), পৃ. ৭-৮।

১০০. Lessons in Living, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

১০১. তদেব, পৃ. ১৯।

ধর্ম, উৎসব ও অর্থনীতি : প্রসঙ্গ তারকেশ্বর

ড. জয়দীপ ঘোষ,
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, কলকাতা

সারসংক্ষেপ

প্রতিটি ধর্মের সঙ্গেই কিছু আচার অনুষ্ঠান ও উৎসব জড়িত থাকে। হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন,শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী মানুষই তাদের নিজস্ব বিশ্বাস থেকে কিছু ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করে থাকেন। এই উৎসবগুলি বা ধর্মীয় আচার ও রীতি-নীতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত।বলা যায়, এই উৎসবগুলি পালন করতে গিয়ে অঞ্চলটির অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই বলা যায়, ধর্ম, উৎসব ও অর্থনীতি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রতিটি ধর্মেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বা 'পবিত্র' স্থান থাকে, যেগুলি সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে তীর্থস্থানে পরিণত হয়। হুগলি জেলা তথা পূর্ব ভারতে হিন্দুদের অন্যতম প্রধান শৈব্য তীর্থস্থান হিসেবে তারকেশ্বর গড়ে উঠেছে। তারকেশ্বর তীর্থস্থানটি গড়ে উঠেছে একটি শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে। মন্দিরে প্রচলিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব। এই মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা।মন্দিরের উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কুটির শিল্পভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহৎ বাজার। সমগ্র অঞ্চলটির অর্থ সামাজিক বিকাশে সহায়ক হয়েছে এই মন্দির ও মন্দির কেন্দ্রিক উৎসবগুলি। আলোচ্য প্রবন্ধে মন্দির ও ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে কীভাবে একটি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হয়, সেই বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : মন্দির, তীর্থস্থান, গাজন, জনপদ,শহর, তারকেশ্বর, ধর্মীয় পর্যটন।

মূল প্রবন্ধ

ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও উৎসব যা ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মানব সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। আধুনিক কালে ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উৎসব গুলি শুধু আনন্দ অনুষ্ঠানই নয়, এটি অর্থনীতির জন্য ও একটি বিশেষ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে ধর্মীয় উৎসব গুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করে। বিশ্বায়নের যুগে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারে ধর্মীয় উৎসবগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্দির- কেন্দ্রিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিককালে ইতিহাস চর্চায় অঞ্চল-কেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্গত

তারকেশ্বর অঞ্চলটি একটি তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত। অঞ্চলটির উদ্ভব ও বিকাশ একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে। তারকনাথের মন্দিরকে কেন্দ্র করেই একটি 'গ্রামীণ জনপদ' সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মফস্বল শহর ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে যায়। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে মন্দিরে প্রচলন হয় বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের। উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে বসবাস করতে শুরু করে তারকেশ্বর অঞ্চলটিতে।তারকেশ্বর নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা ইতিপূর্বে হয়েছে। এই গবেষণাগুলির বেশিরভাগই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, 'মিথ',ও মোহন্ত কেন্দ্রিক। মন্দির-কেন্দ্রিক উৎসব ও অর্থনৈতিক বিকাশকে কেন্দ্র করে তারকেশ্বরের যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন-- সে নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা সেভাবে এখনো হয়নি।তাই আলোচ্য প্রবন্ধে মন্দির-কেন্দ্রিক উৎসব ও অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে প্রাথমিক ও গৌণ উপাদানের পাশাপাশি ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও কিছু ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষাৎকারকে কাজে লাগিয়েছি।

পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান শৈব তীর্থস্থান তারকেশ্বর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হুগলি জেলায় অবস্থিত। বর্তমানে এটি চন্দননগর সাব-ডিভিশনের মধ্যে ২২°৫৩' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২' পূর্বে অবস্থিত।[১] রেলও সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে বর্তমানে তারকেশ্বর বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত। হুগলি জেলার তারকেশ্বর অঞ্চলটি মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।এটি কালক্রমে হুগলি জেলা তথা পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান শৈব তীর্থস্থানে পরিণত হয়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলটি একটি শহরের রূপ নেয়। তারকেশ্বরের প্রাচীনত্ব বিচার করলে দেখা যায় এর উদ্ভব খুব প্রাচীন নয়।ভবিষ্য পুরাণের 'ব্রহ্মাণ্ড খন্ড' পুস্তকে এই লিঙ্গের উল্লেখ থাকলেও তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলে মনে হয়। রেনেলের ১৭৭৯ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গদেশের মানচিত্রে তারকেশ্বরের নাম পাওয়া যায় না।[২] কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লেখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগ্রন্থে বাংলার বহু স্থানের দেব দেবী বিবরণ লিখিত আছে কিন্তু তারকেশ্বর বা তারকনাথের নামের উল্লেখ নেই। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তারকেশ্বর নামটি খুব প্রাচীন ছিল না।[৩] রামায়ণের যুগে এই অঞ্চলটি ছিল উপবঙ্গের নামান্তর বৌদ্ধ ও জৈনযুগের এই অঞ্চলটি 'সিংহল দ্বীপ' নামে পরিচিত ছিল। সুক্ষ্ম রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে দামোদর ও গঙ্গার মধ্যস্থলে কয়েকটি দ্বীপের উদ্ভব হয়, যার নাম ছিল 'সিংহল দ্বীপ'। এই সিংহল দ্বীপের রাজধানী ছিল সিংহপুর। সিংহপুর নাম চলতি কোথায় সিঙ্গুর হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[৪] এটি হুগলি জেলার একটি প্রাচীন জনপদ। সিঙ্গুর থেকে বর্তমান তারকেশ্বরের দূরত্ব খুব বেশি নয়। সুতরাং বর্তমানে যেখানে তারকেশ্বর অবস্থিত সেখানকার পূর্ব নাম যে 'সিংহল দ্বীপ' ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোগল যুগে অঞ্চলটি সেলিমাবাদ সরকারের অধীন 'বালিগড়ি পরগনা'র অন্তর্ভুক্ত ছিল।পরে এই অঞ্চলটির নাম হয় তারকেশ্বর। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার বঙ্গদেশে যে জরিপ করেছিলেন তাতে তার তারকেশ্বর নামক স্থানটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] তারকেশ্বর নামে অঞ্চলটি পরিচিতি পায় সম্ভবত তারকনাথের মন্দিরের প্রচার ও ব্যক্তির পর থেকে। তারকনাথ নাম থেকেই অঞ্চলটির নাম হয় তারকেশ্বর।

তারকেশ্বরের মন্দির ভারামল্ল নামক এক ক্ষত্রিয় গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়,

স্বয়ম্ভ লিঙ্গের উপর তিনি মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি দশনামী সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[৬] শিব ছিলেন নিম্ন সম্প্রদায়ের দেবতা, মধ্যযুগের হিন্দু সমাজে তিনি ছিলেন প্রধান উপাস্য দেবতা।শিবকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে যে কাব্য রচিত হয়েছিল তার নাম দেয়া হয়েছিল শিবায়ন। এই সকল কাব্যে শিবকে সাধারণ বাঙালি গৃহস্থ রূপে দেখা যায়। সুতরাং নিম্ন সম্প্রদায়ের আধিক্য যুক্ত তারকেশ্বর সংলগ্ন অঞ্চলে শিবের পূজার চল হলে, তা যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠতা বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল। এ কারণেই সম্ভবত তিনি মুকুন্দ ঘোষ আবিষ্কৃত স্বয়ুম্ভ লিঙ্গ মূর্তির উপর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে ও মন্দির নির্মাণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।[৭] তারকেশ্বরের মন্দির ও মঠ স্থাপনের সময়কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হুগলির মাননীয় জেলা জজ বিভিন্ন নথি ও প্রমাণের ভিত্তিতে জানান ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে মন্দির ও মঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মন্দির ও মঠে কোন রকম প্রতিষ্ঠা ফলক না থাকায় তারকেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল হিসাবে এটিকেই সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়।[৮]

সমগ্র ভারতে শিব বেশিরভাগ স্থানে পূজিত হন লিঙ্গ প্রতীক এর মাধ্যমে। তারকেশ্বর মন্দিরেও শিব প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন লিঙ্গ প্রতীকে।এটি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। তারকেশ্বর মঠের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেন মোহন্ত। মায়াগিরি ধূম্রপান ছিলেন তারকেশ্বর মঠের প্রথম মোহন্ত।[৯] ইনি দশনামী সন্ন্যাসীদের একজন ছিলেন। মোহন্তরা মঠকে পরিচালনা করতেন এবং বিভিন্ন নীতি-নির্দেশ দিতেন। মোহন্তদের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করেই তারকেশ্বর অঞ্চলটির অর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হতে থাকে। তারকেশ্বর মন্দিরে প্রচলিত হয় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব। এগুলি আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে। এই ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি অঞ্চলটির আর্থ-সামাজিক বিকাশেরও সহায়ক হয়।

পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান তারকেশ্বর। তারকেশ্বরের শিব- মন্দিরকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলাও বসে। তারকেশ্বরের মন্দির সংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।এগুলি হল- (ক) তীর্থযাত্রীদের পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং (খ)মন্দিরের উৎসব ও মেলা। তীর্থযাত্রীদের পালনীয় অনুষ্ঠান গুলি হল-- নামকরণ, স্নান, মুণ্ডন, জল ঢালা, অন্নপ্রাশন ,দন্ডি, ঢিল বাঁধা, তর্পণ, ধর্না। মন্দিরের উৎসব গুলি হল-- শিবরাত্রি, গাজন, বৈশাখী মেলা, ও শ্রাবণী মেলা।[১০]

প্রাচীন বাঙালির সম্পদের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল কৌম কৃষি।বাংলাদেশের অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবী ও উৎসব গুলি ছিল কৃষি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষিকাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা ছিল সেসময়ে অনিশ্চয়তায় ভরা।অতিবৃষ্টিতে যেমন শস্যহানীর সম্ভাবনা ছিলো, অনাবৃষ্টিতেও তেমনি। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অনিশ্চয়তা পূর্ণ বিষয়টিকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষার জন্য ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানুষ কল্পনা করে নিয়েছিল নানান লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্ব।এইভাবে কৃষি প্রধান বাংলাদেশের নানাস্থানে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লৌকিক দেব-দেবীর সূচনা হয়। দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে যেসব উৎসবের সূচনা হয় সেগুলিরও প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় কৃষি কার্যের

উন্নতি সাধন করা।[১১] এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অঞ্চল ভেদে দেবতার পার্থক্য থাকলেও ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠান ও উৎসব পালনের উদ্দেশ্য ছিল এক অর্থাৎ দেবতার করুনা লাভের মাধ্যমে মাঠে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল লাভ করা।

তারকেশ্বরের মন্দির বৈশাখ থেকে চৈত্র - সারাবছর ধরেই কোন না কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারা বছরই উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রচুর তীর্থ যাত্রীর আগমন ঘটে।তারকেশ্বরের উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসে প্রধানত চারটি-- শিবরাত্রি মেলা, বৈশাখী মেলা, গাজন উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত চড়ক সংক্রান্তির মেলা এবং শ্রাবণী মেলা। হান্টার লিখেছেন, শিবরাত্রি উপলক্ষে তারকেশ্বরে সবচেয়ে বেশি ভিড় হতো। সেই সময়ে এই দিনে প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাগম ঘটতো।[১২] লিঙ্গ পুজো উর্বরতা বৃদ্ধির প্রতীক। লিঙ্গ প্রতীকে বাঙালি সংস্কৃতিতে শিব হয়ে উঠেছেন কৃষক ও কৃষির প্রতীক। কুমারী ও সধবা মেয়েরাই শিব পূজার প্রধান পূজারী।উর্বরতার কর্মধারায় এটিই স্বাভাবিক। পুরুষ মানুষ এমনকি বিধবা নারীরা শিবরাত্রি পালন করতেন। তারকেশ্বরে সব থেকে বেশি যাত্রী সমাগম হয় যে উৎসবটিতে সেটি হলো শ্রাবণ উৎসব। সুধীর কুমার মিত্র লিখেছেন, শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার তারকেশ্বরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতো।[১৩] তবে বক্তব্যটি ঠিক নয়,কারণ শুধু সমেবার নয়--সারা শ্রাবণ মাস ধরেই তারকেশ্বরে উৎসব ও মেলা হয়। হিন্দু লোকাচার অনুযায়ী সোমবার যেহেতু শিব পুজোর জন্য একটি শুভ লক্ষণ যুক্ত দিন তাই শ্রাবণ মাসের সোমবারে তারকেশ্বরে যাত্রী সমাগম হয় সব থেকে বেশি। শ্রাবণী উৎসবের প্রচলন করেছিলেন তারকেশ্বর মঠের মহন্ত সতীশ চন্দ্র গিরি। তিনি মেলার প্রবর্তন করেছিলেন বিভিন্ন কারণে। সতীশ চন্দ্রের আগে তারকেশ্বরের মোহন্ত ছিলেন মাধব চন্দ্র গিরি, যিনি এলোকেশী নামক বাঙালি কন্যার সতীত্ব নাশের ঘটনায় কলঙ্কিত হন। এটা ছিল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।[১৪] এই ঘটনায় সমগ্র হুগলি জেলা তথা বাংলা সমাজ প্রভাবিত হয়। মোহন্তদের নিয়ে নানা ধরনের প্রহসন লেখা হয়। বাংলার নানা অঞ্চল থেকে সত্যাগ্রহীর দল আছড়ে পড়ে তারকেশ্বরের উপর। এই ঘটনার রেশ থেকে যায় দীর্ঘ কয়েক বছর। এরপর তারকেশ্বর মঠের মোহন্ত হয়েছিলেন সতীশ চন্দ্র গিরি। তিনি তারকেশ্বরকে তীর্থস্থানে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। তারাকেশ্বরের গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনতে তিনি বাংলার শ্রাবণ মাসে নতুন উৎসব ও মেলার আয়োজন করেন।[১৫]

তারকেশ্বরের সব থেকে বড় উৎসব হল গাজন উৎসব। গাজন শুধু তারকেশ্বর নয়, এটি পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড় শিবের উৎসব। গাজন ছিল প্রথমে রাঢ়ের গ্রাম দেবতা ধর্ম ঠাকুরের একটি জনোৎসব। ধর্ম ঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক আর্য অধিবাসী কোমের দেবতা।পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশীয় ও বিদেশী নানা প্রকার দেবতার ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে ধর্ম ঠাকুরের মধ্যে। রাঢ় দেশে তিনি গ্রামদেবতা রূপে রূপায়িত হয়েছিলেন। রাঢ় দেশে টোটেম সংস্কৃতি ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়া তাদের উপর স্বাভাবিক। হিন্দু ধর্মের প্রভাব থেকেও তারা যে একেবারে মুক্ত ছিল তা নয়।[১৬] গাজনের সঙ্গে জড়িত চড়ক পুজো ও নীল উৎসব। এটিও বহু প্রাচীন উৎসব। চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা মাস চৈত্রের শেষ সময়ে। বর্ষ শেষে চড়কে ঘোরা অবশ্যই সূর্যের বর্ষ পরিক্রমার প্রতীক। তারকেশ্বরের প্রথম মোহন্ত মায়া গিরি তার সমস্ত সন্ন্যাসীদের

বাংলার চৈত্র মাসে একত্রিত করেন এবং একটি মেলার প্রবর্তন করেন।[১৭] এটিই ছিল তারকেশ্বরের প্রথম শিব মহামেলা। এটিই গাজন মেলা রূপে পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়। শুধু তারকেশ্বর নয়,উনিশ শতকে কলকাতা এবং বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র খুব ঘটা করে গাজন উৎসব পালিত হতো। চড়কের সময় কলকাতায় নানা ধরনের সং হত। এর মধ্যে উত্তর কলকাতার জেলে পাড়ার সং এবং দক্ষিণে কালীঘাটের সঙ্ উনিশ শতকে বেশ বিখ্যাত ছিল।সন্ন্যাসীরা যন্ত্রণাদায়ক উৎসব পালনের পূর্বে যথেষ্ট মদ্যপান করতেন।[১৮] বঙ্গদেশে চড়ক উৎসবের যন্ত্রণাদায়ক অনুষ্ঠানগুলি নিম্ন শ্রেনীর লোকেরায় পালন করত। উনিশ শতকে কলকাতার বাবুরা বিশেষত ভূঁইফোরের দল এক একটি করে চড়কের দল রাখতেন নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। ধনী লোকেরা বিশেষত জমিদাররা তাদের নিম্ন শ্রেনীর প্রজাদের উপর চড়াও হয়ে জোর-জুলুম করতেন এবং চরকের সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করতেন।[১৯] চড়ক পূজার সঙ্গে জড়িত যন্ত্রণাদায়ক অনুষ্ঠান গুলি বন্ধ করার জন্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশে আন্দোলন গড়ে ওঠে।সরকারি নির্দেশ ও তৎপরতায় এগুলি বন্ধ হয়ে যায়।[২০] বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় নামেমাত্র চড়ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তারকেশ্বরের মন্দির কেন্দ্রিক উৎসব গুলি বাংলার লোক উৎসব বহির্ভূত নয়। তারকেশ্বরের মোহন্তরা বাংলার লোক উৎসব গুলিকেই মন্দির উৎসব হিসাবে চালু করতে চেয়েছিলেন।

ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে উৎসব এবং উৎসবের সাথে জড়িত থাকে আঞ্চলিক অর্থনীতি। তারকেশ্বরের শৈব ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে অঞ্চলটির আঞ্চলিক অর্থনীতি বিবর্তিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিবর্তন আলোচনার পূর্বে তারকেশ্বরের পরিবহন ব্যবস্থার বিবর্তনটিকে দেখানো প্রয়োজন, কারণ পরিবহনের সাথে জড়িয়ে থাকে অর্থনীতি। শহর গড়ে ওঠার অন্যতম প্রধান উপাদান হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রশাসনিক উদ্যোগ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তীর্থস্থান হিসেবে তারকেশ্বর সেরকম সুনাম অর্জন করতে পারেনি। মূলত স্থানীয় তীর্থযাত্রীরাই মন্দিরে আসতেন।সড়ক পথ ও রেলপথ সেই সময় ছিল না। কলকাতা থেকে তারকেশ্বরের দূরত্ব প্রায় ৩৬ মাইল। উপরন্তু মাঝপথে সিঙ্গুর, দেয়ারা, হরিপাল প্রভৃতি স্থানগুলি ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকার কারণে যাত্রীদের প্রায়ই চুরি ডাকাতির কবলে পড়তে হতো।[২১] ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত বাইশ মাইল দীর্ঘ রেললাইন স্থাপিত হয়।[২২] এছাড়া তারকেশ্বর ও আরামবাগের মধ্যবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে পিচ রাস্তা ও সেতু নির্মিত হওয়ায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। সাম্প্রতিককালে তারকেশ্বর আরামবাগ রেল ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বা পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য বেড়েছে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা। তারকনাথের ‘মিথ’ ও মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচার যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই বৃদ্ধি পেয়েছে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা। অঞ্চলটিতে বহু সংখ্যক লোকজনের আগমন অঞ্চলটির অর্থনীতিতে পরিবর্তন এনেছে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে বহু লোক তারকেশ্বরে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। তারকেশ্বর পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর এলাকার অধিবাসীরা নগর জীবনের অনেক সুবিধা ভোগ করতে পেরেছে। নাগরিক জীবনের উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষা ও

জনস্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এই অঞ্চলটিতে স্বভাবতই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বেড়েছে লোক সংখ্যা। সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৭১ সালে যেখানে তারকেশ্বরের জনসংখ্যা ছিল ১১,৯৫৯ জন, সেখানে ২০১১ সালে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০,৯৪৭ জন।[২৩] একটা 'গ্রামীণ-জনপদ' মন্দিরকে কেন্দ্র করে ক্রমশ শহরে পরিণত হয়েছে।

মন্দির কেন্দ্রিক আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে নতুন কিছু নয়। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মন্দিরকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে। তারকেশ্বরে তারকনাথের মন্দিরকে কেন্দ্র করেও অঞ্চলটির অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। তারকেশ্বরের মন্দিরের অর্থনৈতিক কাজ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কর্মদাতা হিসেবে মন্দির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরাসরি মন্দির কর্তৃপক্ষ মন্দির সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য লোক নিয়োগ করে।পরোক্ষভাবে দোকান, হোটেল ও বিভিন্ন কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটেছে মন্দির কে কেন্দ্র করে।শুধুমাত্র তারকেশ্বর নয়, নিকটবর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশেও সাহায্য করেছে তারকেশ্বরের মন্দির।মন্দিরের দেবতার সম্পত্তিতে কাজ করেন অনেক সেবায়েত পরিবার। তারকেশ্বরের অনেক সেবায়েত পরিবার অর্থনৈতিকভাবে দেবোত্তর সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল।মন্দির পরিস্কার,পূজো উপকরণ সংগ্রহ করার কাজে যুক্ত আছেন অনেক ব্যক্তি। মন্দির পরিষ্কারের কাজ করেন মূলত হরিজন সম্প্রদাযের লোকেরা মাসিক বেতনের ভিত্তিতে করেন। এছাড়া উৎসবের সময়ে দৈনিক ভিত্তিতেও অনেক ব্যক্তিকে মন্দির পরিষ্কারের কাজে লাগায় মন্দির কমিটি। তারকেশ্বর এস্টেটের কতকগুলো বিভাগ আছে। এগুলি হল-- হিসাববিভাগ, ক্যাশ বিভাগ, নিরাপত্তা বিভাগ, পরিদর্শন বিভাগ, বিদ্যালয় বিভাগ, গ্রন্থ বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগ।সব মিলিয়ে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৬০ জন লোক কাজ করেন।[২৪] এছাড়া প্রয়োজনে দৈনিক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে মন্দির কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন বিভাগের ব্যক্তিবর্গ অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি মন্দিরের উপর নির্ভরশীল।তারকেশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত আছেন অসংখ্য দালাল, পুরোহিত, পন্ডিত, ফুল বিক্রেতা, মৃৎশিল্পী,নাপিত, দুধ- ব্যবসায়ী প্রমুখ।

পন্ডিত: তারকেশ্বরের মোহন্ত আবাসনের মধ্যে আছে একটি সংস্কৃত টোল।এটি একটি আবাসিক বিদ্যালয়। মন্দির কর্তৃপক্ষ দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। এটির সরকারি অনুমোদন আছে। 'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ' এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।এখানকার শিক্ষক বা পণ্ডিতদের আর্থিক সাহায্য দেয় মন্দির পরিচালন কমিটি। তারকেশ্বর টোলের উল্লেখ আছে ও'মালির লেখায়।তিনি হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটি, উত্তরপাড়া, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে টোলের উল্লেখ করেছেন।টোলের পণ্ডিতদের বেতন দান এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে মন্দির কর্তৃপক্ষ।[২৫]

পান্ডা: তীর্থযাত্রীদের পরামর্শদাতা ও প্রদর্শক হিসেবে পান্ডারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।রেলওয়ে স্টেশন, মন্দির সংলগ্ন রাস্তা এবং মন্দিরের সম্মুখে এরা যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। তারকেশ্বর এস্টেট এর অনুমোদন আছে ৩০০ জন পান্ডার।এরা জীবন ধারণের জন্য পুরোপুরি মন্দিরের উপর নির্ভরশীল।এরা মূলত স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ এবং বংশ পরম্পরায় এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। ২০০5 খ্রিষ্টাব্দে

স্থায়ী পান্ডাদের সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়া হয়। পাণ্ডাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমানে মন্দির কর্তৃপক্ষ 'প্রদর্শক সংঘ' নামে একটি উপকমিটি গঠন করেছে।এরা পান্ডাদের নির্দিষ্ট 'রেট চার্ট'চালু করেছে।[২৬] এ ছাড়া এরা পুরোহিত, লজ, পুজো উপকরণ ব্যক্তির দোকান থেকে অনেক সময় কমিশন বাবদ কিছু অর্থ পায়। জীবন ধারণের জন্য এরা পুরোপুরি মন্দিরের উপর নির্ভরশীল।

নাপিত: তারকেশ্বর মন্দিরকে ঘিরে রয়েছেন এক শ্রেণীর নাপিত যারা জীবন ধারণের জন্য মন্দিরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানে এদের সংখ্যা ২৫ জন। এরা তীর্থযাত্রীদের দ্বারা পালিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠান 'মুণ্ডন' এর কাজ করেন।এরা প্রত্যেকেই জাতিগতভাবে নাপিত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বংশানুক্রমিকভাবে এই কাজ করে চলেছেন।প্রধান নাপিত এক বছরের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানটি লিজ নেয় অর্থের বিনিময়ে। প্রধান নাপিতের অধীনে 'রোটেশন' পদ্ধতিতে অন্যান্য ন নাপিতরা কাজ করেন।[২৭]

মৃৎ শিল্প: তারকেশ্বর মন্দির কে কেন্দ্র করে অঞ্চলটিতে মৃৎ শিল্পের উদ্ভব হয়েছে এটি মূলত একটি কুটির শিল্প তারকেশ্বরে প্রায় ৩০ টি পরিবার মৃৎ শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত। পালপাড়া এবং ভঞ্জিপুরে এদের বাসস্থান। বাঙালি এবং অবাঙালি উভয় সম্প্রদায়ই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।বাঙালিরা তারকেশ্বরের স্থায়ী বাসিন্দা এবং অ-বাঙ্গালীদের অবস্থান বিহারে।বিহারের কিছু ব্যক্তি এক সময় কাজের জন্য এখানে আসেন এবং এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন।ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বর্ণের ও শ্রেণির মানুষ তীর্থযাত্রী হিসাবে এখানে আসেন এবং প্রথা অনুসারে মাথায় গঙ্গাজল ঢালেন। এই মৃৎপাত্র তৈরিকে অনেকে কুটির শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ঘট ছাড়াও কুম্ভকারগন মাটির গেলাস, ধনুচি, মালসা প্রভৃতি তৈরি করেন। প্রথা অনুসারে অনেক তীর্থযাত্রী শেওড়াফুলিতে গঙ্গাস্নান করে সেখান থেকে মাটির ঘটে গঙ্গাজল ভরে পদব্রজে তারকেশ্বরে যান।[২৮] তাই শেওড়াফুলি অঞ্চলেও মৃৎশিল্প কেন্দ্রিক কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে।

ফুল বিক্রেতা: পুজোর জন্য যারা মন্দিরে ফুল সরবরাহ করেন তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা নিত্য পুজোর জন্য ফুল সরবরাহ করেন। এরা মন্দির কমিটি কর্তৃক মাসিক বেতন পান। এঁদের আদি বাসস্থান ছিল উড়িষ্যায়। মন্দিরের পূর্ব দিকে এদের অবস্থান। আর এক ধরনের ফুল বিক্রেতা আছেন, যারা তীর্থযাত্রীদের এবং মন্দির সংলগ্ন দোকানগুলিতে ফুল বিক্রি করেন। এঁরা বাঙালি এবং স্থানীয় লোক।[২৯] এঁরা জাতিগতভাবে মালাকার সম্প্রদায় ভুক্ত। জীবন ধারণের জন্য এঁরা পুরোপুরি মন্দিরের উপর নির্ভরশীল।

দুধ ব্যবসায়ী: তারকনাথের মন্দিরে নিত্য পূজার জন্য দুধ সরবরাহ করেন দুধ ব্যবসায়ীরা। এঁরা গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত।তবে এঁরা ব্যক্তিগতভাবে মন্দির ছাড়া অন্যত্রও দুধ ব্যবসা করেন। এঁরা মূলত স্থানীয় বাসিন্দা।[৩০]

বিশ্রামাগার: তারকেশ্বর মন্দিরের সন্নিকটে সারিবদ্ধ ভাবে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বিশ্রামাগার বা 'লজ'। বিশ্রামাগারের সংখ্যা ১০২ টি এবং এগুলি তারকেশ্বর যাত্রীনিবাস সংঘের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মালিকেরা মূলত আরামবাগ, হাওড়া, চাপাডাঙ্গা, শ্রীরামপুর অঞ্চলের বাসিন্দা।বিশ্রামাগারের মালিকরা তীর্থযাত্রীদের উপর নির্ভর করেই উপর্জন

করেন। 'তারকনাথ যাত্রীনিবার সংঘ' তীর্থযাত্রীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বিশ্রামাগারের মালিকদের বিরোধ বাধলে তার মীমাংসা করে। বাণিজ্যিক লজ ছাড়াও তারকেশ্বরে কিছু ধর্মশালা আছে। এগুলি তারকেশ্বর এস্টেট এবং বিভিন্ন চারিটেবিল সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়।[৩১]

পুরোহিত: তারকেশ্বর মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে একটা বৃহৎ সংখ্যক পুরোহিত মন্ডলী। বর্তমানে এদের সংখ্যা ১২৮ জন। রাঢ়ী, আচার্য, বরেন্দ্র-- সমস্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণরাই এর মধ্যে আছেন। তবে এদের মধ্যে গাঙ্গুলী পুরোহিতরাই মন্দিরে প্রধান সেবায়েত। প্রথমদিকে শুধুমাত্র গাঙ্গুলীরাই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।পরে অন্যান্যরা পুজোর সঙ্গে যুক্ত হন। তারকেশ্বরের পুরোহিতরা তাদের সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংগঠন ভেঙে যায়। তার কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থ সংগঠনের স্বার্থকে বিনষ্ট করে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আবার নতুন সংগঠন গড়ে ওঠে। পূর্বের সংগঠনটিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন মোহন্তরা। প্রধান পুরোহিত মন্দির কমিটি কর্তৃক একটা নির্দিষ্ট বেতন পান।তবে অন্যান্য পুরোহিতরা নির্ভর করে থাকেন তীর্থযাত্রীদের দেয় দান এবং প্রনামীর ওপর।[৩২] এরা প্রত্যেকে স্থানীয় বাসিন্দা এবং অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি মন্দিরের ওপর নির্ভরশীল।

বাঁক শিল্প: তারকেশ্বরের শ্রাবণ যাত্রী এবং গাজন যাত্রীরা বাঁকে করে গঙ্গাজল বহন করে তারকেশ্বরে যান। তীর্থযাত্রীদের চাহিদের কথা মনে রেখে শেওড়াফুলিতে গড়ে উঠেছে বাঁক শিল্প। শেওড়াফুলির কয়লা ডিপো অঞ্চলে বাঁক শিল্প গড়ে উঠেছে। তবে এই শিল্পটি স্থায়ী নয়। নির্দিষ্ট সময়ে এগুলি তৈরি হয় এবং স্থানীয় ব্যক্তিরা এর সঙ্গে যুক্ত নন। হাওড়া জেলার বাগনান, উলুবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে লোক এখানে আসেন এবং কয়লা ডিপো সন্নিহিত অঞ্চলে ঘর ভাড়া নিয়ে কাজ করেন। এরা মূলত বাগদী এবং নিচু সম্প্রদায় ভুক্ত। প্রায় ৭০ টি পরিবার বাঁক শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত। তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।এটি যথেষ্ট লাভজনক শিল্প।যখন চাহিদা থাকে না তখন এঁরা কৃষিকাজ বা অন্য পেশার সঙ্গে সংযুক্ত হন।[৩৩]

শিকে শিল্প: শিকে তারকেশ্বরের তীর্থযাত্রীদের একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। মাটির কলসিতে বাঁকের সঙ্গে শিকের সাহায্য মাটির জল ভর্তি ঘট ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই চাহিদার জন্য শেওড়াফুলির খন্দকারপাড়ায় শিকে তৈরি হয়। ১৫০ থেকে ২০০ টি পরিবার এই পেশার সঙ্গে সংযুক্ত। এরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। এরা শেওড়াফুলির আড়ত থেকে কাঁচা পাট কিনে শিকে তৈরি করেন।[৩৪]

তারকেশ্বর মন্দিরের সবচেয়ে বড় কাজ হলো --এটি কর্মদাতা হিসেবে কাজ করে। তারকনাথের মন্দিরকে কেন্দ্র করে বহু সংখ্যক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন।শুধু তারকেশ্বর নয়, শেওড়াফুলির মানুষও বাড়তি উপার্জন করতে সক্ষম হন। তারকেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করে জেগে রয়েছে বাংলার কিছু ক্ষুদ্র কুটির শিল্প। এগুলি হুগলি জেলা তথা বাংলার লোক- শিল্পের ধারাকেও সমৃদ্ধ করেছে।মন্দিরকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে ওঠায় তারকেশ্বর হয়ে উঠেছে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য যেমন আলু, চাল, পাট প্রকৃতি বিক্রির প্রধান বাজার। এখান থেকে কলকাতা বা অন্যত্র জিনিস রপ্তানি হয়। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষও তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রির জন্য এখানে আসেন।

রামনগরের জেলেরা গাজনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তরীয় তৈরি করেন। জঙ্গলপাড়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের তাঁতিরা মোটা কাপড় তৈরি করেন। এছাড়া নতুনগ্রাম অঞ্চলের লোকেরা তারকনাথের ছবি আঁকেন। এগুলি বিক্রির জন্য তারা মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে নিয়ে আসেন।তারকেশ্বর মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে তৈরি হয়েছে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, যেগুলির মালিক ও কর্মচারীরা সম্পূর্ণভাবে তীর্থযাত্রীদের উপর নির্ভরশীল।[৩৫]

ধর্ম, উৎসব ও অর্থনীতি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। হিন্দু ধর্মের বেশিরভাগ উৎসবগুলি কোন না কোন ভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় হল আঞ্চলিক অর্থনীতি। তারকেশ্বর অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে তারকনাথ নামক শিব মন্দির কে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ এখানে শিব্য ধর্মের প্রাধান্য রয়েছে। শিব ছিলেন নিম্ন সম্প্রদায়ের দেবতা। হান্টার সাহেবের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তারকেশ্বর অঞ্চলটিও ছিল আদিবাসী এবং নিচু সম্প্রদায়ের মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ। তাই মন্দির প্রতিষ্ঠতা ভারামল্ল তাঁর সামাজিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য এই অঞ্চলটিতে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক জনপ্রিয়তা পাবে-- এটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলে প্রচলন হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের উৎসবের। উৎসবগুলির বেশিরভাগই ছিল মন্দির কেন্দ্রিক। মন্দির ও উৎসবকে কেন্দ্র করে লোকসমাগম হতে থাকে।তারকেশ্বরে গড়ে ওঠে একটি বৃহৎ বাজার। বিভিন্ন স্থান থেকে অভিবাসন ঘটতে থাকে তারকেশ্বরে।সুতরাং বলা যায় হান্টারের বর্ণনায় যা ছিল একটি 'গ্রামীণ জনপদ', তা বর্তমানে একটি শহরের রূপ নিয়েছে।মন্দিরকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল জনপদটির পরিবর্তন। মোহন্তদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, মন্দির কেন্দ্রিক মিথ, মন্দিরের উৎসব অনুষ্ঠান, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, প্রশাসনিক উদ্যোগ অঞ্চলটির আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিকাশে সহায়ক হয়। অঞ্চলটি পরিণত হয় একটি মফস্বল শহরে।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র,সুধীর কুমার, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ,২য় খন্ড, মন্ডল বুক হাউস,কলকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ১১০৯.

২. Paul, Dhirendranath, Shiva and Shakti,2nd Vol.Kolkata,1910, P.229.

৩.সংবাদ প্রতিদিন(রবিবার বিশেষ সংখ্যা), ২৯জুলাই, ২০০৭, পৃঃ ১০.

৪. Crawford,D.G., A Brief History of Hooghly District, Bengal Secretariat Book Depot,1912, P.56.

৫. চট্টোপাধ্যায়,অমিয় কুমার, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাবা তারাকনাথ, শ্রীতারা প্রেস,কলকাতা,2005,পৃঃ ১ .

৬. মিত্র, সুধীর কুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১১২

৭.তদেব, পৃঃ ১১১৩

৮. চট্টোপাধ্যায়,অমিয় কুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮

৯. তদেব ,পৃঃ ৪৩

১০.মৌখিক সাক্ষাতকার , নিমাই পাল, স্থানীয় বাসিন্দা, তারাকেশ্বর, তারিখঃ ২২.০২.২০২৩

১১. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, লোক উৎসব ও লোক দেবতা প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা,১৯৮৪, পৃঃ ১০৬

১২. Hunter,W.W., A Statistical Account of Bengal, Hugli and Howrah,Govt. of West Bengal, Calcutta,1997,P.49.
১৩. মিত্র, সুধীর কুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২৪
১৪.শ্রীপান্থ, মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ, আনন্দ,কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৬--২৬.
১৫. Chakraborty,Prafulla, Social Profile of Tarakeswar, Firma KLM, Kolkata,.P.21
১৬. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস,আদিপর্ব, দেজ পাবলিশিং,কলকাতা,১৪২২,পৃঃ ৪৮৬
১৭.শ্রী শ্রী তারকেশ্বর লীলা,তারকেশ্বর মঠ কর্তৃক প্রকাশিত, কমলা আর্ট প্রেস,কলকাতা,২০০৫,পৃঃ ২১
১৮. মুখোপাধ্যায়,অমিতাভ, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স,কলকাতা,১৯৭১,পৃঃ ৭৭
১৯. তদেব, পৃঃ ৭৮
২০. তদেব, পৃঃ ৮১
২১. সেনাপতি, নিত্যানন্দ, তারকেশ্বর ও তরকনাথ,শ্রী দুর্গা লাইব্রেরী,কলকাতা,২০০২, পৃঃ,৫২.
২২. মিত্র,সুধীর কুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ,৩২৪-৩২৫
২৩.District Census Handbook,Hooghly,1971, Census of India Series 22,W.B., Complied by Directorate of Census Operation,W.B. and http://citypopulation.de.
২৪.ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার : ভোলানাথ চক্রবর্তী, প্রাক্তন ম্যানেজার, তারকেশ্বর এস্টেট, তারকেশ্বর, তারিখ : ২০.০২.২০২৪
২৫. O'Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteer, Hooghly, Bengal Secretariat Book Depot,1912, pp.239-240.
২৬.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: সীতারাম চ্যাটার্জী, মানিক দাস, শুম্ভু চ্যাটার্জী, পান্ডা, তারকেশ্বর। তারিখ: ১৫.০১.২০২৪
২৭.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: নিরাপদ দাস, অনিক পরামানিক, নাপিত,তারকেশ্বর, তারিখ:২৪.০২.২০২৪
২৮.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: অজিত পাল,পঞ্চানন পাল, মৃৎশিল্পী, তারকেশ্বর, তারিখ: ২৫.০২.২০২৪
২৯.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: সুশান্ত মালি, সত্য মালি, ফুল বিক্রেতা, তারকেশ্বর, তারিখ: ২১.০২.২০২৪
৩০.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: তপন ঘোষ, ইন্দ্রনাথ গোপ, দুধ ব্যবসায়ী, তারকেশ্বর,তারিখ: ২৫.০৩.২০২৪
৩১.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: ভোলানাথ চক্রবর্তী, ম্যানেজার,তারকেশ্বর এস্টেট, তারকেশ্বর, তারিখ:২৬.০৬.২০২৪
৩২. Morinis, E.Alan , Pilgrimage in Hindu Tradition: A Case Study of West Bengal, Delhi, 1984, P.110.
৩৩.ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: নিমাই পাল, অচিন্ত্য ঘোষ, স্থানীয় বাসিন্দা, দেওরাফুলি, তারিখ: ০১.০৩.২০২৩
৩৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: সমরেশ কোলে, শেওড়াফুলি, তারিখ: ০৫.০৫.২০২৩
৩৫. http://www.tarakeswar municipality.in., accessed date: 02.05.2025.

মেচ সমাজে খ্রিস্ট ধর্মের আগমন ও প্রভাব: ঔপনিবেশিক পর্যালোচনা

ড. সান্তনা মোচারি
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, কোচবিহার কলেজ

সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি অনেকগুলি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এর ফলে আর্থ-রাজনৈতিক এর সাথে সাথে ভারতীয় সমাজ-জনজীবনও নানান দিক থেকে প্রভাবিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের বন নীতি, পতিত জমি নীতি, চা বাগিচা স্থাপন এবং সর্বোপরি খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন এতদ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর গভীর প্রভাব পড়েছিল। খ্রিস্টান মিশনারীগণ পূর্ণ উদ্যমে ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেদের নিমজ্জিত রেখেছিল। এই মিশনারীদের অনেকে যেমন কোন সংস্থা থেকে এসে ধর্মপ্রচারের কাজে নেমেছিলেন ঠিক তেমনি নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে নিঃস্বার্থভাবে এই ধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাথৌ ধর্মাবলম্বী, প্রকৃতিপূজারী তথা অ্যানিমিষ্ট মেচদের উপর এই নতুন ধর্ম কিরকম চরিত্র ধারণ করেছিল এবং এই প্রভাবের ফল কী হয়েছিল সেই বিষয়েই এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দঃ মেচ সমাজ, মেচদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব, উত্তরবঙ্গের মেচ জনজাতি, ডুয়ার্স, মেচ সংস্কৃতি

মূল প্রবন্ধ

(১)

১৮৬৪ - ৬৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ডুয়ার্স থেকে ভুটানিদের বিতারণ করে ব্রিটিশ সরকার সমস্ত ডুয়ার্স অঞ্চল নিজেদের দখলে নেয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার তাদের বন সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করে। সদ্য বিজিত ডুয়ার্স অঞ্চলেও এই বন সংরক্ষণ নীতি লাগু হয়ে যায়। জঙ্গলকে সংরক্ষিত (Reserved), সুরক্ষিত (Protected) ও জোতদার বা জমিদারদের ব্যক্তিগত (Personal) এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এরপর শুরু হয় এতদঞ্চলের বনজঙ্গলের উপর সরকারি নানা আইন এবং বাধা নিষেধ। ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলার গঠন এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে চালু করা হয় পতিত জমি আইন। এই আইন বলে জমি জরিপের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য নিশুল্ক জমি চাষ করার অধিকার প্রদান করা হয়। বন নীতি ছিল স্থানান্তরিত

চাষীদের জন্য একটি বাধা এবং পতিত জমি আইন ছিল পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে উক্ত অঞ্চলে জনবিস্ফোরণের রাস্তা তৈরি করা। ঠিক এই সময়েই বিহারের গয়া থেকে ডুয়ার্স এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারীর পদযাত্রা শুরু হয়েছিল বিশেষত স্কটিশ মিশনের হাত ধরে। মিশনারীরা পূর্ণ উদ্যমে তাদের সেবামূলক কাজ এবং ধর্ম প্রচার শুরু করলেও প্রথমদিকে মেচদের উপর তেমন দাগ কাটতে পারেনি। পরবর্তীকালে প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং এতদঞ্চলের প্রান্তিক ভাষা শিক্ষা লাভের মাধ্যমে তাদের ধর্ম প্রচারের বাধা অতিক্রান্ত করতে সাহায্য করেছিল।

উত্তরবঙ্গের মেচ জাতি বিশেষত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা, টোটো, গারো প্রভৃতি আদি বাসিন্দাদের মত একটি আদিমতম জনজাতি। এছাড়াও কোচবিহার, দার্জিলিং, আসাম সহ পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটান, নেপাল এবং বাংলাদেশেও তাদের বসতি রয়েছে। মেচ জাতি বৃহত্তর বড়ো মঙ্গোলীয় জাতির শাখা তারা আসামে বড়ো, পশ্চিমবঙ্গে মেচ এবং নেপালে মেচে নামে পরিচিত। ১৮৪৭ হজসন তার Essays the first on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বড়ো' নামকরণ করেন। মেচদের 'মেচ' নামকরণের পেছনে অনেকে ঐতিহাসিকগণ নানান মত প্রদান করে থাকেন। নগেন্দ্র নাথ মেচদের ম্লেচ্ছ থেকে নামকরণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। রিজলি মেচদের নামকরণের পেছনে মেচী নদীর কারণ অবতারণা করেছেন। মেচ একটি জাতি যাদের সৌন্দর্যপূর্ণ প্রাচীন সামাজিক সংস্কৃতি, পোশাকের বাহার, নৃত্য এবং সুস্রাব্য সংগীতের সমৃদ্ধতর ঐতিহ্য রয়েছে। মেচ ধর্ম বাথৌ নামে পরিচিত এবং মেচদের মধ্যে যারা জাতি, ভাষা ও ধর্মান্তর থেকে মুক্ত থেকেছে তাদের আজও বাথৌ ধর্ম পালন করতে দেখা যায়। ধর্মের প্রতিভূ হিসাবে ফনি মনসা গাছকে তারা পুজো করে। রেভারেন্ড সিডনি এন্ডেল তার 'The Kacharis' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "...distinctly of the type commonly known as animistic its underlying principle being characteristically one of fear or dread." [১] এই ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক মেচ বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে একটি বেদীতে ফণী বা সিজু মনসা গাছ রোপিত থাকে এবং দুবেলা পূজিত হন। ফণী মনসা গাছকে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে পাঁচ সিঁড়ি গাঁথনির মাধ্যমে বেদী বানিয়ে ঘিরে রাখা হয়। সিজু মনসা গাছে পাঁচ সারি কণ্টক যুক্ত কাঁটা থাকে। মেচদের মতে এই পাঁচ সারি কাঁটা পঞ্চ প্রকৃতির তত্ত্ব বহন করে। এই দেবতার বাৎসরিক সার্বজনীন পূজা হয়। দেবতার স্ত্রী হিসাবে মাইনাও বুড়ে পূজিত হন এবং তার স্থান রান্না ঘরে। ইনি আই বালি খুংগ্রি নামেও পরিচিত এবং ধন-সম্পতি অর্থাৎ লক্ষ্মীর দেবী। এছাড়াও সমস্ত গ্রামবাসীদের নিয়ে গ্রামীণ মঙ্গল সাধনের জন্য 'খেরাই' 'গার্জা' প্রভৃতি পূজা করা হয়। তবে বিশ্বায়ন, দীর্ঘদিনের বঞ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং বিড়ম্বনা তাদের মধ্যে নতুন ধর্মের আগমন ঘটে। তারা তাদের পিতৃ পুরুষের ধর্ম ও আরাধ্য দেবতাদের ত্যাগ করে নতুন ধর্মের প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করে ধর্মান্তরিত হয়। তবে পশ্চিম ডুয়ার্সের অনেক পূর্বেই ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে আসামে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার এবং ধর্মান্তকরণ শুরু হয়েছিল। বাংলায় এই পদযাত্রায় আলেকজান্ডার ডাফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর এই ধর্ম প্রচারের প্রক্রিয়ায় অনেকগুলি খ্রিস্টান মিশন কাজ করছিল। তবে উত্তরবঙ্গে মেচদের

মধ্যে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারে স্কটিশ মিশনারী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পশ্চিম ডুয়ার্সে অর্থাৎ দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বসবাসকারী জাতি ও জনজাতিদের মধ্যে খ্রিস্টীয় ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই মিশনের পদযাত্রা শুরু। ১৮২৯ সালে বাংলায় স্কটিশ মিশনের পথচলা শুরু হয় এবং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিহারের গয়ায় আলেকজান্ডার ক্লার্ক এর তত্ত্বাবধানে একটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে সাহায্য করার জন্য রেভারেন্ড ম্যাকফারলেন যোগ দেন।[২] বিহারে মিশনের কাজে তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় ম্যাকফারলেন স্কটিশ মিশনকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার অনুরোধ করেন। ঠিক এই সময়ই ভারতে স্কটিশ মিশনের কাজকর্ম তদারকি করার জন্য চার্জ অফ স্কটল্যান্ড ডক্টর নরম্যান ম্যাকলয়েড এবং ডক্টর ওয়াডসনকে ভারতে পাঠান।[৩] তাদের অনুসন্ধান ও রিপোর্টকে ভিত্তি করে এবং স্কটিশ নির্দেশনায় রেভারেন্ড ম্যাকফারলেনকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিঙে মিশনের কাজের এলাকাকে স্থানান্তরিত করা হয়। দার্জিলিং জেলার চা বাবু, ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার প্রমূখ এই স্থানান্তরের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মিশনারী কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্কটিশ মিশন “Mission to the aborigines of Northern India” নামক একটি সংস্থা স্থাপন করে এবং লেপচা, ভুটিয়া, নেপালি, মেচ ও রাজবংশীদের উপর কাজ করতে অনুমতি প্রদান করা হয়। নিয়োগ করা হয় দুজন জার্মান যুবক মিস্টার বিউটেল এবং রেভারেন্ড কনরাড বিকটোল্ডকে।

দার্জিলিং জেলার কালিম্পঙকে কেন্দ্র করে স্কটিশ মিশনারীর পথচলা শুরু হয় তবে তাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যা যেমন ছিল জলবায়ু এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঠিক তেমনি এতদঞ্চলের স্থানীয় ভাষা না জানার জন্যও তাদের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। জলবায়ু এবং রোগের প্রাদুর্ভাব প্রথমদিকে যেখানে মিশনারী কাজের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরবর্তীতে সেই বাধা তাদের ধর্ম প্রচারের কাজে এসেছিল। কালিম্পং এলাকায় স্কটিশ মিশনের আগমনের সময়ে কলেরা মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। এই মহামারীর ফলে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল বিশেষত সকালে যাদের সুস্থ দেখা গেছে বিকালেই তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বিভিন্ন গ্রাম এবং চা বাগিচার শ্রমিকরা নিজেদের জীবন রক্ষা করার জন্য মৃতদেহ সৎকার না করে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের ফেলে রেখেই জঙ্গলে পালিয়ে যেত। এই মহামারীর সময় মিশনারী ব্যক্তিগণ জনগণের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। মহামারী অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় ‘গ্লেডেনিং রিভার’ নামক গ্রন্থ থেকে, “After Jangabir was out of danger, I remained for almost a fortnight, visiting the villagers. Their sentiments towards the Mission at this time underwent a complete change. At first it was viewed with deep suspicion. Now they began to come daily in twos and threes for medicines. We are welcomed to their homes, and allowed to read and pray where no one would previously have permitted us to enter.”[৪] আরেকটি প্রধান কারণ ছিল এই অঞ্চলের জনজাতিদের ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে চাষাবাদ। এই ব্যবস্থার ফলে কোন একটি গ্রাম কয়েক বছর অন্তর অন্তর তাদের অবস্থান বদল করত। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড ম্যাকফারলেন

রেভারেন্ড বিকটোন্ড ও বিউটেলকে মেচদের উপর কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন। তারা মেচ ভাষা শেখার জন্য দার্জিলিং এর পরিবর্তে মেচ অধ্যুষিত পাঙ্খাবাড়িতে থেকে ভাষা শেখার কাজ শুরু করে। এই ভাষা শেখার জন্য তারা একজন দোভাষীকে নিয়োগ করেছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ভাষা রপ্ত করেছিলেন। ভাষা শেখার সাথে সাথে তারা ওই এলাকায় স্কুল স্থাপন করে বাইবেলের শিক্ষা ছাড়াও ইংরেজি, অংক এবং ভূগোল পড়াতে শুরু করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কালিম্পঙে স্থাপন করা হয় 'স্কটিশ মিশনারী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট' (S.U.M.I) নামে একটি বিদ্যালয় এবং প্রথম বছর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ জন ছাত্র ভর্তি হয়। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জন অ্যান্ডার্সন গ্রাহাম কালিম্পঙে এলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গিল্ড মিশনারী বা স্কটিশ মিশনের স্থাপন হয় এবং কাজে গতি আসে হয়।[৫] এই গিল্ড মিশন বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকায় দাতব্য চিকিৎসালয়, গির্জাঘর ইত্যাদি স্থাপন করতে থাকে। তাদের কাজের নিদর্শন স্বরূপ স্বাধীনতার এতকাল পরেও দামসীবাদ গিল্ড মিশনারী প্রাইমারি স্কুল, গাজেরডাব্রী গিল্ড মিশনারী প্রাইমারি বিদ্যালয়, ঢালকর গিল্ড মিশনারী বিদ্যালয় ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

(২)

গিল্ড মিশনারী ১৮৭০ সাল থেকে মেচদের উপর কাজ শুরু করলেও ধর্মান্তকরণের ক্ষেত্রে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। মেচদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন জগৎ সিং বসুমাতা। তার পিতা বাবুরাম বসুমাতা ছিলেন নেপালের মরং জেলার অধিবাসী। জগৎ সিং বসুমাতা তার পিতার মতন ছিলেন বাথৌ ধর্মের উপাসক। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জলপাইগুড়ি জেলার দুদুমারি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে, আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি তার পিতার ধর্ম পালন করে কখনো শান্তি পাননি। অনেক তীর্থস্থান ভ্রমণ করে তিনি তার আত্মিক অশান্তি দূর করার চেষ্টা করেন। তবে তিনি বিফল হন। শেষ পর্যন্ত তীর্থস্থান থেকে ফিরে আসার সময় জলপাইগুড়ি শহরে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে জনৈক আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের রেভারেন্ড জেমস এর সাথে কথা বলে তিনি তার আত্মার শান্তি লাভ করেন এবং তার কাছেই খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে বাপ্তিস্মা নেন। ধর্মান্তরিত হয়ে জগৎ সিং বসুমাতা কালিম্পঙে গিয়ে এই ধর্ম বিষয়ে দু বছরের শিক্ষা লাভ করেন এবং মিশনারী কাজে নিয়োজিত হন। এই সময় তার সহকর্মী হিসাবে ওদলাবাড়ির নাইমন কাশ্চপ এবং মেটেলির এলাইজার এর নাম জানা যায়। নতুন ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাকে তার আত্মীয় পরিজনদের কাছে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯০৩ সালে জগৎ সিং বসুমাতা সহ সাতটি পরিবার অধুনা আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম থানার অধীন পশ্চিম চেংমারীর ধনতলী নামক গ্রামে চলে আসেন আর একে একে অনেকেই তার ধর্মমত গ্রহণ করেন। এই গ্রামেই ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মেচদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'ইস্টার্ন ডুয়ার্স বোডো স্কটিশ মন্ডলী' নামে একটি গির্জাঘর স্থাপিত হয়।[৬] তারই উদ্যোগে এবং প্রচারের মাধ্যমে পরবর্তীকালে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় এবং আসামে মন্ডলী স্থাপিত হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত সংখ্যা ছিল ১১৪৭ জন এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায়

২৫৩০ জন। সুতরাং অনুমান করা যায় কি পরিমাণ লোককে তিনি ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিলেন। তার জনসংযোগ ক্ষমতা সম্পর্কে ম্যানুয়েল ডি.জি. লিখেছেন, "Jagat had undoubtedly gathered a large and most devoted congregation around him, and when it is remembered that so recently as three years ago not a single Christian was to be found in this place, the evidences Jagat's character and Jagat's ability are unmistakable." [৭] ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে মার্চ আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার ধর্ম প্রচার করে গেছেন এবং অনেকগুলি মণ্ডলী স্থাপন করেছেন।

(৩)

জগৎ সিং বসুমাতার উত্তরসূরি হিসেবে তারই বোনপো জিতনাল নার্জিনারী পরবর্তীকালে মেচদের মধ্যে ধর্ম প্রসারণের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার পিতার নাম দেবী সিং নার্জিনারী এবং মাতার নাম ছিল কদমশ্রী তিনি পদ্মশ্রী নামেও পরিচিত ছিলেন। কদমশ্রী তৎকালীন রেভারেন্ড উইলিয়ামস এর পত্নীর সহায়তা পান এবং মহিলাদের মধ্যে ধর্ম প্রচার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিচালনা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষাদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। শৈশবকালে তিনি ধনতলী গ্রামে মিশনারীদের স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পান এবং পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কালিম্পঙ স্থিত S.U.M.I স্কুলে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষকতা পেশায় আসার আগে তিনি শিক্ষকতার ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং ধনতলী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি জনগণের কাছে সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি মেচ মন্ডলীর কর্ণধার এ পরিণত হন এবং তার তত্ত্বাবধানে খ্রীস্টান ধর্ম মেচদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। তিনি শুধু ধর্ম প্রচারে তার কাজকে আটকে না রেখে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে নিয়োজিত প্রাণ হন। ওই সময় 'পারিপার্শিক' চাপে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মেচদের 'নতুন ভুমি' সন্ধানের উদ্দেশ্যে আসামের দিকে পলায়নকে রোধ করার জন্য তিনি উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ এবং চাষাবাদে কিভাবে জলসেচ করা দরকার তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন। স্বর্গীয় গজেন মোছারী সাক্ষাৎকারে জিতনাল নার্জিনারী সম্পর্কে তার স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন, জমিতে কিভাবে জল ধারণ করতে হয় তা বোঝাতে তিনি এটি থালা মাথায় রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন সেটিকে রাখতে পারেন না তখন তিনি একটি গামছার মাধ্যমে মাথায় পাগড়ী তৈরি করে থালাটিকে স্থির ভাবে রেখে দেন।[৮] অর্থাৎ এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি জমিতে আল দেওয়ার মাধ্যমে কি ভাবে জল ধরে রাখতে হয় তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শামুকতলার মহাকালগুড়িকে কেন্দ্র করে মেচদের উপর খ্রীস্টান মিশনারীর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এবং স্থাপিত হয়েছিল মিডিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের। তার একান্ত উদ্যোগেই মহাকালগুড়ি মিশনে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মিডল ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছিল। তার নিরলস পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলেই মেচ সন্তানগণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। তদানীন্তন কালে মেচ অধ্যুষিত এলাকাগুলির মধ্যে

মহাকালগুড়ি শিক্ষা, সমাজ সচেতনতা, স্বাস্থ্য, চাকুরী ও খেলাধুলা ইত্যাদিতে পথপ্রদর্শক হিসেবে উঠে এসেছিল। সমস্ত মেচ সমাজ মহাকালগুড়ি গ্রামের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও শিক্ষাদানে উৎসাহ দান করার রসদ খুঁজে পেয়েছিল এবং মকালগুড়িতে ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়া শেখানোর তাগিদ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। জগৎ সিং বসুমাতা স্থাপিত মেচ মন্ডলীর শিশু অবস্থা থেকে মহীরুহতে নিয়ে যাওয়ার তার আপ্রাণ চেষ্টা সার্থক হয়। তার তত্ত্বাবধানে মেচ মন্ডলী আদায় করতে পেরেছিল সম্মান ও সহানুভূতি। তাই স্কটল্যান্ড এর গিল্ড মিশনের অভিভাবকেরা মেচ মন্ডলীকে 'One of the unique churches in India'[৯] বলে অভিহিত করেছেন।

(৪)

মেচগণ প্রাচীনকাল থেকেই তাদের উদার মনস্কতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা থাকা সত্ত্বেও পর ধর্ম চর্চা ও গ্রহণ প্রাচীনকাল থেকেই মেচদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদের প্রকৃতিবাদী ধর্ম বাথৌকে বর্জন করে অন্যান্য ধর্ম গ্রহণের প্রতি ঝোঁক তাদের মধ্যে ছিল। ধর্ম গ্রহণের এই সহজাত ইচ্ছা থেকেই তাদের সামনে যখন খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারিত হয় তখন তারা সহজেই এই ধর্মকে আপন করে নিয়েছিল। তাছাড়া অনুষ্ঠান সর্বস্ব পুরোহিত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাথৌ ধর্ম উপাসকগনের কাছে যখন খ্রীস্টান ধর্মের কাহিনী প্রচারিত হয়েছিল তখন তাদের আকৃষ্ট করে। তাছাড়া তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের জ্ঞানের ভান্ডার খুলে যায় এবং অন্য ধর্ম সম্পর্কে পিপাসিত হয়ে পড়ে। বাথৌ ধর্মের লিখিত কোন গ্রন্থ না থাকার ফলে পুরোহিতদের নিজেদের তৈরি অনুষ্ঠান সর্বস্ব আচার-আচরণও মেচদের অন্য ধর্ম গ্রহণ করার একটি প্রধান কারণ।[১০]

১৮৭০ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জগত সিং বসুমাতা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত মিশনারী কর্মকাণ্ড মেচদের মধ্যে অব্যাহত থাকলেও কিন্তু কোন ধর্মান্তকরণের কাজ হয়নি। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে মেচ সমাজে এক গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের কিছু কাল পরই দেখা যায় এক বিশাল সংখ্যক মেচ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। যে কাজ বিদেশি মিশনারীরা কয়েক বছরের চেষ্টাতেও করতে পারেনি তা জগৎ সিং বসুমাতা কিছুদিনের মধ্যেই করে দেখালেন। তবে এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। খ্রিস্টান ধর্ম মেচদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেছিল। ধর্মান্তরিত মেচগণ নিজেদের আলাদা বোঝাতে 'ভাই' বলে সম্বোধন করতেন। যারা বাথৌ ধর্মেই থেকে গিয়েছিল তারাও নিজেদের আলাদা বোঝাতে সামাজিক মেলামেশার সময় জায়গাগুলিতে আলাদাভাবে বসা, একসাথে ভোজন না করা অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে আলাদাভাবে রন্ধন করার ও খাওয়ার প্রথা শুরু হয়। ধর্মান্তরিত মেচরা তাদের জাতিগত পৈত্রিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্জন করে নতুন ধর্মের রীতিমতো আচার-অনুষ্ঠান করতে থাকে। ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের বংশপরম্পরায় প্রচলিত প্রথা হয়েছে বর্জিত। আবার অনেকে পাশ্চাত্য ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ফলে নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ভুলে গেছে। যে সহাবস্থানের মহান আদর্শে তারা একসময় একত্রে বসবাস করতো তা হয়েছে সংকীর্ণ। আপাত দৃষ্টিতে উপরিউক্ত বিষয়গুলি প্রধান মনে হলেও

এর অন্তর্নিহিত প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। মেচরা খ্রীস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বলেই উপনিবেশিক ডুয়ার্সে বন নীতি, চা বাগিচা স্থাপনের ফলে উৎখাত, পতিত জমি নীতির ফলে জনবিস্ফোরণ ইত্যাদি অনেকগুলি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হলেও তাদের পক্ষ থেকে কোনো বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

উপরিউক্ত দোষ ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা গেলেও একথা বলা যায় যে, খ্রিস্টান মিশনারীদের মাধ্যমেই প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ তাদের সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের মধ্যে মহিলাদের মধ্য থেকে শিক্ষিকা হিসাবে উঠে এসেছিলেন অঙ্গশ্রী বসুমাতা, সাবিত্রী নার্জিনারী। মেচদের মধ্যে নবীনদের মধ্যে নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বধর্ম জনগণ সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। তেমনি কালচিনি ব্লকের সাতালি গ্রামে ২০২৫ সালের বৈশাগু যৌথভাবে পালিত হয়েছে। তাই সঙ্গত কারণে চারুচন্দ্র সান্যাল এর ভাষায় বলা যায়, "The Christian amongst them have got enlightenment and English education and adopt some of the patterns of Western culture in dress, food etc. but have lost some of their own."[১১]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Endle, Rev. Sidney, The Kacharis, Quated by M.C. Saikia, The Brahma Movement among the Bodo-Kacharis of Goalpara District, Tribal Movements in India, Edited by K.S. Singh p. 241

২. Dash, Jules - Bengal District Gazetteers, Darjeeling, West Bengal Government Press, Alipore 1947, P: 265

৩. Manuel, Rev. D.G., A Gladdening River, Twenty -five years Guild influence among the Himalayas, London: A. & C. Black limited, Edinburgh: R. & R. Clark limited, 1914, Page 10

৪. Manuel, Reverend D.G., ibid p: 10

৫. Ibid, page 25

৬. রেভারেন্ড হীরাচরণ নার্জিনারী, বড়ো মন্ডলীর কর্ণধার রেভারেন্ড জিতনাল নার্জিনারী, পৃষ্ঠা 1-2।

৭. Manuel, Reverend D.G., pp: 95- 96

৮. স্বর্গীয় গজেন মোছারী, সাক্ষাৎকার, গাজেরডাব্রী মণ্ডলী

৯. নার্জিনারী, ঐ, পৃষ্ঠা 23

১০. Sanyal, C.C., The Meches and the Totos; two sub-Himalayan Tribes of Bengal. Calcutta, 1973, P. 19

১১. Sanyal, C.C., ibid, p. 9

সাহিত্য সংস্কৃতির আলোকে রাঢ়বঙ্গের প্রান্তিক জনজাতি

দশরথ রজক
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ -

ভৌগোলিক পরিমন্ডলে বসবাসকারী মানবজাতির সংগঠিত রূপ হল সমাজ। এই সমাজে মানুষের জীবনশৈলীর অভিব্যক্তির রূপকে বলা হয় সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে মানবজাতির পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চিত লিখিত রূপ হলো সাহিত্য। তাই সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একই বন্ধনে আবদ্ধ বলা চলে। মানুষ যখন প্রথম জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করে তখন তাদের মনে বিভিন্ন জনজাতির জন্ম হল। এই জনজাতিগুলির রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম, পরব-পার্বণ, আমোদ-প্রমোদ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংস্কার, খেলাধুলা, পড়াশোনা, এবং ভাষা-ভঙ্গিতে এক সাধারণ ভাব বর্তমান। যা তাদের প্রান্তিক জনজাতি রূপে পরিচয় বহন করে। সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জুড়ে প্রান্তিক জনজাতির বসবাস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান জেলাগুলিতে এদের বসবাস বেশি। সাঁওতাল, খেড়িয়া, করঙ্গা, হাড়ি, বাগদি, বাউরি, ডোম, মুচি, ধোপা, কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলা, মাঝি, তাঁতি, গোয়ালা এবং নাপিত প্রভৃতি প্রান্তিক জনজাতিগুলি এক নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের আদি- মধ্য যুগের বড়ু চণ্ডীদাস, রামাই পণ্ডিত, কবিকঙ্কন এবং আধুনিক যুগের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, বুদ্ধদেব গুহ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্যে প্রান্তিক জনজাতিদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারবার। সে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিক দিকটিও পরিস্ফুটিত হয়েছে। সাঁওতালদের জঙ্গলময় জীবন, বাগদিদের লাঠি হাতে যুদ্ধ, বাউরীদের শ্রমিকের কাজ, জেলেদের নদীমাতৃক জীবন, কামার জাতির লৌহজাতীয় দ্রব্য তৈরী, ডোমজাতির মানুষদের বিভিন্ন রকম বাঁশের কাজ, এবং মুচির জুতো তৈরী সব মিলিয়ে জনজাতির আপন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিরামহীন সাহিত্য সাধনায় একের পর এক সাহিত্য-চূড়া নির্মাণ হয়েছে এই জনজাতিদের নিয়ে। যেখানে সমাজের সামগ্রিক জীবনচর্চার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সম্মিলন, ভূপ্রকৃতি, সমাজ, সামাজিক অনুশাসন, মানুষের সংঘাত-মিলন, নৈসর্গিক পরিবেশ, জীবিকাগত জীবনযাপনের বিন্যাস, জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধ সবই সাহিত্য সংস্কৃতিতে ভীড় করেছে।

সূচক শব্দঃ- জনজাতি, সাহিত্যের, সংস্কৃতি, শিল্প, জীবন- জীবিকা, রাঢ়বঙ্গ

মূল প্রবন্ধ

ভৌগোলিক পরিমন্ডলে বসবাসকারী মানবজাতির সংগঠিত রূপ হল সমাজ। এই সমাজে মানুষের জীবনশৈলের অভিব্যক্তির রূপকে বলা হয় সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে মানবজাতির পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চিত লিখিত রূপ হলো সাহিত্য। তাই সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একই বন্ধনে আবদ্ধ বলা চলে। মানুষ যখন প্রথম জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করে তখন তাদের মনে বিভিন্ন জনজাতির জন্ম হল। এই জনজাতিগুলি পাহাড়ে, নদীর পাড়ে, জঙ্গলের মাঝে কিম্বা একেবারে গ্রাম্য পরিবেশে বসবাস করতে শুরু করায় হয়ে উঠল তারা প্রান্তিক জনজাতি। তাদের জীবন চর্চায় কিছু পালনীয় প্রথা-প্রকরণ, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম, পরব-পার্বণ, আমোদ-প্রমোদ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংস্কার, খেলাধুলা, পড়াশোনা, এবং ভাষা-ভঙ্গি সব নিয়ে এক বিশাল মানব জীবনের পরিমণ্ডল প্রতিষ্ঠা হল। সেই প্রতিষ্ঠিত রূপ যুগ যুগ ধরে মানবের মনি কোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকলো সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। সাহিত্যকে বাদ দিলে এ সমস্ত জনজাতির হয়তো একদিন অবলুপ্ত হয়ে পড়তো। তাই মানব জীবন সাহিত্যকে যেমন আকড়ে ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঠিক তেমনি সাহিত্য মানব জীবনের সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে গ্রহন করে প্রতিষ্টিত হওয়ার রসদ পেয়েছে।

সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জুড়ে প্রান্তিক জনজাতির বসবাস লক্ষ্য করা যায়। এদের বৃত্তি, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, খাদ্য এবং চালচলন নিম্ন প্রকৃতির হওয়ায় সমাজ তাদের প্রান্তিক জনজাতি বলে পরিগনিত করেছে। এরা খড়ের ঘরে সাদামাটাভাবে দিন অতিবাহিত করে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান জেলাগুলিতে এদের বসবাস বেশি। এরা সঙ্গতই বন, জঙ্গলকেন্দ্রিক অরণ্যজীবন পছন্দ করে। সাঁওতাল, হাড়ি, বাগদি, বাউরি, ডোম, মুচি, ধোপা, কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলা, মাঝি, তাঁতি, গোয়ালা এবং নাপিত প্রভৃতি জনজাতিগুলি এক নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। রাঢ়ের এই জনজাতি নিয়ে বিনয় ঘোষ বলেছেন-

“উত্তর রাঢ়ের মল্লভূম ঝারিখণ্ড জঙ্গলমহল, সবই গভীর বনাকীর্ণ ছিল। আদি অস্ট্রাল বা নিষাদ ও দ্রাবিড় ভাষাভাষি দাসদস্যুদের বাস ছিল এই অঞ্চল থেকে সাঁওতাল পরগনার ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে। উত্তরবঙ্গে যেমন কিরাত সংস্কৃতির (ইন্দো-মোঙ্গলয়েড কালচার) সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে হিন্দুসংস্কৃতির, পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়দেশে তেমনি তার সঙ্গে মিলন মিশ্রণ ঘটেছে নিষাদ-দাসদস্যু সংস্কৃতির। এই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করেছে রাঢ়ের উপেক্ষিত হাড়ি, বাগদি, ডোম প্রভৃতি উপজাতি। এই কয়েকটি উপজাতির মোট জনসংখ্যা যা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে আছে, তার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আছে রাঢ়ের তিনটি জেলায়- বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ায়। বাংলাদেশে মোট প্রায় আট ন লক্ষ সাঁওতালের বাস, তার মধ্যে রাঢ়ের এই তিনটি জেলায় ও মেদিনীপুরে বাস করে শতকরা ৭৬। বীরভূম, বাঁকুড়ার যে অঞ্চলে যাওয়া যাক্ সেখানেই দেখা যায় জনসমাজের এই বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এদিককার যে গ্রাম্য সমাজ তার চেহারাই আলাদা। হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের বাস আছে, মুসলমান বা তার পাশাপাশি আছে, আর আছে হাড়ি, বাগদি, বাউরি, ডোম ও সাঁওতালরা। সংখ্যায় তারা অধিকাংশ স্থানেই বেশি” ।[১]

এই জনজাতির বেশির ভাগই মূলত চাষবাস করে, কেউ কেউ জাত কর্ম করে,

আবার অনেকে অন্যের বাড়িতে কাজ করে দিন অতিবাহিত করে। পরিবর্তনের স্রোতের বিপরীতে এই লোকজীবন আজও নিজ সত্তাকে আগলে রাখলেও জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলতে পারে না। তাই তারা আজও প্রন্তিক জনজাতি হয়ে সমাজে পরিগনিত হয়ে রয়ে গেছে।

রাঢ়বঙ্গে অবস্থানরত ‘সাঁওতাল’ জনজাতিগুলির জীবনযাত্রায় আদিমতার ভাব বর্তমান। এরা অরণ্য জনজাতি রূপে আজও সমাজের কাছে পরিচিত। এদের সমাজচিত্রে দেখা গেছে লোকপ্রথা অনুযায়ী বারোটি গোত্রের কথা। প্রতিটি গোত্রে আবার নির্দিষ্ট দেবতা রয়েছে এবং সেই দেবতাদের তারা লোকবিশ্বাসে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সহিত মান্যতা দেন। এই সমস্ত গোত্র দেবতাগুলি তাদের কাছে পশুপাখি, গাছপালা, সবুজ বস্তু হলেও এগুলিকে তাঁরা কখনো হত্যা বা আঘাত করে না। গোত্রগুলি হল-

গোত্র	**দেবতা**	**গোত্র**	**দেবতা**
হাঁসদা	হাঁস	মান্ডি	খড়দা নামক ঘাস
কিস্কু	শঙ্খচিল	চড়ে	গিরগিটি
মূরমূ	নীলগাই	টুডু	অজ্ঞাত
সরেন	হরিণ	বাস্কে	পান্তাভাত
পাউরিয়া	পায়রা	হেমব্রম	সুপারি
বেসরা	বাজপাখি	বেদেয়া	অজ্ঞাত

এদের এই গোত্রগুলি আবার বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে যুক্ত। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোত্র বিন্যাস অনুযায়ী বৃত্তি আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে।

এরা প্রকৃতির পূজারী, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকার প্রবণতা এদের অনেক বেশি। এই প্রকৃতি তাদের প্রেমের পূজারী, শান্তির পূজারী। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পশু শিকার করে এখনো জীবিকা নির্বাহ করে। নিজেদের কঠিন পরিশ্রমের অধিকারী ও সুস্থ-সবল মনের মানুষ মনে করে। এদের পুরুষ, মহিলা সকলেই কর্মঠ। পুরুষেরা চাষাবাদ, মাটিকাটা, গাছকাটা, জঙ্গল থেকে ফল-মূল, শিকার করার কাজ করে, আর মহিলারা পশুপালন, লাউ, কুমড়োর লতা, সবজির চাষ করে। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে লিখেছেন- “পুরুষের কাঁধে ভার, মেয়েদের মাথায় বোঝা, গরু মহিষের পিঠে ছালার বোঝাই জিনিসপত্র; নীরবে তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কয়খানা গরুর গাড়িও আসিতেছে ধীর মন্থর গতিতে সকলের পিছনে। বোঝাগুলোর মধ্যে নিশ্চয় কোথাও মুরগির পাল আছে, আসন্ন নিশাবসানের আভাসে তাহাদের একটা চীৎকার উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা, তাহার পর আরও কয়েকটা।”[২] সাঁওতালরা সাধারণ জীবন যাপন করতে ভালোবাসে। তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে যেমন সারী, বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে তেমন ভানুমতী, চরিত্রটি পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। সাঁওতাল ছেলেদের দেহ যেমন বজ্রের মতো শক্তিশালী, মেয়েদের শরীর তেমনি কষ্টিপাথরে মতো নিখুঁত, নিটোল এবং দৃঢ় তৈলমসৃণ কষ্টির মতো উজ্জ্বল কালো। এদের পোশাক পরিচ্ছদ, বেশভূষা সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন- “পরনে মোটা খাটো কাপড়, মাথায় চুলে তেল দিয়া পরিপাটী করিয়া আঁচড়াইয়া এলোখোঁপা বাঁধিয়াছে,

সিঁথি উহারা কাটে না, কানে খোঁপায় নানা ধরনের পাতা-সমেত সদ্যফোটা বনফুলের স্তবক।"[৩] এই সাঁওতালদের পাশাপাশি মুন্ডা, লোধা, শবর, রাভা, ওঁরাও জনজাতিগুলির মধ্যেও সরল-শান্ত ও স্বার্থহীন জীবন যাপনের ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

পলাশ-মহুয়া বনে ডাঙ্গা ডহর, ডুংরী, উঁচু নীচু পাহাড়, জঙ্গলময় এলাকায় বসবাসকারী আর এক জনজাতি হল 'খেড়িয়া'। ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে বেশি বসবাস। অনেকে এদের খেড়িয়া শবরও বলে থাকে। সাঁওতাল পড়ার পাশাপাশি খেড়িয়া পাড়াগুলি অবস্থিত। খেড়িয়াদের কয়েকটি গোত্র হল - ভুনিয়া, শাল, টেসা, কড়াহা, কাতলা প্রভৃতি। টেসা গোত্রের খেড়িয়ারা পাখী ধরে না। লোকালয়ের আড়ম্বরপূর্ণ আধুনিক সমাজ থেকে প্রভাবমুক্ত, তথা অরণ্যচারী মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিরূপ এই এলাকাগুলি। এদের কাছে বেল, বহরা, হরিতকি, কেন্দুপাতা, শালপাতা, মধু প্রভৃতি হল বনজ সম্পদ। আর গরু, মোষ, ছাগল, মুরগী, শুকর, হাঁস প্রভৃতির পশুপালন করে। এদের পুরুষ ও মহিলারা চাষাবাদ ও শ্রমিকের কাজে করে। নিজেদের এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন জেলা ও ভিনরাজ্যে মাসের পর মাস বাড়ির বাইরে থাকে জীবন জীবিকার সন্ধানে। সভ্য সমাজের কাছে এরা যেন 'ছারপোকার মতো মানুষ', পেটে ভাত নেই, পরনের বস্ত্র নেই, বাসস্থানের জায়গা নেই। শহরিয় পরিবেশ থেকে এরা যেন ছিটকে এসে পড়ে এই সব অরণ্য অঞ্চলে। সারাদিন জোয়ালের গরুর মতো পরিশ্রম করেও সামান্যতম বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হয় না। তার উপরে রয়েছে নানান ধরণের অত্যাচার। তাই হতাশা আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া এদের আর যেন কিছু করার থাকে না। এদের অভাব আছে, দুঃখ আছে, অনটন আছে। আবার সুখ- শান্তি- আনন্দও আছে। দাঁশায়, সহরায়, বাহা প্রভৃতি পরবে মাদলের ধিতাং ধিতাং তালে নাচে গানে আনন্দে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিভোর হয়ে ওঠে। বাঁকুড়া জেলার, রানীবাঁধ থানার, কুল্যাম গ্রামের খেড়িয়াদের সাংস্কৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে অচিন্ত্য জানা তাঁর 'লোকায়ত সংস্কৃতির আলোয়' গ্রন্থে এদের লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে লিখেছেন- "যমরাজা হলেন খেড়িয়াদের বড় দেবতা। বিধাতা হলেন বনঝাড়ঠাকুর। সাপ, বাঘ, ভালুক, ডাইনী, ভূত প্রভৃতি যাতে মানুষের ক্ষতি করতে না পারে, বনে কুলকাঁটা পায়ে না লাগে, তাদের কুঁড়ে ঘর যাতে হাওয়ায় না উড়ায় তার জন্য দেব দেবীর পূজা করা হয়। হাঁস, মুরগী, কুঁকড়ী বলি দেওয়া হয়। এদের কোন পুরোহিত নেই। নিজেরা পূজা করে বলি দেয়, কোন মন্ত্র তন্ত্র নেই। খেড়িয়ারা টুসু পরব পালন করে। কোথাও কালী পূজাও করে। বেঠলায় খেড়িয়ারা ছৌ নাচ করে।"[৪]

এরা ভিন্ন লোকাচারে আবদ্ধ। জন্ম এবং মৃত্যুতে অশৌচ পালন করে। কেউ মৃতদেহ মাটিতে কবর দেয়। আবার কেউ কেউ মৃতদেহ দাহ করে। দেব দেবীর কাছে মৃতের নামে মুরগী, ছাগল বলি দিয়ে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে। অচিন্ত্য জানা তাঁর 'লোকায়ত সংস্কৃতির আলোয়' গ্রন্থে এদের বিবাহ সম্পর্কে লোকাচার ব্যক্ত করেছেন-

" খেড়িয়াদের বিয়েতে মেয়ের বাবা পণের টাকা পায়। সামর্থ অনুসারে টাকার পরিমান ঠিক হয়। বর্তমান টাকার মূল্যে তিন'শ টাকা থেকে ছয় 'শ টাকা, বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ হিসাবে দেয়। এদের সাধভক্ষণ ও অন্নপ্রাশনও আছে। বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে, দেওর থাকলে বিধবাকে দেওরের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। খেড়িয়াদের

বিয়ে ছেলের বাড়িতেই হয়। বিয়েতে শাখা, সিন্দুর লোহার বালা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। বিয়ের সময় বর মাটিতে তিনবার সিন্দুর দিয়ে কন্যার কপালে তিনবার সিন্দুর দেয়। তারপর বর শাঁখা, লোহার বালা কন্যার হাতে পরিয়ে দেয়।"[৫]

প্রান্তিক জন-মানুষ মালো বা জেলেদের নিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে নদী কেন্দ্রিক কালজয়ী উপন্যাস। সুবলা, সুবলার বউ, বাসন্তী, কিশোর, অনন্ত, উদয়নতারা, রামপ্রসাদ, গগন মালো প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যদিয়ে মালোপাড়ার সাধরণ থেকে অতি সাধরণ জীবন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। এদের তিতাস নদীর তীরে বসবাস। তীরের ঘাটে ঘাটে বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তকলি, সূতা কাটার এবং জাল বোনার সরঞ্জাম। শিশির কুমার দাশ তাঁর 'সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-

"কুমিল্লা জেলার তিতাস নামক একটি নদীতীরের ধীবর সমাজের রীতি-নীতি, ধর্ম-সংস্কার-উৎসব ও জীবন যাপনের অনবদ্য কাহিনী। সমাজের ও অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে কীভাবে এই সমাজের বুকে লাগল বিপর্যয়ের ঢেউ, আর প্রাকৃতিক খেয়ালে একদিন তিতাসের ধারা শুকিয়ে এল, সেই সঙ্গে শীর্ণ হয়ে এল ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন। সমাজ ও সংস্কৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনের মহাকাব্যিক বিস্তার এই কাহিনীতে।"[৬]

নদী থেকেই তাদের উপার্জন। নদী বিরূপ হলে তাদের জীবনেও আসে বিপর্যয়। আসলে নদীর জোয়ার-ভাটার মতোই এই অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবনও একইরকম, কখনও তিতাস তাদের উপুড় করে দিয়েছে আবার কখনও নিঃশেষ করে নিয়েছে। তবুও নদীর বহমান কালপ্রবাহে নিজেদের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে তারা বহন করে এসেছে। মালোদের মধ্যে কালীপূজার সমারোহের কথাও উঠে এসেছে। তাদের এই পূজার জন্য একমাস আগে থেকে মূর্তি বানানো হয়। চারদিনব্যাপী যাত্রা ও কবিগানের অনুষ্ঠানে মত্ত থাকে সকলে। তাদের সংস্কৃতির আর একটি রূপ ছড়িয়ে আছে তাদের নিজস্ব লোকক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে। নৌকা তৈরির মধ্যেও তাদের শৈল্পিক সত্তার স্পষ্ট ছবি এবং এক সুন্দর প্রতিযোগিতার বর্ণনা পাওয়া যায় উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে-

"ভাদ্রের পয়লা তারিখে কাদিরের বাড়িতে খুব ধুমধাম পড়িল। সকাল হইতে না হইতেই শত শত জোরদার, চাষী, তরুণ সেদিন তার বড়িতে জমায়েত হইল। তারপর তারা রাঙা বৈধা হাতে করিয়া নৌকায় উঠিয়া গোরায় গোরায় বসিয়া গেল।... নদীর মাঝখান দিয়া দৌড়ের নৌকার প্রতিযোগিতার পথ।... প্রতিযোগিতা শুরু হইবে শেষবেলার দিকে। এখন দৌড়ের নৌকাগুলি ধীরে সুস্থে বৈধা ফেলিয়া নানা সুরের সারিগান গহিয়া গাঙময় এধার ওধার ফিরিতেছে। হাজার হাজার দর্শকের নৌকা হইতে দর্শকেরা সে সব নৌকার কারুকার্য দেখিতেছে, বৈধা মারিয়া কি করিয়া উহারা জলের কুয়াশা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহা দেখিতেছে।"[৭]

জন্ম ও বিবাহের ক্ষেত্রেও মালোদের উৎসব দেখা যায়। পাশাপাশি এদের মৃত্যু-পরবর্তী অনুষ্ঠানও সমাজের সংস্কারের শিকড়ে জড়িয়ে আছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ তিন ব্যাপারেই মালোরা পয়সা খরচ করে। তিতাসের গভীর জলের মতোই তাদের নিজস্ব লোকসংস্কার, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, প্রাত্যহিক জীবনযাপন সবটাই আবর্তিত হয়ে

গড়ে উঠেছে।

সভ্যতার প্রাচীনকাল থেকে 'চর্ম' মানব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই চর্মকে কেন্দ্র করে ডোমজাতির মানুষেরা বিভিন্ন রকম ঢোলক (বাজনা) তৈরি করে, আর মুচিরা জুতো তৈরি করে। তাই চর্মজাত শিল্প মানুষের নানা প্রয়োজন পূরণ করে চলেছেন বহুকাল ধরে। চর্মের পাদুকা, চর্মের বিছানার শয্যা, চর্মের কবজ, চর্মের পেটিকা প্রভৃতি শিল্পদ্রব্যের সন্ধান প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন- "মানব সভ্যতার ইতিহাসে জুতা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কারণ, কোন দেশ কতকাল হইতে জুতার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, তাহাই সভ্যতা-লাভের একটি বিশিষ্ট পরিচয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে।"[৮] এক সময় জুতো ধনী, অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা ব্যবহার করতেন। এখন গ্রামের সাধারণ মানুষও জুতো ব্যবহার করেন। জুতো সাধারনত পল্লীগ্রামের মুচিরা প্রায় তৈরি করে থাকেন। সেই মুচি নামের সমাজ বন্ধু সম্প্রদায় এখন প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কোম্পানিতে বহু জাতির মানুষেরা জুতো কারখানায় কাজ করেন। বাঙালি জীবন সংস্কৃতির একটা অধ্যায়ে এই মুচিদের প্রধান কর্মই ছিল জুতো তৈরি করা। কিন্তু আজ সেই প্রান্তিক সমাজের শত শত বছরের গোষ্ঠী জীবন ভেঙ্গে গেছে। একালে কারখানা, কলঘরে, কোম্পানিতে বহু শ্রমিকের শ্রমে তৈরি হয় জুতো।

মুচিদের পাশাপাশি ডোম জাতিও লোকসমাজে প্রান্তিক জনজাতি রূপে পরিচিত। এদের মূল জীবন বৃত্তির অন্যতম উপাদান বাঁশ। বাঁশের ঘর, বাঁশের বেড়া, বাঁশের মন্ডপ, বাঁশের খুঁটি, বাঁশের লাঠি, বাঁশের কুলা, ঝুড়ি, চালুনি, ডালি, পুতুল, চেয়ার প্রভৃতি বাঁশে শিল্পের মধ্যদিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজন পূরণ করে চলেছে এই ডোম জাতির মানুষেরা। সমাজে সংস্কার-বিশ্বাস, পূজা-পার্বণে বাঁশ নানা প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়। পূজা অনুষ্ঠান এবং গৃহপ্রবেশের সময়ও বাসের পূজা দেওয়া হয়। তাই বাঁশের কাজে ডোম জাতির গুরুত্ব সমাজে কোন অংশে কম নয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' দেখা যায় গুজরাট নগরে ডোমেরা বসতি স্থাপন করেছেন। তারা তৈরি করেছেন চালুনি, ঝাঁটা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"বিঅনি চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা
কির্তি করে হরষিত চিতে।"[৯]

ডোমেরা যেমন চালুনি বোনে, তেমনি কুলো এবং চাঙাড়িও বোনে। শ্রীনিশাপতি মাজি 'গরিবের হাতের কাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন- "বাঁশ শিল্পঃ ডোমদের বাঁশই প্রধান উপজীবিকা। বাঁশের মোড়া, চেয়ার, বাসকেট, জাবরি, ঝুড়ি, কুলা, পেতে, চালুনি, সাজি, টপ্পর, ধানের হামার, মই, ডোল, গাড়ি, খাল্লা, মাচা প্রভৃতি আব্যশক ও কৃষিকার্যের জিনিস তৈরি করে ডোমরা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে।"[১০] বাঁশের কাজের সঙ্গে ডোম জাতির সম্পর্ক আগেও ছিল আজও আছে। আজও পাড়ায় পাড়ায় ডোমেদের এসব শিল্প সৌন্দর্যের কাজ বিক্রি করতে দেখা যায়।

মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যজ মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরলেন তার 'আঁধারমানিক' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসটির কাহিনীর বর্ণনায় জনজীবনের

নানা তথ্য উপস্থাপিত হয়েছেন। অন্ত্যেবাসী সমাজের প্রকৃত রূপ ও সংস্কৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন। সেখানেই বাগদি জাতির প্রসঙ্গ উঠে এসেছেন। দেখা গেছে বাগদি পাড়ার মেয়েরা পুরুষদের ভরসায় বসে খায় না। তারা সকাল হলেই কাজে বেরিয়ে পড়ে। গোবর কুড়োয়, মাছ ধরে, কাঠ কাটে, ঝুড়ি ঝুড়ি শুকনো কাঠ নিয়ে গেরস্ত বাড়িতে যায়, আর সেইসব বিক্রি করে পয়সা জোগাড় করে। এটা তাদের নিত্য দিনের ঘটনা। কিন্তু এর অন্তরালে বাগদি মেয়েদের আর একটি রোজগারের পথ আছে, যা কেবল গেরস্ত বাড়ির বউদের জন্য। গেরস্ত বাড়ির বউ-ঝি-রা বাগদি বৌদের দেখলে আদর করে ঘরে ডেকে নেয়। কারণ ওদের কাঠের ঝুড়ির নীচে কাপড়ের পোটলায় বাঁধা অপার আশ্চর্যের ভাণ্ডার লুকানো থাকে। এটি হল সতীনকে হীনবল করার ঔষধ, স্বামীকে বশীকরণ করবার মন্ত্র, বন্ধ্যার সন্তান ধারণের ঔষধ, এমন কি পলাতক রূপ যৌবনকে অক্ষয় রাখবার মন্ত্রপূত কবচ- “বাগদিদের দেখলে সব বউ ঝি-রা আদর করে ডেকে নেয়। ওদের কাঠের ঝুড়ির নীচে কাপড়ের পোটলায় বাঁধা অপার আশ্চর্যের ভান্ডার। সতীন ও সতীনের ছেলে, এই দুই কাঁটার বিষে অনেকেরই জীবন জর জর। সতীনকে হীনবল করার ওষুধ, স্বামীকে বশীকরণ করার মন্ত্র। বন্ধ্যার সন্তান হবার ওষুধ এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে দামী যে জিনিস সবার আগে দাম হারায় সেই চঞ্চল পলাতক রূপযৌবনকে অক্ষয় রাখবার মন্ত্রপুত কবচ পর্যন্ত।”[১১] মানুষ এখনো বশীকরণ, ঝাড়ফুঁক, তেলপড়া, নুনপড়া, বানমারা, দোষলাগা, নজরলাগা প্রভৃতি সংস্কারে বিশ্বাসী। প্রান্তীয় জনজাতির মানুষের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় চলে আসছে এসব লোকবিশ্বাস। এসব বিশ্বাসের হয়তো কোন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নেই কিন্তু পরিবারের, সন্তানের মঙ্গল কামনায় এ সমস্ত আদিম বিশ্বাস আজও মানুষ মেনে আসছে, হয়তো আগামী দিনেও মেনে চলবে।

অন্যান্য জনজাতি সদৃশ একটি বৃহৎ এবং অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত জনগোষ্ঠী হল ‘লোহারা’। এরা একটি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এক জনগোষ্ঠী। ‘লোহারা’ শব্দটি ‘লোহা’ থেকে উৎপত্তি। আর লোহার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে এদের কর্মকার হিসাবে অনেকে অভিহিত করেন। তবে এরা কর্মকার নয়, সমাজের পিছিয়ে পড়া আদিম জনজাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত। লোহার মতো কালো এবং শক্ত এদের শরীর। শ্রমিকের কাজ এদের প্রধান জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার। এরা সাধারণত সাঁওতাল জনজাতির মত বন জঙ্গলের পাশাপাশি এলাকায় বসবাস করতে ভালোবাসে। বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে, ফল মূল এনে হাটে বাজারে বিক্রি করে এবং বিভিন্ন পেশাতে নিযুক্ত থেকে জীবনধারণ করে। এই জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালক হিসাবে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। আবার অনেকে মাটির কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ করে জীবনধারণ করে। এছাড়া ঝুড়ি তৈরি, লোহার উপর খোদাই করেও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া অন্যান্য উপজাতিদের মতো, এই জনগোষ্ঠী কৃষিকাজও করে থাকে। রাঢ় অঞ্চল ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও এই লোহার জাতির বসবাস লক্ষ্য করা গেছে। অতনু চট্টোপাধ্যায়ের ‘পশ্চিমবঙ্গের জাতি ও জনজাতি’ দ্বিতীয় খণ্ডে এই জনজাতির খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন- “লোহারাদের প্রধান খাদ্য হল ভাত। এছাড়া এই জনগোষ্ঠী গম ও ভুট্টার আটা খেয়ে থাকে। নিরামিষ খাবার বাদ দিয়ে এরা আমিষ খাবারও ভক্ষণ করে। এই জনগোষ্ঠী গোমাংস, শূকরের মাংস

ও অন্যান্য গবাদি পশুর মাংস ভক্ষণ করে। এরা সরষের তেলের সাহায্যে রান্না করে। এছাড়া এরা অন্য তেল যেমন মাছের তেল, ব্যবহার করে থাকে। সামুদ্রিক মাছ খেয়ে থাকে। এছাড়াও ভাত দিয়ে তৈরি হাড়িয়া ও দারু পান করে থাকে।

লোহারা উপজাতি যে ভাষায় কথা বলে, সেটি হল সাদ্রী। এছাড়াও তারা হিন্দি ও বাংলাতেই কথা বলে থাকে। তবে এদের নিজস্ব ভাষার কোনো লিপি পাওয়া যায়নি। লোহারা জনগোষ্ঠী লোকদেবতার পুজো করে থাকে। এই পুজোতে অনেক অনুষ্ঠানও রীতিনীতি পালন করে থাকে। প্রকৃতিই হল এদের দেবতা, আর এই জনগোষ্ঠী সমস্ত সামাজিক রীতি নীতি মেনে চলে। এদের ধর্ম যেহেতু হিন্দু ধর্ম, তাই হিন্দু দেবদেবীর পূজোও করে থাকে। কারিগর হওয়ার দরুন এই জনগোষ্ঠী বিশ্বকর্মা পুজা ও করে থাকে। ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য এরা দেবদেবীর পুজো অত্যন্ত ভক্তি ভরে করে থাকে। এই উপজাতির অনেকে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।[১২]

রাঢ় বাংলার পরিমন্ডলে ‘করঙ্গা’ নামক এক জনগোষ্ঠীর অবস্থানের লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে পাহাড় বা জঙ্গল সংশ্লিষ্ট পরিমন্ডলে এদের বসতি চোখে পড়ারা মতো। রাঢ় বাঁকুড়ার শুশুনিয়া, ওন্দা, ঝিলিমিলি এলাকায় করঙ্গা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সামাজিক ঐতিহ্য এখনও বিদ্যমান। ওন্দা গ্রামে করঙ্গাদের বৃত্তি ছিল কাঠের আসবাব তৈরি করা, কাঠের খেলনা, পুতুল, বাচ্চাদের জন্য গাড়ী ইত্যাদি তৈরী করা। এছাড়াও গ্রামে গ্রামে জ্বর জ্বালা, রোগ অসুখে মন্ত্র প্রয়োগ কর্মেও রত ছিল। এরা বিষধর সাপ ধরে তা নিয়ে সাপখেলা দেখাত। সেই জন্য পারিবারিক দেবী তথা কুলদেবী রূপে মনসার পূজা করে। অবশ্য বর্তমান প্রজন্মের আর কেউ সাপ ধরা বা সাপখেলার পেশাতে নিযুক্ত নেই। ১৮৭২-এর জনগণনার নিরিখে, বাঁকুড়া জেলায় করঙ্গাদের সংখ্যা ছিল ৪১২ জন। তারা সে সময় চাষাবাদে ও দিনমজুর হিসাবে কায়িক শ্রমদান রুজি রোজগার করত বলে জানা যায়। বাঁকুড়ার পাশাপাশি অন্যান্য জেলাগুলিতেও করঙ্গা নামক তফসিলি জনজাতির কমবেশী অবস্থান লক্ষ করা যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে জানা যায়- “মেদিনীপুরের ঐতিহ্যবাহী পরভা নৃত্যের সাজের কাঠের মুখোশ বানাত একসময় করঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকজন। মেদিনীপুর বিভাগের ঝাড়গ্রাম জেলার চিল্কিগড়ের রাজা মানগোবিন্দ ১৮৩১ থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ অবধি সময়কালে, পরভানৃত্যের সঙ্গ সাজের কাঠের মুখোশ করঙ্গাদের দিয়ে বানাতেন।”[১৩] মেদিনীপুর জেলায় করঙ্গা জনজাতির তুলনায় ছুতোরদের সংখ্যা অনেক বেশি। কাজেই করঙ্গা সম্প্রদায়কে কাঠের শিল্প বৃত্তির ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছিল। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে পরভা নৃত্যের অবক্ষয়ের পরে কাঠের কাজ ছেড়ে কৃষিকাজে ও শ্রম জীবিকায় আত্মনিয়োগ করেন। বাঁকুড়া বার্তা পত্রিকায় এই জনজাতি সম্পর্কে শ্যামাশঙ্কর বরাট লিখেছেন- “আফ্রিকার দক্ষিণাংশে স্থিত জিম্বাবুয়ের মাসভিও শহরে কাইল জাতীয় উদ্যান (National Reserve)-র সন্নিকটস্থ অঞ্চলে করঙ্গা জাতি গোষ্ঠী জিম্বাবুয়ের শোনা উপজাতির বৃহত্তম শাখা গঠনকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত। মনে হয় ভারতের বিভিন্ন কাষ্ঠশিল্পী গোষ্ঠির উদ্ভবের মূলে করঙ্গা জিনোমের কিছু না কিছু অবদানও থাকতে পারে। কাজেই করঙ্গা এ দেশের একপ্রকার পুরাতন জনগোষ্ঠী হতে পারে।”[১৪]

এই সমস্ত জনজাতিগুলি ছাড়াও গোয়ালা, ছুতোর, কামার, নাপিত, ধোপা,

তাঁতি, মালাকার প্রভৃতি প্রান্তিক জনজাতিগুলিও সমভাবে স্থান পেয়েছে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে। বিরামহীন সাহিত্য সাধনায় একের পর এক সাহিত্য-চূড়া নির্মাণ হয়েছে এই জনজাতিদের নিয়ে। যেখানে সমাজের সামগ্রিক জীবনচর্চার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সম্মিলন, ভূপ্রকৃতি, সমাজ, সামাজিক অনুশাসন, মানুষের সংঘাত-মিলন, নৈসর্গিক পরিবেশ, জীবিকাগত জীবনযাপনের বিন্যাস, জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধ সবই সাহিত্য সংস্কৃতিতে ভীড় করেছে। তায় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জনজাতি একই সুতোয় গ্রথিত হয়ে লোকজীবন সন্নিবেশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১। ঘোষ বিনয়, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১, পৃঃ ৩৮।
২। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৌষ, ১৪১৫, পৃঃ ২১১।
৩। তদেব, পৃঃ ২০।
৪। জানা অচিন্ত্য, লোকায়ত সংস্কৃতির আলোয়, রাঢ় একাদেমি, অর্ণব প্রেস, বাঁকুড়া, পৃঃ ৩০।
৫। তদেব, পৃঃ ২৯
৬। দাশ শিশির কুমার (সম্পা.), বাংলা সাহিত্য সঙ্গী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ,আগস্ট ২০১০, পৃঃ ৯৩।
৭। মল্লবর্মণ অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, চতুর্থ প্রকাশ ফাল্গুন, ১৪০৭ খ্রি., পৃঃ ২৮৬।
৮। বেদান্ততীর্থ গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্পপরিচয়, ভূমিকা অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সুবর্ণরেখা,কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪২।
৯। চক্রবর্তী মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৮৩।
১০। মাজি শ্রীনিশাপতি, গরিবের হাতের কাজ, প্রবাসী, সম্পা.-কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাদ্র, ১৩৫১, পৃঃ ৩৮৩।
১১। দেবী মহাশ্বেতা: ‘আঁধারমানিক’, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, খন্ড-৫, দে’জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃঃ ৪৮।
১২। চট্টোপাধ্যায়ের অতনু, পশ্চিমবঙ্গের জাতি ও জনজাতি, দ্বিতীয় খণ্ডে, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা- ০৯, পৃঃ ১১৬।
১৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রতিবেদন - বিলুপ্ত পরভা নাচ রাজ দরবার ছেড়ে আম আঙিনায়, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯।
১৪। বাঁকুড়া বার্তা, শারদ সংখ্যা ১৪২৮, সর্বমঙ্গলা প্রেস, যোগেশপল্লী, বাঁকুড়া।

উত্তববঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

কমলেশ রায়
স্টেট অ্যাডেড কলেজ টিচার
ইতিহাস বিভাগ, কুচবিহার কলেজ

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সারাংশের মূল উদ্দেশ্য হল উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার এর একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা।প্রশঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজবংশী সম্প্রদায় উত্তরবঙ্গের আদিনীবাসি বা ভূমি পুত্র।এই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী মানুষের একটা বড় অংশ রাজবংশী সম্প্রদায় ভুক্ত এবং একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই কৃষিজীবি লোকসমাজে প্রচলিত লোকাচার গুলো সুপ্রাচীন কাল থেকেই বংশ পরম্পরায় পালিত হয়ে আসছে। এই লোকাচার গুলো কোন শাস্ত্রীয় মতে পালিত হয়না বলে এগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।তবে প্রকৃতির পূজারী কৃষিজীবী রাজবংশী সম্প্রদায় নানা ধরনের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে মঙ্গল কামনায় এই লোকাচার গুলো শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে।কিন্তু ক্রমবর্ধমান আধুনিকতার ছোঁয়া ও বিশ্বায়নের প্রভাবে চিরাচরিত ঐতিহ্যশালী পারিবারিক লোকাচার গুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও বাস্তববাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই লোকাচার গুলো অপ্রাশঙ্গিক বলে মনে হয়। ফলে উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সংকটের সম্মুখীন হয়। উপরাউক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত পারিবারিক লোকাচার বিষয়ক একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: লোকাচার, ভাদাভাদি, জলছিটা, জিগা গাছ, সইপাতা, সখাপাতা, গুয়া-পান, ভাত ছোঁয়ানি।

মূল প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের বর্তমান আটি জেলা উত্তর বঙ্গ নামে পরিচিত। যদিও বর্তমানে ভারতের মানচিত্রে উত্তর বঙ্গ নামে কোন ভূখন্ডের অস্তিত্ব নেই, তবুও ব্রিটিশ শাসন কাল থেকেই উত্তরবঙ্গ কথাটি লোকমুখে শোনা যায়। সম্ভবত ঊনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভূখন্ডে ইংরেজের বানিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার উত্তরে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমতল এলাকায় একটি অখন্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনাধীন ভৌগোলিক

এলাকার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শুধু সমতল এলাকাতেই নয়, ইংরেজের আত্মপ্রসারশীল উদ্যোগেই সিকিম ও ভুটানের মতো সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও কিছু কিছু অংশ ক্রমে এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসন কতৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে মুলত ব্রিটিশ আমলেই সমতল ও পার্বত্য এলাকা সমন্বিত বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটা ভৌগোলিক প্রাকরূপ প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে।□[১] পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের পর বর্তমান উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানা স্থায়ীরূপ পেয়েছে। বর্তমান উত্তরবঙ্গ বলতে মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং , জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কুচবিহার জেলার সমগ্র ভূখন্ডকে বোঝায়।

বিস্তীর্ণ ভূখন্ডের জনবিন্যাসের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে রাজবংশী সম্প্রদায় সর্ববৃহৎ হিন্দু জনগোষ্ঠী। এছাড়াও উত্তর বঙ্গের পবিত্র ভূমিতে অন্যান্য জাতি ও উপজাতি বসবাস করে।প্রবাহমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক টি জনজাতির নিজস্ব লোকাচার, সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার গুলো কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করেছেন। আধুনিকতার ছোঁয়া ও বিশ্বায়নের প্রভাবে সামাজিক রীতি নীতি গুলিও ক্রমশ পরিবর্তিত রূপ ধারণ করতে চলেছে। ফলে চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সামাজিক আচার আচরণ বর্তমান সমাজে বিলুপ্তির পথে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সসম্প্রদায় এই অঞ্চলের আদি নিবাসী ব ভূমিপুত্র হিসেবে পরিচিত এবং একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রচলিত বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকাংশে এর মিল পাওয়া যায় না। গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক এই বাচক গোষ্ঠী প্রাচীন কাল থেকেই দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে পারিবারিক সুখ সাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গল কামনায় কিছু পারিবারিক লোকাচার পালন করে আসছে,তা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

লোকাচার: লোকসমাজে প্রচলিত আচারগুলির পালন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। (ক) শাস্ত্রীয় আচার এবং (খ) অশাস্ত্রীয় আচার বা লৌকিক আচার।[২] সাধারণত সমাজে প্রচলিত যে সব আচার আচরণ,বিধি বিধান ও রীতি নীতি বংশ পরম্পরায় পালিত হয়ে প্রবাহমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত তাকেই লোকাচার বলে জানা যায়। লোকাচার গুলো শাস্ত্রীয় মত অনুসারে পালন করা হয় না।সম্ভবত সেই কারনে ঋকবেদ থেকে শুরু করে আমাদের প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রগলিতে আচার অনুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৩] শাস্ত্রীয় মতে প্রচলিত ধর্ম বা আচার গুলো সকল মানুষকে একটি নির্দিষ্ঠি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে নিয়ম গুলোকে একসাথে করে সরলীকরণ করে তোলে। 'আর লোকায়ত সমাজের জনগোষ্ঠী নিষ্ঠার সঙ্গে কখনও ব্যক্তিগতভাবে কখনও সমষ্টিগত ভাবে পার্থিব কামনায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেবদেবী,অপদেবতা প্রভৃতি কে তুষ্ঠ করতে কিংবা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে কিংবা কোন অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করতে মে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া পালন করে তা হল লৌকিক আচার।এই ধরনের লৌকিক আচারে প্রকাশ পায় ইহলৌকিক কামনা। শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারীদের ভূমিকা পুরুষদের তুলনায় খুবই কম। কিন্তু লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে মূখ্য ভূমিকা পপাল করে মহিলারাই।[৪] উত্তর বঙ্গের রাজবংশী

সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশাপাশি বিশেষ কিছু লৌকিক আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। এই লৌকিক আচার অনুষ্ঠান রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজাতীর লোকাচার গুলো ক্রিয়া অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত। যথা-(ক)পারিবারিক লোকাচার,(খ)সামাজিক লোকাচার এবং (গ)কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার। বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রচলিত কিছু পারিবারিক লোকাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পারিবারিক লোকাচার: উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি হল পরিবার।পরিবার গুলো সাধারনত একান্নবর্তী ও পুরুষতান্ত্রিক। তবে পরিবারে মাতা বা নারীদের অবস্থান কখনোই খাটোকরে দেখা হয়না। প্রশঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রচলিত লোকাচার গুলো পালনে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভূমিকাই বেশি। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক ধনেশ্বর বর্মন তার উত্তরবঙ্গের জনজীবন লোকাচার গ্রন্থে রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার প্রশঙ্গে বলেছেন “কেবল মাত্র পরিবারের কোনো সদস্যের কিংবা সামগ্রীক ভাবে পরিবারের সকলের অথবা স্ত্রী পুত্র,কন্যাসহ পরিবার পরিজনের সুখসম্বৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় পারিবারিক বৃত্তেই প্রথামত যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়”।[৫] তাহাই হল পারিবারিক লোকাচার। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার গুলিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।যেমন-(ক)জন্মসংক্রান্ত লোকাচার,(খ)প্রাক-বিবাহ সংক্রান্ত লোকাচার,(গ)বিবাহ সংক্রান্ত লোকাচার(ঘ)মৃত্যুসংক্রান্ত লোকাচার ও(ঙ) অন্যান্য লোকাচার।

সখাপাতা: সখাপাতা উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় লোকাচার। এই লোকাচার টি সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে প্রচলিত। অনুমান করা যায় যেরামায়ন মহাভারতে উল্লিখিত রামচন্দ্র-বিভিষন, রামচন্দ্র-সুগ্রীব, কৃষ্ণ-অর্জুনের সখ্যপ্রীতির নির্মল দৃষ্টান্ত কোনো এক সময় উত্তর বঙ্গের কৃষিজীবী সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৬] সমাজ জীবনের প্রাথমিক স্তম্ভ হল পরিবার। মানুষ পারিবারিক জীবনে নিজেকে ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেন। পারিবারিক সুখ দুঃখ ও ভালো মন্দের গন্ডি পেরিয়ে ব্যাক্তি জীবনে এমন একজন বন্ধুর প্রয়োজন হয় যে নিজের পরিবারের কোনো সদস্য না হয়েও সুখ দূঃখ ও ভালো মন্দের সাথি হতে পারে।এমন কি উভয় ‘সখা’ নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যাগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একধরনের মানসিক শান্তি অনুভব করে। এই পারিবারিক সম্পর্কের মেলবন্ধন ঘটে সখাপাতা লোকাচারের মাধ্যমে।

সখা কথার অর্থ হল বন্ধু। এই অর্থে সখা পাতা কথাটি আক্ষরিক অর্থে বন্ধু নির্বাচন করা। তোবুও সাধারণ বন্ধু নির্বাচন ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার সখা পাতার মধ্যে কিছু নীতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, একে অন্যকে জানার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। অনেক সময় এই বন্ধুত্ব বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়।কিন্তু সখাপাতা লোকাচারেদুইজন সমবয়সী মানুষের মধ্যে আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।তাঁদের মধ্যে পারিবারিক সুখ দুঃখের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক

গড়ে উঠলেও বৈবাহিক সম্পর্ক কখনোই গড়ে ওঠে না। কারন উভয় সবার মধ্যে একটি পারিবারিক নীবির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।একজন আরেকজনের বাবা ও মাকে সম্মোধন করে তাও ও মাও তেমনি বন্ধুর বা সখার বড় বোন তারও বড় বোন এবং দিদি বলে সম্বোধন করার রীতি প্রচলিত।[৭]

উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার হিসেবে ‘সখা পাতা’ অনুষ্ঠানটি লোকায়ত হলেও এর মধ্যে কিছুটা নতুনত্বের আভাষ পাওয়া যায়। প্রাথমিক ভাবে দুই কিশোরের পরিবারের অভিভাবক বৃন্দ মিলিত হয়ে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।এবং কোনো এক পূর্ণ তিথিতে কোনো পবিত্র স্থানে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্পর্কটিকে পূর্ণতা দেওয়া হয়। উত্তর বঙ্গে এই সখা পাতা লোকাচার টি এতটাই প্রচলিত ছিল যে, এই লোকাচারটিকে কেন্দ্র করে অনেক সময় মেলার নামকরণ করা হয়েছে ‘সখাপাতা’ মেলা।এই লোকাচার টি পালনের উপকরণ হিসেবে দুই জোড়া সুপারি(কাঁচা গুয়া) ও দুই জোড়া পান।[৮] ব্যাবহার করা হয়। কোন নদীর তীরে এই লোকাচার টি পালনের সময় উভয় কিশোর নদীর জলে খুব দিয়ে হাতের মুঠোয় রাখা পান-সুপারি বিনিময় করেন এবং আজীবন সখ্যতা বজায় রাখার প্রতিজ্ঞা করেন। উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক সম্পর্কের মেলবন্ধনের এক অন্যতম নিদর্শন এই সখাপাতা লোকাচার। আধুনিকতার ছোঁয়া ও বিশ্বায়নের প্রভাব বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষেত্রর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পৌঁছে গিয়েছি মানুষের হৃদয়ে। ফলে উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যান্য চিরাচরিত লোকাচার গুলোর মতো এই সখাপাতা লোকাচার টি কাজ বিলুপ্তির পথে।

ভাদাভাদি: উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য পারিবারিক লোকাচার হল ভাদাভাদি বা সইপাতা । ভাদাভাদি অপেক্ষা সইপাতা শব্দটি বেশী প্রচলিত। কারন একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এটি ভিন্ন নামে পালন করা হয়। কোচবিহার সহ জলপাইগুড়ির কিছু অংশে বাদাবাদি এবং অবশিষ্ট জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স এলাকা, দার্জিলিং জেলার নির্মম অংশ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় লোকাচার টি ’সইপাতা’ নামেই অধিকতর পরিচিত।[৯] প্রচলিত এই লোকাচার টি সম্পুর্ন ভাবে একটি রাজবংশী মেয়েলি লোকাচার। এই অনুষ্ঠানে দেখা যায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের থানচিরি গৃহদেবতার বেদীর সামনে একটু যায়গা জলে ভিজিয়ে দিয়ে বারো রকমের শষ্য বীজ বপন করা হয়।বীজ বপনের সময় ও তাথেকে চারাগাছ বেরোনোর এক মাসের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে দুই কিশোরীর অভিভাবক পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। ভাদাভাদি লোকাচারটি পালনের জন্য ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়। মে দুইজন বালিকার মধ্যে ভাদাভাদি বা সই পাতানো হবে তাদের যে কোন একজনের বাড়িতে এই অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসেবে দুই, মিষ্টি,করা, নতুন বস্ত্র,কাগজ অথবা টিনের তৈরি নৌকা, বাঁশের তৈরি তীরধনুক ইত্যাদী সংগ্রহ করা হয়। ড: গিড়িজা শংকর রায় তার ‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও পূজা পার্বণ’ শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন “পূজার সময় কিশোরীদের মুখে মে ছড়ার বা কথাস উল্লেখ করা হয় তাহল স্বয়ামীর মনত যদি খটা দিস, তে এই তীর দিয়া তো্র হাতোত হানিম” ।[১০] এই লোকাচারটি পালনের জন্য নির্দিষ্ট

দিনে উভয় কিশোরী কোন নদী কিংবা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে উভয়ে উভয়ের হাতের পানসুপারি আদান-প্রদান করে এবং নতুন শাড়ি পরে তুলসী তলায় ধর্মদেবতা ও অন্যান্য লোক দেবতাদের সাক্ষী রেখে উভয়ে বন্ধুত্ব কে আটুট রাখার সংসদ গ্রহন করেন। সপথের সময় তারা উচ্চারণ করেন "ধর্মঠাকুর আর এইঠেকার সগাকে সাক্ষী মানিয়া বামেরা সি পতাছি। হামার এই দুই ঝনকার মিল কুনো দিন ভাঙ্গিবার না হয়।সইত্য সইত্য সইত্য।"[১১] তুলসী চলার এই সংসদ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই লোকাচার টির দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে কাগজ বা টিনের নৌকা ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি।এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে বাড়ির উঠোনে তৈরি গঙ্গানদীর দুই তীরে সমবেত হন। ছোট নালার মতো হলেও জল ও ছোট ছোট কচুরিপানা দিয়ে তাতে নৌকা ভাসানো হয়।গঙ্গারূপী নদীর উভয় দিকে বাঁশের তৈরি তীরধনুক নিয়ে দারিয়ে উভয় কিশোরী উভয়ের স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো এবং কুনজরে না দেখার সংসদ গ্রহন করেন।এক কিশোরী আর এক কিশোরীর উদ্দেশ্যে বলে "আজিহাতে হামেরা সই হইলং। দোনঝনে সুখ ও দুঃখের ভাগিদার। বিয়ার পাছোত ভূলি না যাইস।"[১২] এই লোকাচাটির তৃতীয় পর্যায়ে বাদ্যগীত সহ নিকটবর্তী কোন নদীর তীরে সইপাতার অবশিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এখানে উভয় কিশোরীর হাতে এক জোড়া করে পান সুপারি দিয়ে নদীর জলে নামিয়ে দিয়ে এক জন মহিলা হাঁটু সমান জলে নেমে চালুনবাতি দেখিয়ে কিশোরীদের গায়ে জল ছিটিয়ে দেন এবং উপস্থিত সকল মহিলা উলুধ্বনি দিয়ে কিশোরীদের মঙ্গল কামন করেন। এর পর উভয় কিশোরী নদীর জলে ডুব দিয়ে উভয়ে উভয়ের পানসুপারি আদান-প্রদান করে এবং উচ্চারণ করে "তোর গুয়া-পান মোক দে, মোর গুয়া-পান তুই নেই।"[১৩] এইভাবে বাদাবাদি বা পাতা লোকাচার টি সম্পন্ন করা হয় এবং উভয় পরিবারের মধ্যে একটি নিবীর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভাদ্র সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের মেলা ভাদাভাদি মেলা নামে পরিচিত হয়। কিন্তু কালের প্রবাহে উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই লোকাচার টি আজ প্রায় বিলুপ্ত।ফলে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই বাচক গোষ্ঠী আত্মপরিচয়ের সংকটের সৃষ্টি হয়।

জিগা গাছের সাথে সই পাতা: উত্তর বঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ঘন নীবির অরণ্য। স্বভাবতই এই অঞ্চলের মানুষের কাছে অরণ্য যেমন কিছু সংখ্যক মানুষের জীবন জীবিকার উৎস তেমনি গাছ তাদের কাছে পরম বন্ধু। এই গাছ কে কেন্দ্র করে প্রচলিত একটি লোকাচার হল জিগা গাছের সাথে সইপাতা। উত্তর বঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশে এই বৃক্ষজাতীয় গাছটির নাম জিগা, অনেকেই আবার এই গাছ টিকে জিওল বা জিবন্ত গাছও বলে।গাছটির সহজে মৃত্যু হয় না বলে উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহিত মহিলাদের সঙ্গে সই পাতানোর রীতি পরিলক্ষিত হয়।"উত্তর বঙ্গের বাচক গোষ্ঠীর কৃষি সমাজে মহিলা মহলের নিকট এই জিগা গাছ অত্যন্ত প্রিয়। যেন কোনো রমণীর নাড়ীর সাথে একসূত্রে গাঁথা" ।[১৪] রাজবংশী সম্প্রদায়ের

বিবাহিত মহিলা তাদের সন্তান জন্মের পরেই মারা যায় অথবা পর পর সন্তানের জন্ম দিলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে মারা যায় তাঁরা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন যে জিগা গাছের সাথে সই বা সখি পাতানো হলে সই জিগাই তাদের সন্তান কে রক্ষা করবে।একথা ঠিক যে জিগা গাছের প্রান আছে কিন্তু ভাব প্রকাশের বা চলার ক্ষমতা নেই।কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলাদের এই গাছটির প্রতি রয়েছে অগাধ বিশ্বাস।এই বিশ্বাস কে অবলম্বন করেই জিগা গাছের সাথে সই পাতানোর লোকাচার টি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী জিগা গাছের সাথে সই পাতালে ঐ মহিলার আর কোনো সন্তান জন্মাবার পর মারা যাবে না।[১৫]

এই লোকাচারটি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য প্রায় সমস্তটাই সংশ্লিষ্ট মহিলাকেই করতে হয়।তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা একাজে সংশ্লিষ্ট মহিলাকে সহযোগিতা করেন।সখাপাতা লোকাচারের মতোই এটিও একটি নির্দিষ্ট শুভ দিনে আয়োজন করা হয়ে থাকে। সই এর জন্যে বাড়ীর কাছেই কোন একটি নির্দিষ্ট জিগা গাছ নির্বাচন করে তার চারপাশের আগাছা পরিষ্কার করা হয়। গাছের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত জল ঢেলে ধূলাবালি পরিস্কার করার রীতি প্রচলিত। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে যেকোনও একজনকে জিগা গাছের হয়ে অভিভাবকত্ব করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।নারীরূপী জিগা গাছ টিকে নতুন শাড়ী পরিয়ে সংশ্লিষ্ট মহিলার সমান উচ্চতায় সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয় এবং উভয় দিকের ডালে শাঁখা পরিয়ে এক রূপবতী নারীতে পরিনত করা হয়।এর সংশ্লিষষ্ট মহিলা নিষ্ঠার সাথে ভক্তিভরে সই জিগার কাছে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি মনে মনে বলেন “সই জিগা,তুই তো মোর সই।মোর চাওয়া জমজমের পর মরি রায়। সই তুই আশির্বাদ কর ছাওয়া যেন যুগ যুগ বাঁচি থাকে।[১৬] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস ও লোকাচার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেমানান ও কুসংস্কার বলে মনে হলেও যুগ যুগ ধরে এই প্রথা লোকজীবনে পালিত হয়ে আসছে। আসলে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীরই সমাজ জীবনে চলার পথে কিছু নিজস্বতা আছে,উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ও তার ব্যাতিক্রম নয়।একুশ শতকের চলমান সমাজ ব্যবস্থায় এই লোকাচার টি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।তবুও গ্রামীন কৃষিজীবি রাজবংশী লোকসমাজে মর্যাদার পালিত হতে দেখা যায়,একেবারে মুছে যায়নি।

বট পাকিরির বিয়াও : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই অঞ্চলের আদিনিবাসী।আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যেঅরণ্য সংকুল হওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের কাছে অরণ্য কখনো মানুষ হিসেবে সখ্যতা পেয়েছেআবার কখনো দেবতার আসনে বসে হয়ে উঠেছে উপাস্য দেবতা। প্রকৃতির পূজারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের ওপর একটি পারিবারিক লোকাচার হল বট পাকিরির বিয়াও। পারিবারিক ও সমাজ জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ হল বিবাহ প্রথা।প্রত্যেকটি মানুষের বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সন্তানের জন্ম দিয় বংশ বিস্তার করা। কিন্তু বিবাহিত জীবনে হাজার চেষ্টা করেও অনেক দম্পতিরই এই সন্তান সুখের সন্ধান মেলে না। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে তারা এই পার্থিব সুখ থেকে বঞ্চিত তারা বট ও পাকুর বা পাকিরি গাছ কে সন্তান স্নেহে লালন পালন করে বিবাহ দেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা পরজন্মে

বিশ্বাস করেন ।আর এই বিশ্বাস কে অবলম্বন করেই বট 'পাকিরির বিয়াও' লোকাচার টি পালনের রীতি প্রচলিত। সুধু উত্তর বঙ্গেই নয় এই লোকাচার টি ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও কমবেশি প্রচলিত। উত্তরবঙ্গের এই লোকাচার টি সাধারনত দুই ভাবে পালিত হতে দেখা যায়,যথা-মানুষের সঙ্গে গাছের এবং গাছের সঙ্গে গাছের। "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে গাছের সঙ্গে গাছের বিবাহ রীতি টি প্রচলিত।এই ধরনের চিরাচরিত সংস্কার ও বিশ্বাস বলেই কোন নিঃসন্তান দম্পতি বয়স্কা বিধবা মহিলা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তার ধারে বট ওপাকুর গাছের চারা রোপণ করে কয়েক হাত দূরে রোপণ করে কদম গাছ"।[১৭] সাধারণ নরনারীর বিবাহের মতই সমস্ত অনুষ্ঠানটি সম্পাদন করা হয়। ব্রাহ্মন,অধিকারী ও প্রচলিত বাদ্যগীযত সহযোগে আত্মীয়স্বজন নিয়ে এই'বট পাকিরির বিয়াও' লোকাচার উপালয করা হয়। এখানে বট গাছ কে পুরুষ কল্পনা করে ধুতি পরিয়ে বর বেশে এবং পাকুর গাছকে মহিলা কল্পনা করে কনে বেশে সাজানো হয়।ঠাকুর গাছটির গায়ে মানুষের সমান উচ্চতায় সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয় এবং শাখায় দুই টা শাঁখা পরানো হয়। কিছুটা দূরে রোপন করা কদম গাছ টিকে শাক্ষি মেনে অনুরূপ ভাবে সাজানো হয়। আধুনিক শিক্ষর প্রসার ও যুক্তিবাদী লোক সমাজের নিকট এই প্রাচীন লোকাচার টি পালনের কোন সারবত্তা নেই বলে বট পাকিরার বিয়াও আজ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না।[১৮] উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার টিকে বৃক্ষপোষনাই বলা যেতে পারে। উন্নত নগর জীবন ও অহরহ বৃক্ষনিধনের হাত থেকে পরিবেশ কে রক্ষার জন্য এই লোকাচারটি আবারও নতুন করে শুরু করার তাগিদ অনুভব করা যায়।

মিতর ধরা বা মিস্তোর ধরা: উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ে বিবাহ একটি অত্যন্ত পবিত্র বন্ধন। এই বন্ধনের মাধ্যমে নরনারী বাস্তবিক সমাজ জীবনে প্রবেশ করে।বিবাহের সময় পালনকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার হল মিতর বা মিস্তোর ধরা।বিবাহ কেন্দ্রিক এই লোকাচার টি প্রাচীন কাল থেকেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত।[১৯] এই লোকাচার টি সংশ্লিষ্ট উভয় পরিবারকে একটি পবিত্র আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে।প্রথা অনুযায়ী মিতর ধরা প্রথা টি বর পক্ষকেই পালন করতে হয়। পাশ্ববর্তী গ্রামের পূর্ব পরিচিত কোন সমবয়সী ছেলেকে মিত্র বা মিস্তোর হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের শুভ দিনে প্রায় বরের মতো বেশেই মিতর বিবাহ বাসরে উপস্থিত থেকে যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেন।"এইঅনুষ্ঠানে মোঃ মিত্র বলে ব্রাহ্মন কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্র অনুসরণ করে জলপূর্ণ কলসি থেকে আম পল্লব দ্বারা নবমিত্র বরং কনের উদ্দেশ্যে জল ছিটিয়ে দেয় এবং নবদম্পতিকে স্বর্নালঙ্কার সহ অন্যান্য সামগ্রী দান করে"।[২০] এইভাবে আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উভয় পরিবারের মধ্যে একটি নিবীর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উভয়ে উভয়ের সুখ দূঃখের ভাগিদারে পরিনত হয়। উভয় মিতর উভয়ের ভাইবোনদের নিজের ভাইবোনদের মতো স্নেহ করে এবং বাবা-মা কে 'তাঐ ও মাঐ' বলে সম্বোধন করেন।

জলছিটা: উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের আরও একটি বিবাহ কেন্দ্রিক পারিবারিক লোকাচার হল জলছিটা বা পানি ছিটা প্রথা। এই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে জলছিটা লোকাচারটি সামাজিক বিধিবদ্ধ অনুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে।

বিবাহ অনুষ্ঠানে জলছিটার জন্য প্রতিবেশী কোন বয়স্ক পুরুষ কিংবা মহিলা কে নির্বাচন করা হয়।অবশ্য তাকে অবশ্যই সম্পর্কে কাকা,জ্যাঠা কিংবা জ্যাঠিমা পর্যায়ের হওয়া চাই। কেননা বরং কনের মাথায় জল ছিটালে তাদের সাথে বরং কনের সম্পর্ক হবে ‘জলছিটা বাপ বা জলছিটা মা।’[২১]

এই লোকাচার টি পালনের জন্য বিশেষ কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয় না। বিবাহ বাপরে অন্যান্য যাবতীয় প্রথা পালনের পর ও আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা যৌতুক প্রদানের আগে পূর্ব নির্ধারিত পুরুষ কিংবা মহিলা আমের পল্লব দিয়ে বিবাহ বাসরের ঘটের জল বরং কনের মাথায় ছিটিয়ে দেয়।এই আচার পালনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বরং কনের জলছিটা ব্যক্তির জলছিটা ‘ব্যাটা ও বেটি’তে পরিনত হয়।পরলৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী জলছিটানো বাবা কিংবা মা পরলোক গমন করলে জলছিটা ব্যাটা বা ছেলে ও বেটি বা মেয়ে কে তিনদিন অশৌচ পালন করে মৃতব্যাক্তির আত্মার শান্তি কামনায় শ্রাদ্ধ করতে হয়।

ভাত ছোঁয়ানি: রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে একটি প্রচলিত লোকাচার হল ভাতছোয়ানি বা খিরছোয়ানি প্রথা। সন্তান জন্মের পর এটি তার প্রথম ভাত মুখে তোলার অনুষ্ঠান। সাধারনত জন্মের ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে এই লোকাচার টি পালন করা হয়। অধ্যাপক মাধব চন্দ্র অধিকারী ও অন্যান্য তাদের Socio-cultural Issues of the Rajbanshis of North Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন “It is the first feeding ceremony of the child of Rajbanshi society.”[২২] শিশুর দাঁত গজানোর আগেই এই লোকাচার টি পালন করাহয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী একজন অধিকারী বা ব্রাহ্মনের উপস্থিতিতে মামা শিশুটির মুখে ভাত ছুঁয়ে দেয় এবং নবজাতক শিশু টিকে স্বর্ণালঙ্কার উপহার দিয়ে আশির্বাদ করেন। লোকাচার টি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে নানান রকমের পূজার সামগ্রীর পাশাপাশি মাটি, বই খাতা, কলম, ধানের শীষ, গবর,এবং স্বনর্ণালঙ্কার সহযোগে একটি আরতির থালা দেওয়া হয়। শিশুর মুখে ভাত তুলে দেওয়ার আগে বাবা মা উপাস্য দেবতা ও গ্রামীন লোকদেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা পাঠ করেন। উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে এই লোকাচার টি আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে কিছুটা বিবর্তীত রূপ ধারণ করেছে। উত্তরবঙ্গের শুধু রাজবংশী সম্প্রদায়ই নয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনও এই লোকাচার টি পালনের রীতি প্রচলিত।

উপসংহার: প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীরই সামাজিক জীবনে কিছু নীতিগত ও আচরনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়েরও সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে চলার পথে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তা তাদের একান্তই নিজস্ব। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির চরাই উতরাই চলার পথে নানাভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।এই সব বিপদ থেকে মুক্তিপেতে মানুষ আশ্রয় নেয় কখনো প্রকৃতির,কখনো দেবতার,কখনো অলৌকিক সাধনার আবার কখনো লৌকিক বিশ্বাসের। এই লৌকিক বিশ্বাসের পূর্ণতা পায় লোকাচারের মধ্য দিয়ে। তাই লোকবিশ্বাস ও লোকাচার উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রত্যাহিক জীবনের অংশ বলেই বিবেচিত হয়। কালের নিয়মে মানুষ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সভ্য হয়েছে, বদলেছে মানুষের

জীবনশৈলী।আধুনিকতার ছোঁয়া ওবিশ্বায়নের প্রভাবে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সামাজিক বিবর্তন। ফলে অনন্তকাল ধরে বয়ে আসা চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সামাজিক আচার আচরণ গুলিও ক্রমশ পরিবর্তনশীল এবং গ্রামীন লোকজীবনের লোকাচার গুলি ক্রমশ ক্ষিয়মান ও প্রায় বিলুপ্ত। অথচ এই লোকাচার গুলোর মধ্যেই বেঁচে থাকে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা।সুতরাং এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা ও পরিচায়কে বাঁচিয়ে রাখতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার গুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা নাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পারিবারিক লোকাচার বিষয়টি সুধুই ইতিহাসের পাতায় চাপা পরবে।তাই এই পারিবারিক লোকাচার গুলোর প্রচার,প্রসার ও পারিবারিক জীবনে প্রয়োগ করা আবশ্যক বলে মনে হয়।

তথ্য সূত্র:

১. দাস,নির্মল,উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রশঙ্গ, পৃষ্ঠা ১।
২.বর্মন,ধনেশ্বর,উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার,কলকাতা, ২০০৭,পৃষ্ঠা-৭২।
৩.তদেব,পৃষ্ঠা-৭১
৪.বসাক, ড. শিলা,বাংলার ব্রত পার্বন, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৮।
৫.বর্মন,ধনেশ্বর,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৭৩।
৬.তদেব, পৃষ্ঠা-৮০।
৭.তদেব, পৃষ্ঠা-৮১।
৮.তদেব, পৃষ্ঠা-৮১।
৯.তদেব, পৃষ্ঠা-৮২।
১০.রায়, ড.গিরিজা শংকর,উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ,১৯৭০,পৃষ্ঠা-১২৮।
১১.রায়,ড.গিরিজা শংকর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রীয় জাতির পূজাপার্বণ, শিলিগুড়ি,১৯৯৯,পৃষ্ঠা-৩-৪।
১২.বর্মন,ধনেশ্বর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫।
১৩.তদেব, পৃষ্ঠা-৮৬।
১৪.তদেব, পৃষ্ঠা-৮৭।
১৫.তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮।
১৬.রায়, ড. গিরিজা শংকর,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১৯৯।
১৭.বর্মন,ধনেশ্বর,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৯৪।
১৮.তদেব,পৃষ্ঠা-৯৫।
১৯.অধিকারী,মাধব চন্দ্র ও অন্যান্য, Socio-cultural Issues of the Rajbanshis of North Bengal, Delhi ,2021,p-72.
২০.বর্মন,ধনেশ্বর,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৯৭।
২১.তদেব,পৃষ্ঠা-৯৮।
২২.অধিকারী, মাধব চন্দ্র ও অঅন্যান্য প্রগুক্ত,পৃষ্ঠা-৭৭।

দামোদর সেচখাল প্রকল্প : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

শ্রীমন্ত দাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডি.এন.সি কলেজ,
অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
এবং গবেষণারত, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ:
ভারত একটি নদীমাতৃক দেশ।প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল যাই বলি না কেন ,সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে নদী-নালার অবদান অপরিসীম।দেশের প্রতিটি প্রান্তে একই চিত্র দেখা যায়।পূর্ব ভারতে বাংলার বর্ধমান জেলায় এরকমই এক উদাহরণ হল দামোদর সেচখাল প্রকল্প।বিংশ শতকের প্রথমদিকে বর্ধমান জেলার সদর মহকুমায় কৃষিকাজের সুবিধার জন্য জলসেচের চাহিদার কথা মাথায় রেখে দামোদর নদ থেকে একটি বৃহৎ সেচখাল নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়।অ্যাডামস উইলিয়াম্ -এর পরিকল্পনায় সেচ কাজ ১৯২৬-২৭ সালে শুরু হয়ে ১৯৩৩ সালে শেষ হয়।বাংলার গভর্ণর জন অ্যান্ডারসন আনুষ্ঠানিকভাবে খালটির উদ্বোধন করেন।দৈর্ঘ্যের(প্রায় ৩০ মাইল)দিক থেকে এটি ছিল একটি বিখ্যাত দামোদর খাল।খালটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফলন বৃদ্ধিই সমাজ জীবনে তার অবদানের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

সূচকশব্দ: নদীমাতৃক দেশ, দামোদর সেচখাল,বর্ধমান,জলসেচ,অ্যাডামস উইলিয়াম্, জন অ্যান্ডারসন,ফলন বৃদ্ধি।

মূল প্রবন্ধ

ঊনবিংশ শতকে বর্ধমানে দামোদরের বাম তীরে বাঁধ দেওয়া এবং রেলপথ ও জি.টি. রোড নির্মাণ করতে গিয়ে যত্রতত্র বাঁধ ও পাড় নির্মাণ করা হয় । ফলত, স্বাভাবিক জলপ্রবাহের পথ রুদ্ধ হয়ে জেলায় জলনিকাশি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে ।[১] বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের এই পদ্ধতি বর্ধমানের কৃষিকাজেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, জলের অভাবে কৃষিজমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছিল প্রায় ৫০ শতাংশ ।[২] এই পটভূমিতে জেলায় একটি খালের ভীষণ প্রয়োজন ছিল । সেই অনুযায়ী ১৮৭৩-১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে প্রায় ২১০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে জেলার প্রথম সেচখাল খনন করা হয় । অশলি ইডেন সাহেব ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এই খালের উদ্বোধন করেছিল বলে খালটি ইডেন খাল নামে পরিচিতি পায় ।[৩] যাই হোক, বর্ধমানের কৃষকরা উদ্বোধনের পরপরই এই খালের জলের জোর তদারকি করেছিল এবং সরকার সেই দাবী মেনে নেওয়ার পরই জেলায় প্রথম খালের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা শুরু হয় । যদিও এই খাল খননের পরে

প্রায় এক বা দুই বছর অব্দি কোনো জলসেচ করা হয়নি [৪] এবং খালের দ্বারা সেচসেবিত অঞ্চল খুব বেশি ছিল না। কর দেবার চুক্তিপত্রে সই করে জল নিতে হত।[৫]

পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কৃষিকাজের জন্য জলসেচের চাহিদার কথা মাথায় রেখে দামোদর থেকে বৃহৎ সেচখালের পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। পাশাপাশি সেচ কমিশনের রিপোর্ট (১৯০১-১৯০৩) এই ধারণাটিকে আরো জোরদার করে তোলে। ফলস্বরূপ, ১৯০৬-০৭ সালে পানাগড়ের কাছে নদীর তীর থেকে কাঞ্চননগরের বাঁকা পর্যন্ত প্রায় ২৯.৫ মাইল দীর্ঘ একটি সেচখালের প্রকল্প (দামোদর ক্যানেল প্রজেক্ট) ভারত সরকারের কাছে জমা পরে।[৬] যাইহোক এভাবে প্রকল্পটি ১৯২০ সালে সংশোধিত হয়ে রাজ্য সেক্রেটারি দ্বারা অনুমোদন পেয়ে যায়।[৭] অ্যাডম্‌স উইলিয়াম্‌ এই সেচখাল খননের পরিকল্পক ছিলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনা রচনায় প্রথমেই দেখান যে, সেচের জন্য যে পরিমাণ জল নেওয়া হবে তাঁর পরিকল্পনায় তা সহজেই নিষ্কাশিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেচ অন্তে যে সামান্য জল থাকবে তা শেষে বাঁকা ও খড়ি নদী দিয়ে খুব সহজেই প্রবাহিত হয়ে যাবে। ফলে বন্যার কোনো সংকট সৃষ্টি হবে না।[৮] অতঃপর খালটির নির্মাণ কাজ ১৯২৬-২৭ সালে শুরু হয় এবং ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পানাগড় স্টেশন থেকে দক্ষিণে প্রায় ৬ মাইল দূরে রন্ডিয়ায় (রনডিহা) বাংলার গভর্ণর জন অ্যান্ডারসন আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন করেন, সেখানে দামোদর নদ তীরবর্তী 'অ্যান্ডারসন উইয়ার' নামে পরিচিত একটি উইয়ার ছিল এবং একটি অফটেক স্লুইসের ব্যবস্থা ছিল, যেটি নদীর পলি পাস করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।[৯] এটি ছিল একটি বিখ্যাত দামোদর খাল, যার মোট দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩০ মাইল। বর্ধমান জেলার সদর মহকুমায় সম্পূর্ণ জলসেচ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে দামোদর ও খড়ি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই খালকে নির্মাণ করা হয়। ইডেন খালটি এর সাথে যুক্ত ছিল।[১০] কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্ধমান জেলার জলসেচ ব্যবস্থা সাধারণত যথাযথ ও কার্যকর ছিল না এবং এটি কৃষির সমৃদ্ধিকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।[১১]

বাংলায় তখন বৃহত্তম সেচ প্রকল্প ছিল এই দামোদর খাল, যা বর্ধমান জেলার এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে সেচের কাজে জল সরবরাহ করবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে ৬২ হাজার একর জমি এই খালের সেচের আওতায় আসবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, যা ১৯৩৬ সালে সর্বোচ্চ ১,৮০,০০০ একর জমিতে বৃদ্ধি পাবে। এরপরে প্রায় ১,৪৩,০০০ একর জমির জন্য খালটি যথাযথ হবে এবং বাকি অংশ ইডেন খালের অধীনে ধরা হয়েছিল।[১২] ১৯৩৫ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় দেখানো হয়েছে দামোদর খাল ও ইডেন খালের সেচসেবিত জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৩২,১৪১ একর এবং ১৫,২৯৫ একর।[১৩] ১৯৩২ সালে বৃষ্টিপাতের অভাবে ভয়াবহ খরার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দামোদর খালটি আংশিকভাবে খোলা হয়েছিল। ফলস্বরূপ মূল খাল বরাবর এবং জল সরবরাহকারী শাখা খাল মিলিয়ে ২৫,৫০০ একর জমির ফসল রক্ষা পায়।[১৪] পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে খাল দ্বারা সেচসেবিত অঞ্চলটি আরো প্রসারিত হয়।[১৫]

দামোদর খালের মাধ্যমে জেলার ৩৯৪টি গ্রামে জলসেচের ক্ষমতা ছিল।[১৬] যদিও জেলার একটি বড় অংশ, বিশেষত দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে এই খালের মাধ্যমে সেচ

ব্যবস্থা সেভাবে পৌঁছায়নি । পাশাপাশি সারা বছর ধরে জল সরবরাহ করতেও পারতো না।[১৭] যদিও ইডেন খালকে রক্ষা করা এবং একটি বৃহৎ অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা করা এর উদ্দেশ্য ছিল।[১৮] তবে দামোদর খাল জেলার কেন্দ্রীয় অংশের অর্থাৎ গলসি, বর্ধমান ও ভাতার থানার অধীনস্ত অঞ্চল এবং কাঁকসা ও আউশগ্রাম থানার কিছু অংশের কৃষিজমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে পেরেছে । ১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে শস্যের অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে সুহারি, বলগোনা, ঝিঙ্গুটি ও চান্না মৌজা এবং বর্ধমান থানার দিগনগর ও আউশগ্রাম অঞ্চলে দামোদর খাল থেকে সময়মতো জলসেচের কারণে ধানের ফলন সেচবিহীন মৌজার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৯]

১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে বর্ধমান জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপর্যাপ্ত ছিল। পাশাপাশি বৃষ্টিপাতের অসমবন্টনও লক্ষ্য করা যায় । তাই সেচ মরসুমের সময়কালে জেলার প্রতিটি অঞ্চলে খালের জলের প্রচুর চাহিদা ছিল ।[২০] পূর্বে জলসেচ হয়নি এমন একটি বৃহৎ অঞ্চলে জল সরবরাহ করে দামোদর খাল সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল । তবে এটি জেলায় সেচের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যাশিত পরিষেবা দিতে পারেনি । এই খাল রবি ফসলের ক্ষেত্রে ব্যবহারিকভাবে কোনও সহায়তা দিতে পারেনা । এটি কেবল বৃষ্টির সময়ই জল সরবরাহ করে এবং বছরের বাকি সময়ে শুকনো অবস্থায় থাকে ।[২১] সর্বোপরি, দামোদর খাল দামোদরের বন্যার প্রবণতাকে সংযত করে রেলপথ, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং বর্ধমান শহরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল । যদিও এর উদ্দেশ্য ছিল জলসেচের পরিষেবা ছাড়াও এগুলিকে রক্ষা করা।[২২]

দামোদর খাল কার্যত ১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সেচের জন্য জল দেওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে । সেই অনুযায়ী ২৯৭টি গ্রামের ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৬৪ একর জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয় । ইরিগেশন আইন অনুযায়ী যারা এই সেচের জল নিতে চায়, তাদের লিজে সই করতে হতো। লিজ দু'ধরণের ছিল - স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী । স্বল্পমেয়াদীর কর অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, দীর্ঘমেয়াদীর কর অপেক্ষাকৃত কম ছিল ।[২৩] তাছাড়া, এই খাল কাটার জন্য অনেক কৃষকের জমি নষ্ট হয়, অর্থাৎ কৃষকের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়েছিল,[২৪] কারণ বাংলার সরকার ১৯৩৫ সালে সেচের জন্য খালের জলের ওপর বছরে একর প্রতি পাঁচ টাকা আট আনা(৫-৮-০) হারে শুল্ক আরোপ করেছিল। ফলস্বরূপ দামোদর খালের জলসেচকে কেন্দ্র করে জেলায় অশান্তির সৃষ্টি হয়। দামোদর খাল এলাকার কৃষকরা ক্যানেল কর কমানোর জন্য সরাসরি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদের ফলেই জেলায় 'দামোদর ক্যানেল কর আন্দোলন' (১৯৩৬-৩৯ খ্রিঃ) নামে একটি জনপ্রিয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যেটি ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে স্থান পায়।[২৫] অত্যাধিক হারে ক্যানেল কর আরোপ এবং তা আদায় করার জন্য অমানবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে বলে ক্যানেল কর আন্দোলনের নেতারা অভিযোগ করে । যুক্তি দেখানো হয়, চাষের খরচ ও খাজনা দিয়ে এমন কিছু থাকে না যাতে কৃষক এই হারে ক্যানেল কর দিতে পারে । জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কৃষকদের ১/4 অংশ কর দিয়ে একটা 'ইনকোয়ারি কমিটি' গঠন করে সব বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য কৃষকদের আবেদন করতে বলেন।[২৬] অতঃপর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জুন কংগ্রেস একটি 'দামোদর ক্যানেল লেভি ইনকোয়ারি কমিটি'

গঠন করে এবং তার প্রতিবেদনে বলা হয় - ফসল বৃদ্ধি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি,[২৭] যা হয়েছে দামোদর খাল মারফত সেচের জল পাওয়ার সাত বছরে অন্তত দুই বার শুখার হাত থেকে কিঙ্কৃতি পাওয়া গেছে ।[২৮] দামোদর ক্যানেল কর আন্দোলনের নেতারা আরও যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে দামোদর খাল বর্ধমানের জমির উর্বরতা ও ফলন বৃদ্ধি করতে পারেনি । তাদের মতে, এই খালের জল সরবরাহ ছিল অপ্রতুল, অনিয়মিত এবং কখনো কখনো বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হতো ।[২৯] ১৯৩৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে দুমাস ধরে কৃষকসভা ও কংগ্রেস যৌথভাবে বহু জায়গায় এই বিষয়ে জনসভা করতে থাকে এবং যতক্ষণ না কৃষকদের ন্যায়সংগত দাবি মিটছে ততক্ষণ আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ চলতে থাকে ।[৩০] অবশেষে সরকার ক্যানেল কর একর প্রতি ২ টাকা ৯ আনা(২-৯-০) ধার্য করতে বাধ্য হয় এবং বকেয়া কর কার্যত বাতিল হয় ।[৩১] যদিও কৃষকরা একর প্রতি দেড়টাকা হারে কর দেবার দাবি রেখেছিল । কিন্তু সরকার তা মেনে নেয়নি ।[৩২] সুতরাং বলা যেতে পারে এই খাল মারফত যা আশা করা হয়েছিল তা হয়নি ।

ব্রিটিশ আমলের এই সেচ খাল প্রকল্প সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না । কারণ, এই সেচ খাল জেলার মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেনি । তাছাড়া, শুধুমাত্র এই সেচ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে উচ্চ ফলনও সম্ভব ছিল না ।[৩৩] এমনকি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসেও এই খালের অবস্থার উন্নতি হয়নি । খালের সহজাত কিছু ত্রুটি দেখা যায় । এমনকি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণও হয় না, তাই পলি পরে ও সংস্কারের অভাবে বছরের বেশিরভাগ সময় মজে থাকতে দেখা যায় এই খালকে ।[৩৪] কাজেই খালের বাড়তি জলবহন করার ক্ষমতা কমে যায় । এর জন্য সরকারের উদাসীনতাই দায়ী ।[৩৫] এমনকি স্বাধীনতার আগেও দেখা গেছে যে এই জাতীয় খাল প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও জেলার খন্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর থানার ২৫০টি গ্রাম দামোদরের বন্যায় প্রায় প্রতি বছরই প্লাবিত হতো, যা ১৯৩৬ সালের দামোদর পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৬] উইলিয়াম উইলকক্স তাঁর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের এক বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক যুগে বর্ধমানে এ ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পের সমালোচনা করে বোঝাতে চেয়েছিলেন সেচখাল পরিকল্পনাগুলি তাদের করণীয় কার্য পালন করতে সক্ষম হয়নি।[৩৭] তবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই দামোদর খাল ব্যবস্থা ডি.ভি.সি-র জলসেচন নেটওয়ার্কের সাথে একীভূত হয়ে সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং এই জেলা এখনও এর সুবিধা উপভোগ করছে।[৩৮] তাই ১৯৬০-এর দশকে কৃষি উন্নয়নের মডেল হিসাবে যে ১৬টি জেলা বেছে নেওয়া হয় তার মধ্যে বর্ধমান ছিল অন্যতম এবং পরবর্তীকালেও দেখা যায় যে জেলার ফলন বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩৯]

পরিশেষে বলা যায় নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ড্রেজিং-এর অভাবে বর্তমানে খালে পলি জমে জলধারণের ক্ষমতা কমে গেছে, তাই মূল প্রকল্পের রূপরেখা মতো আজ আর এই খাল মানুষের কল্যাণে সেভাবে সহায়তা করতে পারছে না। তবে এই সেচ প্রকল্পের সাহায্যে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে কৃষির উন্নয়ন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। যদিও ঔপনিবেশিক যুগে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্ধমানের এই সেচখাল প্রকল্প পর্যাপ্ত ও যথাযথ ছিল না এবং খালের পরিষেবাও অসন্তোষজনক ছিল । তবে স্বাধীনতার পর

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এর সুফল বর্ধমানবাসী পেয়েছিল তা একপ্রকার নিশ্চিত । তাছাড়া দামোদর খালের জলসেচের মাধ্যমে খাল এলাকার কৃষকরা খরা ও বৃষ্টিপাতের অসমবণ্টন থেকে রক্ষা পেয়েছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই । তবে তাদের যে সমস্যা হয়েছিল তা হল বাংলার সরকার কর্তৃক আরোপিত সেচের জন্য দামোদর খালের জলের ওপর উচ্চহারে শুল্ক । সর্বোপরি দামোদর খালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফলন বৃদ্ধিই তার অবদানের একমাত্র সাক্ষী হয়ে রয়েছে ।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১) সঞ্জীব চক্রবর্তী, 'বর্ধমান জেলার নদনদী', লোকভারতী, নব পর্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, বর্ধমান, ২০১৩, পৃঃ ১২৭ ।

২) মনোজ কুমার সাহা, রাঢ় বাংলার দুরন্ত নদী দামোদর, শ্রীরামপুর, ২০০৮, পৃঃ ৪৮ ।

৩) K.A.L. Hill and P.K. Banerjee, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the district of Burdwan 1927-1934, Calcutta, 1940, p.3; Achintya Kumar Dutta, Economy and Ecology in a Bengal District : Burdwan 1880-1947, Firma KLM Private Limited, Kolkata, 2002, p.114.

৪) 'Settlement Report of the Burdwan Raj and Certain Other Estates in Districts Burdwan, Hooghly and Bankura in 1891-96', quoted in Achintya Kumar Dutta, তদেব, পৃঃ১১৫ ।

৫) এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতি (প্রথমখণ্ড), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ৪৪৬ ।

৬) 'Records relating to Damodar Canal Project', quoted in Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭-১১৮ ।

৭) Hindustan Standard, 11th March, 1938, p.4; The Statesman, 5th September, 1937, p.6; বিনয় চৌধুরী, 'দামোদর ক্যানাল ট্যাক্স আন্দোলন', ডঃ গোপীকান্ত কোঙার (সম্পাদিত), বর্ধমান সমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রকাশিকা-সুলেখা কোঙার, বর্ধমান, ২০০০, পৃঃ২৯১ ।

৮) সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, 'দামোদর ও অজয়ের বন্যা ১৯৫৬-১৯৫৯', সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, নতুন চিঠি প্রকাশনা, বর্ধমান, ১৯৯১, পৃঃ ৪১০ ।

৯) K.A.L. Hill and P.K. Banerjee, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৩ ।

১০) Report on the Evaluation of the Damodar Canal Silt, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1937, p.1.

১১) 'Settlement Report of the Burdwan Raj and Certain Other Estates in Districts Burdwan, Hooghly and Bankura in 1891-1896', quoted in Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ১২১ ।

১২) K.A.L. Hill and P.K. Banerjee, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৩ ।

১৩) Hindustan Standard, পূর্বোক্ত ।

১৪) 'Report on the Administration of Bengal for the year 1932-33', quoted in Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৮ ।

১৫) Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ১১৮ ।

১৬) S.K. Basu, Evaluation of Damodar Canal (1959-60) : A Study in the Benefits of Irrigation in the Damodar Region, New Delhi, 1963, p.10.
১৭) Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ১২৬ ।
১৮) W.L. Voorduin, Preliminary Memorandum on the Unified Development of the Damodar River, Damodar Valley Corporation, Calcutta, 1945, p.21.
১৯) Department of Agriculture and Industries, Agriculture Branch, Government of Bengal, Proceedings. 7-8, July-1936, W.B.S.A, Kolkata.
২০) তদেব ।
২১) S.C. Bose, The Damodar Valley Project, Calcutta, 1948, p.50.
২২) Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ১২২ ।
২৩) বিনয় চৌধুরী, পূর্বোক্ত ।
২৪) এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত ।
২৫) তদেব; Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০-১২১ ।
২৬) বিনয় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯২ ।
২৭) Hindustan Standard, পূর্বোক্ত ।
২৮) বিনয় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৩ ।
২৯) Amrita Bazar Patrika, 9th April, 1937, Calcutta, p.12.
৩০) বিনয় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৪ ।
৩১) তদেব; Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২ ।
৩২) এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৮ ।
৩৩) Achintya Kumar Dutta, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৬ ।
৩৪) উদিত নারায়ণ সিংহ, ইতিবৃত্তে আদি বর্ধমান, মুক্তবাংলা প্রকাশনী, বর্ধমান, ২০০০, পৃঃ ৩৪; সুধীরচন্দ্র দাঁ, 'ডি.ভি.সি-র পঞ্চাশ বর্ষঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি', ডঃ গোপীকান্ত কোঙার (সম্পাদিত), বর্ধমান সমগ্র (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃঃ৩০১ ।
৩৫) সুধীরচন্দ্র দাঁ, ডি.ভি.সি-র পঞ্চাশ বর্ষঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পূর্বোক্ত ।
৩৬) দামোদর (পাক্ষিকী), প্রথম বর্ষ, সংখ্যা - ১,২৫ শে মার্চ, ১৯৩৬, পৃঃ১ ।
৩৭) কল্যাণ রুদ্র, 'গঙ্গা-ব-দ্বীপ থেকে মহানদী', বিতর্কিকা, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ১৮-২১; বিনয় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯১ ।
৩৮) B.B. Chaudhury, 'Rural Power Structure and Agricultural Productivity', in Meghnad Desai, Susane Rudolph & A.Rudra (eds.), Agrarian Power and Agricultural Productivity in South Asia, New Delhi, 1984, p.167.
৩৯) জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী, 'বর্ধমানঃ সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক রূপরেখা', বর্ধমান চর্চা (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ), বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী, বর্ধমান, ২০০১, পৃঃ ৬৪; গোপা সামন্ত, 'বর্ধমানঃ গ্রাম ও শহরের উন্নয়ন এবং পারস্পরিক যোগসূত্র', বর্ধমান চর্চা (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ), বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী, বর্ধমান, ২০০১, পৃঃ ১৭২ ।

প্রান্তজনের ধারায় বাংলার তিন সর্দার : নারদ, দুর্যোধন ও লংকেশ্বর

টোটন বিশ্বাস
অতিথি শিক্ষক
পি. আর. ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজ, ঠাকুরনগর

সারসংক্ষেপ:
পূর্ববঙ্গ তথা অধুনা বাংলাদেশের এক বিশেষ শ্রেণী হলো লাঠিয়াল; তাদের দলের প্রধানকে সর্দার বলা হত। ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় সর্দারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নারদ, দুর্যোধন ও লংকেশ্বর ছিলেন তিনজন বিখ্যাত সর্দার। এছাড়াও ড্যাগা সরদার, মনোহর সরদার, চরণ সরদার প্রমুখের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ করে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যুব সমাজ। প্রান্তিক সমাজের একাংশ হয়ে উঠেছিল লাঠিয়াল। কামারঘোপ-কালিনগরের সর্দারদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সুনাম, বাংলার বিভিন্ন এলাকার মানুষকে মানষিক শক্তির জোগান দিয়েছিল। লাঠিয়াল দল ও তাঁদের সর্দারেরা জমির ফসল রক্ষা, জমি পুনর্দখল সহ বিভিন্ন কাজ করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিচার - সালিশিতে তাদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র ফসল বা জমি রক্ষা তথা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, অন্নান্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও তাদের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। নারীর সম্মান রক্ষার্থেও কাজ করেছিলেন, বাংলার লাঠিয়াল সর্দারেরা। শুধুমাত্র নিজেদের কর্মকান্ড পরিচালনাই নয়, জাতি ও শ্রেণি দ্বন্দের জটিলতার প্রেক্ষিতে, সমাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য। কালক্রমে সমাজিক স্বার্থে বাংলার ঐতিহ্যে পরিনত হয়েছিলেন, লাঠিয়াল সর্দারেরা। তাই তো আজও বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সূচক শব্দ: সর্দার, লাঠিয়াল, প্রান্তিক সমাজ, বাংলার ঐতিহ্য, আর্থ-সামাজিক ইতিহাস

মূল প্রবন্ধ

অবিভক্ত বাংলা তথা বাংলার পূর্বাংশ অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশের এক বিশেষ শ্রেণী হলো লাঠিয়াল; তাদের দলের প্রধানকে সর্দার বলা হত। ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় সর্দারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[১] আচার্য মহানন্দ হালদারের লেখা, 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থেও ফরিদপুরে লাঠিয়ালদের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। যথা-

“ফরিদপুরবাসী যত নমঃশূদ্রগণ।
অস্ত্র শস্ত্র লাঠি খেলা জানে বিচক্ষণ।”[২]

এখন প্রশ্ন হল নারদ, দুর্যোধন ও লঙ্কেশ্বর কি প্রকৃতার্থেই সর্দার ছিলেন? তারা কি

বাংলার প্রান্তিক শ্রেণীর নেতায় পরিণত হয়েছিলেন? যদি হয়েও থাকেন, তবে তাদের প্রভাব কিরূপ ছিল? জাতি ও শ্রেণীর জটিলতায় তাঁদের অবস্থান কেমন ছিল? বাংলার প্রেক্ষিতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার জটিল আন্তসম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

নারদ, দুর্যোধন ও লংকেশ্বর ছিলেন তিনজন বিখ্যাত সর্দার। এছাড়াও সর্দার রতিকান্ত শিরাল, পুলিন সর্দার, ড্যাগা সরদার, মনোহর সর্দার, মুকুন্দ সর্দার, অনন্ত সর্দার, কৈলাস সর্দার, চরণ সর্দার প্রমুখের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দ সর্দারের ভাতুস্পুত্র তথা লাঠিয়াল গনেশ চন্দ্র সরকারের পুত্র, প্রমথ সরকার বলেন যে; "লাঠি নিয়ে যে মারামারি করে বা খেলা করে, সেই তো লাঠিয়াল; তাদের দলপতি হলেন সর্দার অর্থাৎ প্রধান নেতা।।"[৩] অনিল কৃষ্ণ মল্লিক তার 'সেই দিনের প্রতীক্ষায় ও বাংলা লাঠিয়াল' গ্রন্থে নারদ, দুর্যোধন ও লঙ্কেশ্বরকে সর্দার হিসেবেই দেখিয়েছেন।[৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের লেখা 'বাংলার লাঞ্ছিত মনিষী' গ্রন্থেও তাঁদেরকে সর্দার হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৫]

সর্দার রতিকান্ত শিরালের দুই সুযোগ্য সাকরেদ তথা বাংলার দুই দুর্ধস্যবীর নেতা-সর্দার দুর্যোধন এবং তার খুড়তুতো ভাই সর্দার লংকেশ্বর এবং সমকালীন অন্যতম সর্দার ছিলেন নারদ।[৬] দুর্যোধন অপেক্ষা নারদ প্রায় বারো-তেরো বছরের বড় ছিলেন। তিনি, নারদের কাছ হতেও কিছু খেলার শিক্ষা গ্রহন করেছিলেন। সেই হিসাবে নারদ, একদিকে যেমন দুর্যোধনের বড়ো ভাই, অপর দিকে আবার গুরুও বটে।[৭] শক্তিশালী ও দুঃসাহসী সর্দার লংকেশ্বর, লাঠি-সড়কির খেলায় অথবা সাহস ও শক্তির পরীক্ষায় একমাত্র তাঁর জ্যেঠতুতো দাদা, সর্দার দুর্যোধন ছাড়া আর কাউকেই তেমন পরোয়া করতেন না। বিভিন্ন কাজিয়ায় তাঁরা একসঙ্গে বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করেছিলেন। তাদের ছিলো যথেষ্ট পরিমাণে সাংগঠনিক শক্তি এবং নেতৃত্ব দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা। তিনি শত্রু পক্ষের সবল এবং দুর্বলস্থান গুলির কথা বিবেচনা করে, কোথায়, কখন, কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে; তা নিরুপণ করতেন, আর কাজিয়ার প্রধান ভূমিকা গ্রহন করতেন। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছনোর পূর্বেই, তাঁরা বাংলার সবচেয়ে গণ্যমান্য ও নাম-ডাক ওয়ালা সর্দার তথা নেতায় পরিনত হয়েছিলেন; এমনকি বাংলার বাইরে তাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নেতা তথা সর্দার এবং তাদের সাকরেদেরা জমির ফসল রক্ষা, জমি পুনর্দখল সহ বিভিন্ন কাজ করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিচার - সালিশিতে তাদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র ফসল বা জমি রক্ষা তথা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, অন্নান্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও তাদের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। নারীর সন্মান রক্ষার্থেও কাজ করেছিলেন, বাংলার লাঠিয়াল সর্দারেরা।[৮]

বাংলার প্রান্তিক সমাজের মানুষের একাংশ জীবন-জীবিকা রক্ষায় বল প্রয়োগের প্রয়োজন হওয়ায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। জমিদারের জমিদারি রক্ষায়, জাতিগত আক্রমণ থেকে হিন্দুদের বিশেষভাবে বর্ণ হিন্দুদের যুবতী মেয়ে ও অল্প বয়সী বৌদের রক্ষায় হিন্দুদের ধর্মীয় স্থান রক্ষায় কাজ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নওসের গাজী, নহাটা বাজারের পার্শ্বে হিন্দু পাড়ার মাঝে গিয়ে বাড়ি করেছিল। তৎকালীন দেশভাগের প্রেক্ষিতে মুসলমানরা লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, জিগির তখন তুঙ্গে ওঠে। রমনীবাবু কলিকাতায় চাকরী করতেন; তার নব বিবাহিতা স্ত্রী সরস্বতী এবং শশুড়-শাশুড়ীর

সঙ্গে গ্রামে থাকেন। নওশের সরস্বতীর পিছনে পড়েছিল; একদিন হাত ধরে বসে এবং প্রস্তাব দিয়েছিল যে, তাকে নিকে করে পাটরানী করে রাখবে। সরস্বতীর বাপের বাড়ী যেখানে, সেখান থেকে লংকেশ্বর এর বাড়ি খুব বেশী দূরে নয়। সরস্বতীর ভাই দিদির বাড়ি গেলে, তিনি লংকেশ্বরকে জরুরী খবর দেন। পরের দিন আরও কয়েকজনকে নিয়ে তিনি (লংকেশর) সরস্বতীর বাড়ি হাজির হন এবং সব শুনে তিনি পুকুর ঘাটে যেতে বলেন এবং যত সময় পাষণ্ড (নওসের) না আসবে, ঘাটে বসে কাপড় কাচতে, স্নান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর রাতে আসার কথা বলে, অভিনয় করতে বলেছিলেন। পরিকল্পনা অনুসারে দরজার কাছে দুইজন, বাড়ীর বাইরে আমগাছতলায় দুজন বসেছিলেন। পাখি (নওসের) ফাঁদে পড়ে রাত্রি ১১টা নাগাদ। লংকেশ্বর তাকে ধরেই ঘাড় ভেঙ্গে দেয় এবং তাকে বস্তায় ভরে মাথায় করে ১৫ - ১৬ মাইল পথ হেঁটে শত শত টুকরা করে নব গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন; এইভাবে তিনি হিন্দু রমনীর সম্মান বাঁচিয়েছিলেন।[৯]

পদ্মা, মেঘনা ও অন্যান্য বড় বড় নদীর নতুন জেগে ওঠা চর অঞ্চল দখলে এনে চাষের উপযোগী করতে, এইসব নেতা তথা লাঠিয়াল সর্দাররা অস্ত্র হাতে এগিয়ে গিয়ে সম্মুখ সমরে আক্রমণ কারীদের মোকাবিলা করতেন। শ্রেণীগত আক্রমণ প্রতিনিয়ত চলতে থাকায়, স্থায়ী লাঠিয়াল দল তৈরী হয়েছিল। অর্থের বিনিময়ে দূর হতে দূরান্তরে লাঠি-মারার প্রয়োজনে কাজিয়ায় যেত। নারদ সর্দার তার দলবল শুধু লোহাগাড়া থানার উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ খুলনায় কাজিয়ার জন্য বায়না নিতেন।[১০] উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের শিক্ষা-সম্পদ-অর্থ সবই ছিল কিন্তু আক্রান্ত হলে থানা-পুলিশ-আইন-আদালত পর্য্যন্ত যাবার আগে আক্রমণকারীকে ঠেকাতে এই প্রান্তিক শ্রেণীর লাঠিয়ালরাই এগিয়ে আসত। প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষেরা শত শত বৎসর শহর থেকে দূরে থাকায় শিক্ষা-দীক্ষা না পাওয়ায়, তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বাংলার এই তিন সর্দার নেতা (নারদ, দুর্যোধন ও লঙ্কেশ্বর) শিক্ষাগত ক্ষেত্রে খুব বেশি উন্নীত হতে পারেননি। নারদ সর্দার পঞ্চম শ্রেণি পাস করেছিলেন, দূর্যোধন সর্দার তৃতীয় শ্রেণী পাস করেছিলেন; এবং লঙ্কেশ্বর দ্বিতীয় শ্রেণী পাস করেছিলেন।[১১] প্রান্তিক এই শ্রেণী, একটি পশ্চাদপদ গোষ্ঠি হলেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাইতো যশোর জেলায় নড়াইল, নলডাঙ্গা, লোহাগড়া, নন্দী ইত্যাদি জায়গার রাজা ও জমিদারেরা, নারদ দুর্যোধনের লাঠিয়াল দলকে নগদ টাকা পয়সা ছাড়াও অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। জমিদারেরা, শুধু মাত্র তাদের জমিদারী রক্ষার তাগিদেই যে এই লাঠিয়াল দলকে বিশেষ সহানুভূতির-দৃষ্টিতে দেখতেন, এমন নয়।[১২] তখন হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের আচরণ এতো খারাপ হয়ে উঠছিল যে, হিন্দুদের রক্ষাকর্তা হয়ে হয়ে উঠেছিল, লাঠিয়াল সর্দারেরা।

নারদ, দুর্যোধন ও লংকেশরের কাজিয়া লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নরদ সর্দার দীর্ঘ কাজিয়ায় এদিক থেকে ওদিকে ছোটাছুটি করে শত্রুপক্ষের সবল ও দুর্বল স্থান গুলি বুঝে নিয়ে, নিজের পক্ষের সর্দারও লাঠিয়ালদের লড়াইয়ের জায়গায় স্থির করে দেন। দুর্যোধনের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই লক্ষ্য করা যায় । অন্যদিকে লঙ্কেশ্বর বিভিন্ন সর্দার নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে কাজিয়া সম্পন্ন করেন।[১৩] গোবিন্দপুর গ্রামের কাজিয়ায় সর্দার দুর্যোধন, সর্দার নারদের নির্দেশ মতো বীর পরাক্রমে পোলাদ খার বাহিনীর প্রতিরোধ

করেছিলেন। মুসলমান বাহিনীর সামনে যেন কালান্তক যমের মতোই হাজির হয়েছিলেন, তঁরা। এমনকি জাতিগত দ্বন্দে নমঃশূদ্রদের বিরুদ্ধে জেহাদ পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল; সামাজিক শর্তে এগিয়ে এসেছিলেন, বাংলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল সর্দার তথা নেতারা। বিভিন্ন পিছিয়ে থাকেনি, নারীরাও। নারী - পুরুষরা দলবদ্ধ ভাবে জয় ডঙ্কা বাজানো; এমনকি গৃহবধুর দাঁ, ছ্যান, ছুরি প্রভৃতি নিয়ে লাঠিয়াল দের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলাম ধর্মাবলম্বী গোলাম রসূল, হিন্দু - যুবতী বিধবা মেয়েকে লোভ-লালসা দেখিয়ে নিকে করলে, জাতি গত দ্বন্দ্ব করে লক্ষিত হয়। এরপর থেকে রসুল, হিন্দুগ্রামের মধ্য দিয়ে আর চলাচল করতেন না। বীর সর্দার - নেতারা তাকে, ওই অবস্থা থেকে বের করে আনতে চাইলেও; সময়ের প্রেক্ষিতে শেয়ার ফিরে আসতে চাইনি।[১৫] কান্দাকূল অঞ্চল থেকে বেশ কয়েকটি বিধবা এবং বয়স্কা এবং তৎসহ কুমারী মেয়েকে মুসলমান দুর্বৃত্তরা ফুসলায়ে অথবা গায়ের জোরে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে অথবা নিকে করে ফেলেছিল। যে সকল অপহৃতা মেয়েদের অভিভাবকেরা নারদ দুর্যোধনের দলের কাছে তাদের মেয়েদের উদ্ধার করে এনে দেবার অনুরোধ করলে, সর্দারেরা অপহরণকারী (মুসলমান) -দের মেরে-ধরে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ছাড়লেন এবং কিছু মেয়েকে উদ্ধারও করেছিলেন। এরপর ঝামারঘোপ - কালিনগরের লাঠিয়ালদের ভয়ে, অঞ্চলে হিন্দু রমণী অপহরণের ঘটনা খুব কমই ঘটত।[১৬]

কুচিয়ামোড়া-দাবড়খালি গ্রামের বিবাদে মীমাংসার ক্ষেত্রে, নারদ বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিভিন্ন সরদার তথা নেতাদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।[১৭] লক্ষ্মী পাশার বিখ্যাত কালী মন্দিরের সেবায়েতের কাছ থেকে, নারদ- দুর্যোধনের কাছে আহ্বান এসেছিল যে, ‘যে কোন দিনে দুর্বৃত্ত মুসলমানেরা তাদের পবিত্র মন্দিরটি নষ্ট করে দিতে পারে, অতএব তাঁরা যেন এর প্রতিকারে এগিয়ে এসে হিন্দুধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেন।’ এ খবর পাওয়া মাত্র, স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তার উক্তি ছিল অনেকটা এরকম - কালী মন্দিরের উপর কোনরকম অত্যাচার হলে তোমাদের (অত্যাচারীদের) নব গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।[১৮] এ যেন জাতিগত, শ্রেণীদ্বন্দ্বের সামিল।

ওড়াকান্দির গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর বিশিষ্ট মতুয়া-শিষ্যদের মুখে ঝামারঘোপ-কালিনগরের লাঠিয়াল ও সর্দারদের অর্থাৎ নারদ, দূর্যোধন ও লঙ্কেশ্বরের বীরত্বের কাহিনী শুনতে পেয়ে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে নারদ ও দুর্যোধনকে ওড়াকান্দিতে আসবার খবর পাঠিয়েছিলেন। এই সময় দুর্যোধন এবং অন্যান্য সর্দারও লাঠিয়ালদের নিয়ে একটি বায়নার কাজিয়া করতে যাওয়ায়, নারদকে একা একাই ওড়াকান্দিতে যেতে হয়েছিলেন। নারদ ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে প্রণাম করতেই, গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্দার নেতৃত্বকে আগামী দিনের জন্য আরও শক্তভাবে প্রস্তুত থাকার কথা বলেছিলেন।’ নারদ সর্দার, ওড়াকান্দিতে দুইদিন অবস্থান করে, ঠাকুরের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার পর বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলেন। আসবার সময় ঠাকুর, নারদকে একখানা মাত্র গামছা উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করছিলেন: ‘জয়হোক তোমাদের।’ কাজিয়া খোলায় নারদকে একখানা দুই-ভাজ করা গামছার দুইকোণ, ধরে নিজের মাথার উপর আচ্ছাদন করে রাখতে দেখা যেত; প্রয়োজনে গামছা খানাকে তিনি

কোমরেও বেঁধে রাখতেন। অনেকে বলে থাকেন যে, ওটাই ছিলো গুরুচাঁদ ঠাকুরদের দেওয়া সেই আশীর্বাদের গামছা।[১৯]

মাগুরা থানার উত্তর প্রান্তে, মধুমতীর তীরে ডুমোন গ্রামের অবস্থান। মধুমতী চরের দখল স্বত্ব নিয়ে সেখানকার নমঃশূদ্র এবং মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। চরের সামান্য কিছু জমি কয়েক বছর ধরে একটা গণ্ডগোল চলছিল। প্রথম দিকে ব্যাপারটা স্থানীয় পর্যায় থাকলেও, পরে সেটা সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে বড় আকারের একটা জোটাজুটির কাজিয়ায় পরিণত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা (নারদ, দুর্যোধন ও লংকেশরের সঙ্গে বিবাদে জড়ানো) অতো সহজ-সরল নয় বিবেচনা করে,- মুসলমান সর্দারেরা নারদের মোকাবেলা করতে চৌধুরীকেই নির্বাচিত করেছিলেন। চৌধুরী সর্দার ব্যাঙ্গাত্মক হাঁক দিয়েছিলেন যে, "কইরে, নারদ চাড়াল কই? চলে আয়, শালা বান্দির-বাচ্ছা, কাফের! শুনিছি তুই একজন বড় সর্দার হয়ে পড়িছিস, আয় শালা কটা চাড়াল, আজ আমি তোর সর্দারী ঘুচা'য়ে দেবো।" কাজিয়া চলাকালীন চৌধুরী পড়ে যেতেই নারদ কাল-বিলম্ব না করে আর একটি সড়কি নিয়ে লাফিয়ে উঠেই তাঁর বুকে বসিয়ে দেবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মৃত্যু-পথ-যাত্রী চৌধুরী অতি কষ্টে জোড়হাত করে তাঁর অন্তিমকালের একটি শেষ প্রার্থনা নারদের কাছে পেশ ক'রে বসলেন-"আপনি, আমার ধর্মের ভাই! ভাই হয়ে, ভাইয়ের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি, আমাকে মারবেন না, দোহাই আপনার!" তারপর অবধারিত-মৃত্যুর কিনারায় পৌঁছে চৌধুরী-সদ্দার তাঁর হৃদয়ের অদৃশ্য অন্তস্থল থেকে এমন একখানা অমোঘ-অস্ত্র নারদের উপর নিক্ষেপ করলেন, যা যে কোন ইস্পাত-তৈরী কঠিন প্রহরণ অপেক্ষা সহস্রগুণ শক্ত ও অবিনশ্বর। একজন বিখ্যাত সর্দার বিপাকে পড়ে নারদকে ধর্মের ভাই সম্বোধন করায়, দয়ার হৃদয় নারদের করুণার উদ্রেক হল। তিনি মুহূর্তে তাঁর সড়কি সম্বরণ করে নিয়ে চৌধুরীর হাত ধরে টেনে তুলে তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন।[২০]

নারদ সর্দারের সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং দল পরিচালনায় দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। যার ফলে তার পরিচালনাকালে নারদ সর্দারের দল কখনও কাজিয়ায় কোথায় পরাজিত হয়ে ফিরে আসে নাই। তিনি লাঠিয়ালীকে তার জীবিকা বা পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন এবং বায়না ধরে সারা বৎসর দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কাজিয়া করে বেড়াতেন। নারদ সর্দার চমৎকার ঢোল বাজাতে পারতেন। নিজে গাইতে পারতেন না তবে খুব মন দিয়ে ভজন, কীর্তন, রামায়ণ গান শুনতেন। বড়োদের সম্মান করতেন ও গুনীদের প্রশংসা করতেন। নিরস্ত্রকে তিনি কখনও আঘাত করতেন না।[২১]

লাঠিয়াল বা বীর সৈনিক হিসাবে দুর্যোধনের তুলনা মেলা ভার। তার ব্যক্তিত্ব এত বেশী ছিল যে সচরাচর কেউ তার নিকটে যেতেন না। আর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল শীর্ষ স্থানীয়। তিনি নিজে প্রায় ছয়-সাতটি লাঠিয়াল দল গঠন করে ছিলেন। এরা বায়নার কাজে মাঝে মাঝে একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে কাজিয়ায় যেত কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধে কাজিয়ায় তার দল বিনা শর্তে হিন্দুদের হয়ে লড়তেন। তার আওয়াজ ছিল গুরু গম্ভীর, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ বা নির্দেশ বজ্রকণ্ঠের মত শোনাত। লাঠিয়ালি তার জীবনের নেশা এবং পেশাও ছিল। বীর দুর্যোধন কেবল সর্দারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আদর্শ স্বামী, পিতা, এবং সাধারণ মানুষ। তিনি ভাল ঢোল বাজাতেন, তিনি সুন্দর

ছবি আঁকতে পারতেন। তিনি গান ভালবাসতেন এবং খুব ভক্তির সহিত ভজন কীর্তন রামায়ণ গান শুনতেন। তিনি কবিগানের খুব ভক্ত ছিলেন। মনের মত গান হলেই তার দু চোখের জল গড়িয়ে পড়ত। তিনি ছোট ছোট বাচ্চাদের খুব আদর করতেন।[২২]

লংকেশ্বরের নামকরন সত্যিই স্বার্থক হয়েছিল। তিনি দীর্ঘ দেহী, স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। তার উচ্চতা ছিল ছয় ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি। চওড়া বুক, মুখে ঘন দাড়ী, মাথায় বাবরী চুল এবং দাত চকচকে সাদা। চুল ফুলিয়ে শক্ত চোয়ালে হুংকার ছাড়লে সাধারণ মানুষের অন্তরাত্মা খাচা ছাড়ার উপক্রম হোত। সব কিছুর থেকে আরও বেশী ছিল তার ব্যক্তিত্ব। কাউকে না ডাকলে সহজে কেউ তার নিকটে যেতেন না। লংকেশ্বরের হাতে খুব জোর ছিল। কথিত আছে সড়কির এক কোপে তিনি তিনটি ঢাল ভেদ করে দিতেন। লাঠি খেলায় বা সড়কি খেলায় বা কুস্তিতেও শক্তি পরীক্ষায় তিনি কেবলমাত্র দুর্যোধন সরদারকে সমীহ করতেন। লাঠি খেলায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।[২৩]

দেশভাগের প্রক্ষিতে পাকিস্তানের জন্ম হলে নারদ সর্দার দেশ ছেড়ে ভারতে এসে বগুলার (নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গৌরনগর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। শেষ বয়সে বাড়ীতে সাপের কামড়ে, তিনি মারা যান। দুর্যোধন দেশভাগের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতে চলে আসেন। তার দেখাদেখি নাম করা লাঠিয়ালেরাও দেশ ছেড়ে চলে আসেন। ভারতে তিনি নদীয়ার চুর্ণী নদীর তীরে স্বর্ণ খালি গ্রামে বসবাস করতেন। এখানেই তিনি পরিণত বয়সে ১৩৯১ সালে দেহ ত্যাগ করেন। অনেকে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে এলেন কিন্তু লংকেশ্বর দেশেই রয়ে গেলেন। তিনি বলতেন গ্রামই তার মা, তাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। লাঠিয়ালী থেকে তিনি বিদায় নেওয়ার পর গান বাজনা, ধর্ম্ম আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত থাকলেন। দেশে মিলিটারী শাসন চালু হল। এক বিকালে তিনি নহাটার হাট থেকে বাড়ী ফেরার সময় ১৪-১৫ জন পুলিশ ও মুসলমান, লোকে বলে মিলিটারী, তৎসঙ্গে ৪০-৫০ জন মুসলমান লংকেশ্বরকে আটকে বেধে নিয়ে যায়। ২দিন পর্যন্ত তার উপর পাষবিক অত্যাচার করে তার হাত পা এবং বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দেয়। হাজতে থাকে ৯ মাস থাকার পর, ঘরে ফিরে আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। অসুস্থ অবস্থায় দেড় বৎসর পর তিনি তার গ্রামের নিজের বাড়ীতেই দেহ ত্যাগ করেন।[২৪]

নারদ, দুর্যোধন ও লংকেশ্বর, ছিলেন বীর যোদ্ধা, যুব সমাজের শিক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তি; যারা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। এমনকি শেষ জীবনে সংগীত চর্চাও করতেন। শুধুমাত্র লাঠিয়াল বলেই নিষ্ঠুরতা নয়, সুকোমল প্রবৃত্তিও তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ করে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, যুব সমাজ। প্রান্তিক সমাজের একাংশ হয়ে উঠেছিল লাঠিয়াল। কামারঘোপ-কালিনগরের সর্দারদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সুনাম, বাংলার বিভিন্ন এলাকার মানুষকে মানষিক শক্তির জোগান দিয়েছিল। লাঠিয়াল দল ও তাঁদের সর্দারেরা জমির ফসল রক্ষা, জমি পুনর্দখল সহ বিভিন্ন কাজ করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিচার - সালিশিতে তাদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র ফসল বা জমি রক্ষা তথা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, অন্নান্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও তাদের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। নারীর সন্মান রক্ষার্থেও কাজ করেছিলেন, বাংলার লাঠিয়াল সর্দারেরা। শুধুমাত্র নিজেদের কর্মকান্ড পরিচালনাই নয়, জাতি ও শ্রেণি দ্বন্দের জটিলতার প্রেক্ষিতে, সমাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য। কালক্রমে সমাজিক স্বার্থে বাংলার

ঐতিহ্যে পরিনত হয়েছিলেন, লাঠিয়াল সর্দারেরা। তাই তো আজও বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. সেন, নিত্যরঞ্জন, বাংলার ইতিহাস স্রষ্টা লাঠিয়ালেরা, কুমারপ্রেশ, বনগ্রাম, ১৩৮৮ সাল, পৃঃ২, ৭,
বিশ্বাস, শৈলেন্দ্রনাথ, বাংলার লাঞ্চিত মনীষী, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৫, পৃ ২৪৩ - ২৫৫
মল্লিক, অনিল কৃষ্ণ, সেই দিনের প্রতীক্ষায় ও বাংলার লাঠিয়াল, অফসেট, নদীয়া, ২০০৯, পৃঃ ১৭- ১৯
বিশ্বাস, শরৎচন্দ্র, নম:শূদ্র সম্প্রদায়ের আত্মকথা, দ্য জেনারেল বুকস, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৯০ - ৯৬
২. হালদার, মহানান্দ, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, মতুয়া বার্তা, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০১৬, পৃঃ ৪৪৪
৩. সাক্ষাৎকার, প্রমথ সরকার, স্থান- মামুদপুর, তাং ১৪/০৭/২৪
(প্রমথ সরকার, মুকুন্দ সর্দারের ভাতুস্পুত্র এবং লাঠিয়াল গনেশ চন্দ্র সরকারের পুত্র)
৪. মল্লিক, অনিল কৃষ্ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭ - ১৯
৫. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৩ - ২৫৫
৬. সেন, নিত্যরঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯
৭. তদেব, পৃঃ ২৫
৮. তদেব, পৃঃ ৩৫, ৫৫
৯. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ২৫৫ - ২৫৬
১০. সাক্ষাৎকার, ভবানী শংকর রায়, স্থান- ঝাউডাঙ্গা, তাং ২৭/০৯/২৪ (স্বাধীন গবেষক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক) সেন, নিত্যরঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২ - ৭৩
১১. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২ - ২৫৬
১২. সেন, নিত্যরঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮
১৩. তদেব, পৃঃ ১২১ - ১২২
১৪. তদেব, পৃঃ ১২১
সাক্ষাৎকার; অনিল বিশ্বাস, স্থান- সলুয়া তিন নং কলোনি, তাং ১১/০৮/২৪, [অনিল বিশ্বাস, প্রখ্যাত লাঠিয়াল মনোহর বাবুর (সর্দার) পুত্র]
১৫. সেন, নিত্যরঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫ - ৩৬
১৬. তদেব, পৃঃ ৪৭ - ৪৮
১৭. তদেব, পৃঃ ৯১- ৯২ ; সাক্ষাৎকার; প্রমথ সরকার, স্থান- মামুদপুর, তাং ১৪/০৭/২৪ (প্রমথ সরকার, মুকুন্দ সর্দারের ভাতুস্পুত্র এবং লাঠিয়াল গনেশ চন্দ্র সরকারের পুত্র)
১৮. সেন, নিত্যরঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭
১৯. তদেব, পৃঃ ৯৬
২০. তদেব, পৃঃ ৪৫ - ৪৬
২১. সাক্ষাৎকার : কিরন বিশ্বাস, স্থান - ঠাকুরনগর, তাং ১৫/১০/২৪ (কিরণ বিশ্বাস একজন প্রত্যক্ষদর্শী, সামনে থেকে দেখেছেন। তৎসহ বিভিন্ন লাঠিয়াল এর জীবন সম্পর্কে শুনেছেন

বা জানেন।) বিশ্বাস, শৈলেন্দ্রনাথ, বাংলার লাঞ্ছিত মনীষী, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ২৫২-২৫৩

২২. তদেব, পৃঃ ২৫৯ - ২৬০

২৩. তদেব, পৃঃ ২৫৬ - ২৫৭

২৪. তদেব, পৃঃ ২৫৩, ২৫৭, ২৬১

সত্যজিত রায় পরিচালিত নারীকেন্দ্রিক ‘মহানগর’ (১৯৬৩) ছায়াছবির একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

প্রিয়াঙ্কা দত্ত
পি এইচ ডি গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
ইতিহাস বিভাগ

সারসংক্ষেপ

চল্লিশের দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্র জগত তার সর্বভারতীয় স্থান হারিয়ে ক্রমেই আঞ্চলিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং দেশভাগ পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা চলচ্চিত্র জগত নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং নিজেদের অনন্যতা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে উত্তম-সুচিত্রা জুটির উপর আস্থাজ্ঞাপন করার পাশাপাশি রুচিশীল, বাঙালীয়ানায় ভরপুর কাহিনী পরিবেশনার মাধ্যমে বাঙালী দর্শককে আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। একদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা অপরদিকে নতুন আর্থসামাজিক, আইনি ব্যাবস্থার আঘাতে টালমাটাল ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যাবস্থায় পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বাংলা চলচ্চিত্রও এর ব্যাতিক্রম নয়। তাই পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ থেকেই দেখা যায় হারিয়ে যাওয়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাতে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল একাধিক ছায়াছবি যাঁদের মূল উপজীব্য ছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় দ্বন্দ্ব এবং শেষপর্যন্ত ঐতিহ্যের জয়গান। কিন্তু ১৯৬০এর দশকে পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এই দশক থেকে কিছু আলোকপ্রাপ্ত পরিচালকগণ তথাকথিত বাণিজ্যিক ছায়াছবির নির্ধারিত পরিকাঠামোর পরিবর্তে বাস্তব পরিস্থিতিকে নিজেদের ছায়াছবিতে প্রাধান্য প্রদান করেছিলেন এবং স্বাধীনোত্তর যুগে মহিলাদের কর্মজগতে প্রবেশ ও তাঁদের জীবনসংগ্রাম, তাঁদের জয় পরাজয়ের বাস্তব ইতিহাসকে ছায়াছবির মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। এই নতুন ধারার ছায়াছবির মূল সুর অনেকাংশেই বাঁধাছিল বিশ্বচলচ্চিত্রের সঙ্গে এবং পাশাপাশি ভারত তথা বাংলার পরিবর্তিত আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে। এই ধারার ছায়াছবিগুলির মধ্যে সত্যজিত রায় পরিচালিত ১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মহানগর’ ছিল অন্যতম। এই গবেষণাপত্রে একজন কর্মরতা নারীর ব্যাক্তিগত জীবনসংগ্রাম, কর্মজগতে তাঁদের ব্যক্তিগত ইতিবাচক, নেতিবাচক পরিস্থিতি এবং ছায়াছবির পর্দায় এর প্রতিফলন ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হবে। পাশাপাশি বিশ্বচলচ্চিত্রের তৎকালীন পরিস্থিতি কিভাবে এই ছায়াছবিতে প্রবাব বিস্তার করেছিল বা আদৌ কোন প্রভাব বিস্তার করেছিল কি না সেই বিষয়টিও আলোচিত হবে এই গবেষণাপত্রে।

সূচক শব্দ- উনিশশো ষাটের দশক, বাস্তব আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, কর্মরতা নারী, ভিন্ন স্বাদের বাংলা ছায়াছবি, ঐতিহ্য-আধুনিকতার দ্বন্দ্ব।

মূল প্রবন্ধ

স্বাধীনোত্তর যুগে বাংলা চলচ্চিত্র জগত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজের স্থান হারিয়ে শুধুমাত্র আঞ্চলিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লেও রুচিশীল, সাহিত্যনির্ভর ও সর্বোপরি সুচিত্রা-উত্তম জুটি অভিনীত ছায়াছবির মাধ্যমে বাঙালী দর্শকের হৃদয়ে নিজের স্থান অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পাশাপাশি ১৯৪৭এর স্বাধীনতা ও পঞ্চাশের দশকের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়াও ভারতীয় তথা বাঙালীদের মধ্যে জীবনের প্রতি এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক উন্মাদনা স্তিমিত হওয়ার পরেই বাংলার বাস্তবিক পরিস্থিতি রাজ্যের সাধারণ নাগিরিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে ক্রমশই প্রকট হতে থাকে। ১৯৫০এর দশকে বাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মহীনতা, খাদ্য সংকট এবং সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা বাংলার বাতাসে হতাশাজনক উপাদানের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে বাংলার বুদ্ধিজীবীগণ তথা শিল্পীগণের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা কখনই সম্ভবপর ছিল না। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের তিন বটবৃক্ষ হলেন- ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন এবং তাঁরা ছায়াছবির মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীনোত্তর যুগের বাংলায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘকাল ধরে গৃহের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ মহিলারা পারিবারিক আর্থিক প্রয়োজনে গৃহের পরিধি অতিক্রম করে কর্মজগতে প্রবেশ করেছিলেন। বাস্তব পরিস্থিতিকে নিজেদের ছায়াছবির মাধ্যমে দর্শক সম্মুখে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী এই তিনজন পরিচালক তৎকালীন সময়ে বাঙালী নারীদের জীবনে ঘটে যাওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকেও নিজেদের ছায়াছবিতে স্থান দিয়েছিলেন। ১৯৬০ এর দশকে এই কর্মরতা নারীদের কেন্দ্র করে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'মহানগর' (১৯৬৩) ছায়াছবিটি। এই ছায়াছবিরই কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন কর্মরতা নারীরা ও তাঁদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম। এই গবেষণাপত্রে মূলত 'মহানগর' ছায়াছবিতে প্রদর্শিত কর্মরতা নারীর সঙ্গে বাস্তবের কর্মরতা নারীদের জীবনসংগ্রামের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য যেমন তুলে ধরা হবে তেমনই আবার বিশ্বচলচ্চিত্র কিভাবে বাংলার ভিন্নস্বাদের ছায়াছবি ও এর পুরোধা সত্যজিৎ রায়কে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করা হবে এই গবেষণাপত্রে। পাশাপাশি ভেঙে পড়া আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্মরতা মহিলাদের প্রতি কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল সেই বিষয়টিও আলোচিত হবে এই গবেষণাপত্রে।

সমান্তরাল ছায়াছবি (Parallel Cinema) অথবা ব্যাতিক্রমী/ ভিন্ন স্বাদের ছায়াছবি (Alternative films) এর সংজ্ঞা

উনিশশো পঞ্চাশের দশক বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য এক যুগসন্ধিক্ষণ। কারণ এই দশকেই নিমাই ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ মননশীল পরিচালক চিরাচরিত

স্টুডিয়ো ভিত্তিক ছায়াছবি নির্মাণের পরিবর্তে আরও একটি নতুন ধারার ছায়াছবি নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই ধারার ছায়াছবিতে গ্রাম-শহরে দ্বন্দ্ব অথবা প্রেমজ সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিণতি ইত্যাদি বিষয়গুলির পরিবর্তে দেশ ও দেশবাসীর জীবনযাত্রা, জীবনসংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রদর্শিত হয়েছিল। বেঞ্জামিন ও ক্রাকুয়ের মত চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে শহুরে পথঘাট, জনজীবন ও চলচ্চিত্রের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন তা পঞ্চাশের দশকে ও বিশেষত উনিশশো ষাটের দশকের বাংলা ছায়াছবিতে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শহুরে জীবনযাত্রা, জনবহুল রাস্তাঘাট, যানবাহন ইত্যাদি এবং মননশীল পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এক বিশেষ ধরণের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছিল যেখানে নিমাই ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন প্রমুখ নিজেদের কাহিনীকে স্থাপন করেছিলেন। এখান থেকেই গড়ে উঠেছিল ভিন্ন স্বাদের ছায়াছবি/ ব্যাতিক্রমী ধারার ছায়াছবি/ 'Parallel films' অথবা 'Alternative films' এর ধারণা। 'Alternative' শব্দের অর্থ হল বিকল্প এবং Alternative films' বলতে বোঝায় - 'Cinema that breaks or at least deviates from economic cultural and political conventions in its mode of productions and representational style'[১] অপরদিকে 'Parallel films' এর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল যে এখানে অপেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয় এবং চারিত্রিক দিক থেকে এই সকল ছায়াছবিগুলি মূলত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রকৃতির হয়ে থাকে।[1২] অর্থাৎ চারিত্রিকভাবে ও সংজ্ঞাগত দিক থেকে 'Alternative films' ও 'Parallel Cinema' শব্দ দুটির মধ্যে বিশেষ ফারাক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই বিতর্ককে দূরে সরিয়ে রেখে বিচার করলে দেখা যায় এই Alternative films' অথবা 'Parallel Cinema' উভয়ই তথাকথিত বাণিজ্যিক ছায়াছবির সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমুখে অবস্থান করে। দেখা যায় বাণিজ্যিক ছায়াছবি মূলত জনপ্রিয় অভিমতকে প্রাধান্য প্রদান করে নির্মিত হত এবং সেক্ষেত্রে ছায়াছবিতে সামাজিক বিষয় তুলে ধরা হলেও কাহিনীর অভিমুখ থাকত মূলত প্রেমজ অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক, ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতির উপর। কিন্তু ভিন্ন স্বাদের ছায়াছবিতে মূলত আর্থসামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক ঘটনা ও তার পরিণামে সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়কে স্থান দেওয়া হত। ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন প্রমুখ নির্মিত ছায়াছবিও এই ধারাকেই অনুসরণ করেছিল। বেশ কিছু চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞের মতে ব্যাতিক্রমী ধারার ছায়াছবি বিভিন্ন আঞ্চলিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তবে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ স্টিফেন তাও (Stephen Tao) মনে করতেন যে ব্যাতিক্রমী ছায়াছবি আঞ্চলিক উপাদানের পাশাপাশি দেশ ও রাজ্যের সীমানাকে অতিক্রম করে একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে।[৩] অর্থাৎ এককথায় বলা যায় যে বাস্তব আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আঞ্চলিক উপাদান এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ভিন্নস্বাদের ছায়াছবি এবং সত্যজিত রায় পরিচালিত 'মহানগর' ছিল এই ধারার অন্তর্গত।

নব্যবাস্তববাদ (Neo-Realism) ও সত্যজিত রায়ের উপর এর প্রভাব

চলচ্চিত্রের প্রাথমিক ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও

লেখক পাওলো উসাই বলেছিলেন- 'Nature and social life are perceived by cinema as a sequence of events that can be remembered... the moving image is like a witness'.[৪] অপর দিকে ইতিহাসের প্রাথমিক দায়িত্ব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নথিবদ্ধকরণ ও পরবর্তীকালে সেই ইতিহাসের বিশ্লেষণ। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী তথা ইতিহাসবিদ পার্থ চ্যাটার্জী তাঁর 'Indian Cinema: Then And Now' শীর্ষক প্রবন্ধে চলচ্চিত্র ও ইতিহাসের সম্পর্ক নিরুপণ করতে গিয়ে বলেছেন- 'Cinema... is a fair indicator of a nation's psyche'।[৫] আসলে চলচ্চিত্র যেকোনো সময়ের, যেকোনো সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমাজ চেতনাকে তুলে ধরতে এবং তাকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গচ্ছিত রাখতে সক্ষম।[৬] চলচ্চিত্র তার সূচনাকাল থেকে বিনোদনের মাধ্যম হিসাবেই পরিচিত হলেও সাধারণ জনগণের চিন্তাচেতনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে এটি বিশেষভাবে সক্ষম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ চলচ্চিত্র নির্মাতাগণকে বুঝিয়েছিল 'to appreciate the richness of the real and to discover the importance of current events'.[৭] এখান থেকেই চলচ্চিত্রে জন্মগ্রহণ করেছিল নব্যবাস্তববাদ বা নিও-রিয়ালিজমের(Neo-Realism)ধারণা। 'Realism' বা বাস্তববাদ বলতে বোঝায় আদর্শবাদ (Idealism), চিরাচরিত রীতিনীতি (Conventionalism) থেকে ব্যাতিক্রমী কোন অবস্থান অথবা সাধারণ চেতনা (Conciousness) ও দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে থাকা কোন সত্য তথা বাস্তবিকতা।[৮] অর্থাৎ 'Realism' এমন একটি ধারা যা বাস্তবতাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত হয়। নব্যবাস্তববাদও এই একই পথের অনুসারী। বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ আন্দ্রে ব্রেজিনের মতে- 'Film has the special aesthetic value of bringing us into close contact with 'reality'.[৯] নান্দনিকতার পাশাপাশি সমসাময়িক বাস্তবতাকে লিপিবদ্ধ করার এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য নব্যবাস্তববাদী তত্ত্ব ছায়াছবিতে কোন প্রকার উপাখ্যানমূলক কাহিনীর স্থাপনকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নব্যবাস্তববাদ একটি চলচ্চিত্র আন্দোলন যার সূচনা হয়েছিল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে এবং এর প্রধান লক্ষ্যই ছিল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাস্তব আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রচলিত সমাজব্যাবস্থা, চিন্তাচেতনের অন্তঃসারশূন্যতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। যদিও নব্যবাস্তববাদী চেতনার প্রথম প্রকাশ চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে নয়, বরং লেখনীর জগতে ঘটেছিল উনিশশো কুড়ির দশকের শেষ পর্যায়ে এবং উনিশশো ত্রিশের দশকে। এই সময়ে ১৯৩০ সালে অর্নাল্ডো বসেল্লির (Arnaldo Bocelli) লেখনীতে প্রথম 'Neo-Realism' শব্দের প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল।[১০] প্রাক-যুদ্ধকালীন সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে যে নব্যবাস্তববাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যুদ্ধ পরবর্তীকালে তা চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে ব্যাপক আকার ধারণ করে। দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাল্পনিক জগতকে অতিক্রম করে বাস্তবের মাটিতে এসে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। যুদ্ধোত্তরকালে সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্র বিষয়ক একাধিক তত্ত্ব এবং তা দেশের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। নব্যবাস্তববাদী চেতনা এভাবে ইতালি থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখনীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। নব্যবাস্তববাদী তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে জাভাতিনি (Cesare Zavattini),

উম্বার্তো বারবারো (Umberto Barbaro), অ্যালবার্তো লাট্টুয়াডা (Alberto Lattuada) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অ্যালবার্তো লাট্টুয়াডাও মনে করতেন যে 'The cinema is unequaled for revealing all the basic truths about a nation'.[১১] তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এই চলচ্চিত্র আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল দুটি - রাজনৈতিক ও নান্দনিক এবং এই দুটি ক্ষেত্র পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত জটিলভাবে সম্পৃক্ত ছিল।[১২]

প্রাথমিক পর্যায়ে ইতালিতে নির্মিত নব্যবাস্তববাদী ছায়াছবি শুধুমাত্র যুদ্ধ, যুদ্ধপরবর্তী ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি ও দারিদ্রতার হাহাকার, রাষ্ট্রীয় পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও ১৯৫১ সাল নাগাদ নব্যবাস্তববাদী আন্দোলনে 'কাহিয়ের গোষ্ঠী'র (Cahiers Group) আগমন নব্যবাস্তববাদী চেতনায় এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করে। এই সময়কাল থেকে নব্যবাস্তববাদী চেতনার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জাভাতিনি। তিনি বলেছিলেন- 'Cinema must tell what is going on'.[১৩] এবং এটি করতে গিয়ে অর্থাৎ বাস্তব ও ছায়াছবির মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমান সেটিকে দূর করার জন্য ক্যামেরা নিয়ে নেমে আসতে হবে বাস্তবের মাটিতে, তুলে ধরতে হবে সাধারণ মানুষের বক্তব্য, তাঁদের জীবনধারাকে। তাঁর মতে নব্যবাস্তববাদী চেতনার মূল লক্ষ্যই হল বাস্তব আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মূল ছন্দকে ছায়াছবির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা।[১৪] ঠিক এই একই সময়কালে গুইদো অ্যারিস্টার্কো নামক একজন মার্ক্সবাদী চলচ্চিত্র সমালোচক নব্যবাস্তববাদী ছায়াছবি সম্পর্কে জাভাতিনির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চিরাচরিত নব্যবাস্তববাদী চেতনায় একপ্রকার অগভীরতার সন্ধান পান। তাঁর মতে ছায়াছবি শুধুমাত্র অতীত ঘটনা, বা বর্তমান পরিস্থিতিকে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যম নয়, বরং যেকোন বাস্তব ঘটনা বা পরিস্থিতির গভীরে নিহিত আর্থসামাজিক কারণগুলিকে অনুসন্ধান করার অন্যতম মাধ্যম হল চলচ্চিত্র।[১৫] এই সময়কাল থেকেই নব্যবাস্তববাদী চেতনায় একটি মার্কসবাদী ধারাও যুক্ত হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে নব্যবাস্তববাদী চেতনায় যে পৃথক পৃথক ধারার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে জাভাতিনি ও অ্যারিস্টার্কো সম্পূর্ণ দুটি বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই দুই ধারার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে একটি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ চিয়ারিনি (Chiarini) । তাঁর মতে নব্যবাস্তববাদের মূল লক্ষ্য বাস্তব পরিস্থিতিকে ক্যামেরাবন্দি করা হলেও ছায়াছবির ভাষা ও নান্দনিকতার প্রতিও সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিৎ।[১৬]

পঞ্চাশের দশকে বিশ্বচলচ্চিত্রে নব্যবাস্তববাদী তত্ব সংক্রান্ত বিতর্কে একাধিক স্তর পরিলক্ষিত হলেও এর মূল নির্যাস ছিল কিন্তু একটিই - ছায়াছবির মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতির প্রদর্শন। ভারতে ব্যাতিক্রমী ছায়াছবির অন্যতম পুরোধা সত্যজিৎ রায় এই নব্যবাস্তবাদী তত্ব ও ছায়াছবি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'কেমিয়ের' কোম্পানিতে চাকরীসূত্রে লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে তিনি সেখানে যে নিরানব্বইটি ছায়াছবি তিনি দেখেছিলেন তার মধ্যে জাভাতিনি রচিত ও ডি সিকা দ্বারা পরিচালিত ' বাইসাইকেল থিভস' (Bicycle Thieves, 1948) ছায়াছবিটিকে তিনি তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। জাভাতিনি ও নব্যবাস্তববাদ সম্পর্কে তিনি

'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি বুলেটিন' এ বলেছিলেন-

[Zavatini's] greatest assets are an acute understanding of human beings and an ability to devise the chain type of story that fits perfectly into the ninety-minute span... Simplicity of plot allows for intensive treatment, while a whole series of interesting and believable situations and characters sustain interest . . . For a popular medium, the best kind of inspiration should derive from life and have its roots in it. . . . The Indian film maker must turn to life, to reality.[১৭]

জাভাতিনির মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ছায়াছবির মুখ্য উপাদান হল ব্যক্তি মানবের জীবন।[১৮] ছায়াছবি সম্পর্কে সত্যজিত রায়ের এহেন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপর নব্যবাস্তববাদী চেতনার প্রভাবকে নির্দেশ করে। এবং তাঁর এই চেতনা পরবর্তীকালে তাঁর ছায়াছবির জন্য কাহিনী নির্বাচন ও ছায়াছবির নির্মাণগত কৌশলের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত সহজেই প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর যুগে বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, কর্মজগতে বাঙালী নারীদের আগমন

ঔপনিবেশিক যুগে যে 'আদর্শ নারী'র ধারণা গড়ে উঠেছিল সেখানে নারীর স্থান ছিল গৃহের অন্দরমহলে। এই সময় কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, হৈমবতী সেন, চন্দ্রমুখী বসু, অবলা বসু প্রমুখ বিদুষী নারীগণ শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। ১৯৩১ সালের আদামসুমারি অনুযায়ী দেখা যায় কলকাতায় মোট মহিলা জনসংখ্যার মাত্র ৯.০৩% মহিলা পেশা ও মুক্ত শিল্পচর্চার (Profession and Liberal Arts) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেখানেই আর্থিক অনুৎপাদনশীলতা (Unproductive) নারীদের মধ্যে ছিল সর্বাধিক - ৫৭.৩৪%।[১৯] এর একটি কারণ যদি হয়ে থাকে নারীদের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প শিক্ষার হার (১৯৩১ এর আদামসুমারি অনুযায়ী প্রতি ১০০০০ জন মহিলার মধ্যে মাত্র ১২১৩জন মহিলা স্বাক্ষর ছিলেন),[২০] তাহলে অপর কারণটি অবশ্যই ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অতিরক্ষণশীল মানসিকতা।[২১] কিন্তু দেশভাগ ও স্বাধীনতা এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে এবং এই প্রথম নারীরা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল দুটি - প্রথমত, নারীশিক্ষার অগ্রগতি ও দ্বিতীয়ত তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থা। দেখা যায় ১৯৫০ সালে প্রকাশিত 'ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন রিপোর্ট'এ (১৯৪৮-৪৯) ভারতীয় ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যাবস্থাকে নতুনভাবে যুগোপযোগী হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়।[২২] পাশাপাশি ভারতীয় সমাজে নারীশিক্ষার করুণ অবস্থার কথা স্বীকার করে নারীপুরুষের শিক্ষাক্ষেত্রে সমানাধিকারের পক্ষেও সওয়াল করা হয়।[২৩] আবার ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল কমিটি অন উইমেন'স এডুকেশন' রিপোর্টে নারীশিক্ষা ও তার অগ্রগতিকে রাষ্ট্রের তরফে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছিল।[২৪] পাশাপাশি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতেও নারীশিক্ষার অগ্রগতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। যদিও এই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীশিক্ষার অগ্রগতি আদৌ

কতটা সম্ভবপর হয়েছিল সেই বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও সরকারী তরফে নীতিগতভাবে নারীশিক্ষার অগ্রগতির উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল এই সময়ে। তবে যে বিষয়টি এই সময়ে মহিলাদের কর্মজগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হল দেশভাগের ফলে বাংলার আর্থিক দুরাবস্থা। দেশভাগের ফলে বাংলার আর্থিক সঙ্গতি বহুলাংশে হ্রাস পায়। পাশাপাশি ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কর্মহীনতা, খাদ্যসংকট ইত্যাদি স্বাধীনোত্তর যুগে কর্মজগতের উপর পুরুষদের একছত্র আধিপত্যকে বহুলাংশে খর্ব করে গৃহের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ মহিলাদের বাধ্য করেছিল পারিবারিক আর্থিক প্রয়োজনে কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত হতে। পারিবারিক আর্থিক প্রয়োজন ছাড়া অপর যে বিষয়টি মহিলাদের কর্মজগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছিল তা হল স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত সমানাধিকার।[২৫] ভারতীয় সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি বিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময় থেকেই আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনোত্তর যুগে সমানাধিকার স্থাপিত হলে তার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের উপর অনুভূত হয়। পূর্বে ভারতীয় নারীগণ শুধুমাত্র শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সঙ্গেই যুক্ত হলেও স্বাধীনোত্তরকালে নারীপুরুষের সমানাধিকার প্রাপ্তির ফলে মহিলাদের পক্ষে বেসরকারি কর্মক্ষেত্রেও প্রবেশ করা সহজতর হয়। বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রবেশ ঐ ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক একাধিপত্যকে খর্ব করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[২৬]

সরকারী প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকরী ছাড়া যেসকল বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেগুলি হল- কেরানীমূলক পেশা, টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার, টেলিফোন অপরেটার, বিজ্ঞাপন সংস্থা, চাহিদা সংক্রান্ত বাজার সমীক্ষা, ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত পেশা, জনসংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।[২৭] ডি.আর.গ্যাডগিল ১৯৬৫ সালে 'Women in the Working Force in India' শীর্ষক বক্তৃতায় (এটি পরবর্তীকালে গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়) কলকাতা ও বোম্বাই শহরে স্বাধীনোত্তর যুগে মহিলাদের যে তেরোটি পেশায় সংযুক্ত হওয়ার কথা বলেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল- শিক্ষামূলক পেশা, চিকিৎসা ও নার্সিং সংক্রান্ত পেশা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারি অফিসের কেরানী, টাইপিস্ট ও স্টেনোগ্রাফার, টেলিফোন অপারেটর, বিভিন্ন ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত পেশা।[২৮] ১৯৬১ সালের আদামসুমারি অনুযায়ী দেখা যায় শিক্ষামূলক পেশায় ৭৫৬৯ জন, নার্সিং সংক্রান্ত পেশায় ৪৬৬৯ জন মহিলা, কেরানীমূলক পেশার সঙ্গে ৫০৫৯ জন মহিলা, টাইপিস্ট ও স্টেনোগ্রাফার হিসাবে ১৭৫১ জন মহিলা ও ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত পেশায় ১২০০ জন মহিলা যুক্ত ছিলেন।[২৯] ১৯৬২ সালের 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' এর বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ীও ঐ বছর বাংলায় মোট ২১৪৪২জন মহিলা কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে ৯৪৭৩ জন বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং ১১৯৬৯ জন মহিলা সরকারী চাকুরীরতা ছিলেন।[৩০] অর্থাৎ স্বাধীনোত্তরকালে বাংলায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু পেশায় মহিলাদের উপস্থিতি একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর যুগে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা সরকারী বেসরকারি কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেও তাঁদের অধিকাংশই সাধারণ, নিম্নতর পদগুলিতে নিযুক্ত হতেন। ১৯৬০এর দশকে 'Directorate General

of Employment and Training' একটি সমীক্ষা মারফৎ দেখায় যে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্নাতকস্তরের ডিগ্রীপ্রাপ্ত মহিলারা সাধারণ কেরানীমূলক পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৩১] অনুরূপ সমীক্ষা বেসরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত মহিলাদের উপর করা হলে দেখা যায় সেখানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলারা অর্থাৎ $^{৩}/_{৪}$ শতাংশ মহিলারা সেই নিম্নতর পেশাগুলির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন এবং সেক্ষেত্রেও মহিলাদের কর্মদক্ষতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।[৩২] অনেকক্ষেত্রেই বেসরকারি সংস্থাগুলি মহিলাকর্মী নিয়োগ, অথবা তাঁদের পদোন্নতি ঘটানোর মত বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকতেন। শিক্ষামূলক পেশার ক্ষেত্রেও দেখা যায় নারীরা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রদানের সঙ্গেই অধিকাংশক্ষেত্রে যুক্ত থাকতেন। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুরুষদের একাধিপত্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় ছিল। এক্ষেত্রে নীরা দেসাই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করেন যেখানে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিবাহিতা নারীদের কলেজে শিক্ষিকারূপে নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।[৩৩] এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি ছিল যে বিবাহিতা মহিলারা কর্মজগত ও ব্যাক্তিগত জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে অক্ষম এবং তাই তাঁদের পক্ষে কর্মক্ষেত্রে অখণ্ড মনঃসংযোগ প্রদান করা সম্ভবপর নয়। সংবিধানে সমানাধিকার প্রদান করার পরেও কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ হিসাবে ভারতীয় শিক্ষাব্যাবস্থা, প্রশিক্ষণ ব্যাবস্থা, কর্মব্যাবস্থা, ভারতীয় রক্ষণশীল ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও মানসিকতার সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক বিশেষ ব্যাবস্থাকে দায়ী করা যায়।[৩৪] তবে শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রেই নয়, কর্মরতা নারীরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত জীবনেও আর্থিক ও মানসিকভাবে শোষিত হয়েছিলেন। 'Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India' শীর্ষক সরকারী রিপোর্টে বলা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে কর্মরতা নারীরা পরিবারের আর্থিক মেরুদণ্ড হওয়ায় পরিবারের স্বার্থে তাঁদের বিবাহে বিলম্ব অথবা বিবাহ স্থগিত হওয়ার মত ঘটনাও ঘটে ছিল।[৩৫] অর্থাৎ কর্মরতা নারীরা কর্মজগত ও ব্যাক্তিগত জীবন উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক, মানসিকভাবে শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন।

'মহানগর' ছায়াছবিতে প্রদর্শিত নারী চরিত্রের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' অবলম্বনে নির্মিত 'মহানগর' ছায়াছবির কাহিনী আবর্তিত হয় দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে অবস্থিত একটি অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ আরতি ও তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র করে। পরিবারে তাঁর স্বামী সুবোধ, পুত্র সন্তান পিন্টু ও এক কিশোরী ননদ ছিলেন। কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গের পাবনা শহর থেকে তাঁর শ্বশুর শাশুড়ি এসে কলকাতায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হন। আরতি একজন সাধারণ গৃহবধূ এবং তাঁর স্বামী সুবোধ একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী। দেশভাগ পরবর্তী বাংলার কঠিন আর্থিক পরিস্থিতিতে সাংসারিক জীবনকে সচল রাখতে আরতি বাধ্য হন কর্মজগতে প্রবেশ করতে। জাতীয়তাবাদী চেতনার যুগে যেভাবে আলোকপ্রাপ্ত পুরুষগণ নারীদের কুসংস্কারের নিগড় থেকে মুক্ত করে তাঁদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন ঠিক তেমনই এই ছায়াছবিতেও প্রাথমিক পর্যায়ে সুবোধ গৃহবধূ আরতিকে গৃহের পরিধি অতিক্রম করতে সাহায্য করেন।

সংবাদপত্রে ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত পেশায় (Sales girl) মহিলা কর্মীর নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনিই আরতিকে ঐ চাকরীর জন্য আবেদনপত্র প্রেরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কর্মজগতে প্রবেশ পারিবারিকক্ষেত্রে অসন্তোষের সৃষ্টি করলেও সুবোধ আরতিকে সেই সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সহায়তা করেন। কিন্তু কর্মরতা আরতি ক্রমেই সুবোধের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজের স্বাধীনস্বত্তায় পদার্পণ করলে সুবোধের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি আরতিকে চাকরী ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেন। আরতি স্বামীর নির্দেশ মেনে নিজের ইস্তফাপত্র তাঁর ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ মিঃ হিমাংশু মুখার্জির কাছে জমা করার প্রাককালে সুবোধ টেলিফোন মারফৎ আরতিকে তাঁদের ব্যাঙ্ক অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুঃসংবাদটি জানায় এবং একই সঙ্গে পারিবারিক ব্যায়ভার বহনের উদ্দেশ্যে আরতিকে নিজের চাকরী থেকে ইস্তফা দিতেও নিষেধ করেন। কিন্তু তা স্বত্বেও কর্মক্ষেত্রে আরতির একাগ্রতা, অগ্রগতি, তাঁর স্বাধীনস্বত্তা সুবোধের অন্তরে যে ঈর্ষার সৃষ্টি করে তা উভয়ের সম্পর্কে একপ্রকার দূরত্ব ও শীতলতার সৃষ্টি করেছিল। ছায়াছবিতে দেখা যায় আরতির ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ মিঃ হিমাংশু মুখার্জীর মনের গহীনে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর প্রতি যে প্রবল বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কর্মক্ষেত্রে। কর্মক্ষেত্রে আরতির ঘনিষ্ট সহকর্মী ও বন্ধু এডিথ সিমনের অসুস্থতার সুযোগে মিঃ হিমাংশু মুখার্জি তাঁকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলে আরতি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং প্রতিবাদের ভাষা স্বরূপ নিজের চাকরী থেকেও ইস্থফা প্রদান করে। ছায়াছবির অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায় প্রাথমিক উত্তেজনার বশে চাকরী থেকে ইস্থফা দিলেও ক্রমেই তিনি নিজের পরিবারের কথা স্মরণ করে ভীত হয়ে পড়েন। ঠিক এই মুহূর্তে এগিয়ে আসেন সুবোধ। তিনি আরতিকে আস্বস্ত করে বলেন যে ভয়ের কিছু নেই, তাঁদের দুজনেরই আবার কর্মসংস্থান ঘটবে। দেখা যায় কর্মরতা আরতির স্বাধীনস্বত্তা সুবোধের মধ্যে যে ঈর্ষা তথা নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল তা আরতির কর্মহীন হয়ে পরায় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। উভয়ই এগিয়ে চলেন এক ইতিবাচক ভবিষ্যতের পথে এবং এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

‘মহানগর’ ছায়াছবিতে সত্যজিত রায় সমসাময়িক আর্থসামাজিক অবস্থা তুলে ধরার পাশাপাশি পুরুষতন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হীনমন্যতা, ঈর্ষা, নিরাপত্তাহীনতার এক বিশেষ দিকটিকেও ছায়াছবির পর্দায় তুলে ধরেছিলেন- আরতির পরিবার বিশেষত তাঁর স্বামী সুবোধের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। ব্যাঙ্ক কর্মচারী সুবোধকে আপাতদৃষ্টিতে একজন শিক্ষিত, প্রগতিশীল পুরুষ বলে ধারণা হলেও তিনিও রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই একজন প্রতিনিধি ছিলেন। পারিবারিক আর্থিক প্রয়োজনে তিনি স্ত্রীকে কর্মজগতে প্রবেশের পরামর্শ দিলেও গৃহবধূ আরতির ন্যায় কর্মরতা আরতির জীবনকেও তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিলেন। আরতি কর্মক্ষেত্রে নিজের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার মাধ্যমে ক্রমেই স্বীকৃতি লাভ করতে থাকেন এবং সেটি তাঁর মধ্যে একপ্রকার আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ছায়াছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় আরতি নিজের প্রথম বেতন হাতে পেয়ে অফিসের সাজঘরে(washroom) আয়নার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের উপার্জিত অর্থ প্রথম নিজেকে দেখিয়েছিলেন। নিজের প্রথম বেতন থেকে পরিবারের সকল সদস্যের জন্য উপহার নিয়ে এলে সুবোধ কিছুটা বিরক্ত হন কারণ

আরতি তাঁর পরামর্শ ছাড়া এই প্রথম কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন - নিজের উপার্জন থেকে স্বাধীনভাবে অর্থ ব্যায় করেছিলেন। ছায়াছবির অপর এক দৃশ্যে দেখা যায় প্রবল গ্রীষ্মের দাবদাহে অফিস থেকে ফিরে এসে আরতি পরবর্তী দুই তিন মাসের মধ্যে তাঁদের ঘরে একটি বৈদ্যুতিন পাখা লাগানোর কথা বলায় প্রত্যুত্তরে সুবোধ ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলেন- 'যে হারে কমিশন পাচ্ছ তাতে ঘরে পাখা কেন এয়ার কন্ডিশানারও হতে পারে'। দেখা যায় আরতি যখন তাঁর স্বামীকে অফিসের বিভিন্ন ঘটনা গল্পাকারে বলেছিলেন তখন সুবোধের মুখের অভিব্যাক্তি ক্রমেই পরিবর্তিত হতে থাকে, তিনি অত্যন্ত নিষ্প্রভ কণ্ঠে আরতিকে বলেন যে সাম্প্রতিককালে তাঁর আরতিকে 'একটু অচেনা অচেনা' লাগে। যদিও আরতি তাঁকে আস্বস্ত করে বলেন যে তাঁর প্রাথমিক পরিচিতি তিনি একজন গৃহবধূ এবং এই পরিচয়ই তাঁর কাছে প্রাধান্যলাভ করে। তবুও সুবোধের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।

আরতি এবং সুবোধের বৈবাহিক জীবনে সংঘটিত এই তিনটি ঘটনার মূল ভরকেন্দ্রই ছিল একটি - কর্মজীবনে প্রবেশর পরবর্তী সময়ে আরতির মধ্যে গড়ে ওঠা আত্মবিশ্বাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, স্বতন্ত্র ব্যাক্তিত্বের প্রকাশ এবং সেটিকে কেন্দ্র করে সুবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিরক্তি, ঈর্ষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হওয়া অদ্ভুত মানসিক পরিস্থিতি। সুবোধের এই মানসিক অবস্থা উভয়ের সম্পর্কে এক বিশেষ জটিলতাকে বহন করে নিয়ে আসে। স্ট্যানলি জয়া কুমার তাঁর 'Changing Directions in the Status and Role of Women in India' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বিবাহিতা রমণীদের কর্মজগতে প্রবেশ কিন্তু কর্মরতা নারীদের বৈবাহিক সম্পর্কে অবনতির কারণ নয়।[৩৬] বরং অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহিতা নারীগণ পারিবারিক আর্থিক প্রয়োজনেই স্বামীদের উদ্যোগেই কর্মজগতে প্রবেশ করেন। কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশের পর নারীদের দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু সাধারণ পরিবর্তন ঘটে, যেমন- সরকারী বেসরকারি সকল পেশাতেই কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে এবং ঐ সময়কালের জন্য নারীরা গৃহস্থালিতে সময় দিতে পারেন না। পাশাপাশি তাঁদের বেশভূষার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। কর্মরতা নারীদের মধ্যে গড়ে ওঠা আত্মবিশ্বাস ও ব্যাক্তিত্বের প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলি রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্রের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এর ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মরতা নারীদের বৈবাহিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে।[৩৭] আসলে আত্মবিশ্বাসী, ব্যাক্তিত্বসম্পন্না নারী তাঁর জীবনের সকল সিদ্ধান্তের জন্য আর পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকেন না। অথচ রক্ষণশীল ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী একজন ভারতীয় নারী আজীবনই পুরুষের উপর অর্থাৎ তাঁর পিতা, ভ্রাতা, স্বামী অথবা পুত্রের উপর নির্ভরশীল থাকেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় যে 'আদর্শ ভারতীয় নারী' ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানেও ভারতীয় নারী শিক্ষাদীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক গুণাবলীতে আধুনিকা হওয়া স্বত্বেও চারিত্রিকভাবে পাশ্চাত্যের আধুনিকা নারীর থেকে ভিন্ন ছিলেন। ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গড়ে ওঠা এই আদর্শ ভারতীয় নারীর যে ধারণা তার শিকড় প্রোথিত ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্যের গভীরে। দেশভাগ ও স্বাধীনতার ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট এই চিন্তাচেতনের উপর একটি বাহ্যিক আঘাত হানলেও এর ভীতকে কোনভাবেই দুর্বল করতে পারেনি। কারণ আদর্শগত ক্ষেত্রে প্রাকস্বাধীনতাকালীন

সময়কাল থেকেই পুরাতন, রক্ষণশীল চেতনা সমাজের সিংহভাগ অংশে বজায় ছিল এবং স্বাধীনোত্তর যুগে আধুনিকতার মোড়কে (সরকারী শিক্ষা নীতি, কর্মসংস্থান নীতি, নারীকল্যাণ সংক্রান্ত প্রকল্প ; সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র যেমন- সাহিত্য, ম্যাগাজিন, ছায়াছবি, রেডিও প্রোগ্রাম ইত্যাদি) আবার ঐ সকল রক্ষণশীল চেতনাকেই সমাজের সর্বত্র, সাধারণ জনগণের চিন্তাচেতনায় পুনরায় ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাবস্থা করে সমাজের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকেই শক্ত করা হয়েছিল।[৩৮] স্বাধীনোত্তর যুগে নতুন আর্থসামাজিক অবস্থার সৃষ্টি এবং পুরাতন আদর্শ ঐতিহ্যের যুগপৎ অবস্থান সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজে এক দ্বন্দ্ব, বিহ্বলতার সৃষ্টি করে। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনই কিছু ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনশীল থেকে যায়। উভয়ের এই দ্বৈত অবস্থান ভারতীয় সমাজে কর্মরতা নারীদের অবস্থাকে এক বিশেষ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করে তোলে।[৩৯] আর এর ফলেই পারিবারিক আর্থিক প্রয়োজনে আরতির কর্মজগতে প্রবেশকে সুবোধ উৎসাহ প্রদান করলেও বহির্জগতে পদার্পণ ও আর্থিক উপার্জনের ফলে আরতির মধ্যে যে সাধারণ পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছিল সেগুলিকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। এর থেকেই তাঁর সৃষ্টি হয় ঈর্ষা, নিরাপত্তাহীনতার মত বিষয়গুলির যা তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছিল।

‘মহানগর’ ছায়াছবিটি কিন্তু ভারতীয় রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যাবস্থার দ্বিচারিতা, কপটতাকেও (Hypocrisy) তুলে ধরেছিল। গৃহবধূ আরতির জীবনের সকল ঘটনা ও সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রক সুবোধ যখন উপলব্ধি করেন যে তাঁর সেই ক্ষমতা অস্তমিত তখনই তিনি আরতির উপর চাকরী থেকে ইস্তফা প্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। সুবোধের কথায় স্তম্ভিত আরতি সুবোধকে সরাসরি প্রশ্ন করেন ‘আমি এত ভালো চাকরী করছি তোমার ভালো লাগছে না বুঝি’? নিজের ঈর্ষা, হীনমন্যতাকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রেখে তিনি যুক্তি স্বরূপ আরতিকে পারিবারিক অসন্তোষ, আরতির শারীরিক অবস্থার অবনতি, সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন ইত্যাদির কথা বলেছিলেন। দেখা যায়, নারীদের কর্মজীবনে অগ্রগতির একটি প্রধান অন্তরায় হল সাংসারিক দায়দায়িত্ব এবং সুবোধ ছায়াছবিতে এই বিষয়টিকেই অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যাবহার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে যে আধুনিক শিক্ষা, ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র ইত্যাদির ধারণা ভারতীয় সমাজে গড়ে উঠেছিল তার প্রতি ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। কারণ এগুলিকে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার অনুসারী হিসাবে গণ্য করা হয়। স্বাধীনোত্তর যুগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও এই আকর্ষণ সমানভাবে বজায় ছিল। কিন্তু মারিয়া মাইস তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতীয় শিক্ষিত পুরুষ আপাতভাবে নিজেদের প্রগতিশীল হিসাবে প্রমাণ করার জন্য প্রগতিশীল ধারা ও মতাদর্শের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখলেও অথবা মতামতকে সমর্থন করলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রকৃত চিন্তাধারা ও মতাদর্শের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।[৪০] অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের মধ্যে প্রগতিশীল মানসিকতা বাহ্যিক রূপে প্রযুক্ত হয়েছিল। এই ছায়াছবিতে সুবোধের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনাই ঘটে। কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় আরতির পক্ষে তাঁর স্বামীর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করা খুব একটা কঠিন

বিষয় ছিল না এবং তাই তিনি সুবোধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মানসিকতাটি উপলব্ধি করতে পারেন। সুবোধ নিজ উদ্যোগে আরতির ইস্তফাপত্র লিখে নিয়ে এসে তাঁকে বলেন যে- 'চাকরী পাওয়াটা কঠিন, ছাড়াটা নয়। একটা চিঠির ব্যাপার'। যে সুবোধ আরতির স্বাধীন স্বত্তাকে গ্রহণ করতে না পেরে বিভিন্ন অজুহাতে চাকরী থেকে ইস্তফা প্রদানের জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই আবার আকস্মিকভাবে নিজের চাকরী হারিয়ে আরতিকে টেলিফোন মারফৎ ইস্তফাপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করতে নিষেধ করেন। দেখা যায়, পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ও আদর্শের ধারকবাহক সুবোধের জননী যিনি আরতি চাকরী গ্রহণ করায় অশ্রুপাত করেছিলেন তিনিই আবার আরতি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য প্রতিভাত হওয়ার পরে আরতির শরীর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তাঁকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।

স্বামীর চাকরী হারানোর খবরে বিচলিত আরতি তাঁর প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মিঃ হিমাংশু মুখার্জীর কাছে নিজের বেতন বাড়ানোর জন্য আবেদন জানান এবং তিনি সফলও হন। কিন্তু আরতির এই সাফল্য, বেতন বৃদ্ধি সুবোধকে আরও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। দেখা যায় স্বাধীনোত্তর যুগে বাস্তবিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নবীন প্রজন্ম স্ত্রীদের কর্মজীবনে প্রবেশকে সমর্থন করলেও তাঁদের বেতন বৃদ্ধি, কর্মজীবনে উন্নতির মত বিষয়গুলিকে কখনই গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ অধিকাংশ পুরুষই মনে করেন যে স্ত্রীর অতিরিক্ত উপার্জন তাঁদের মধ্যে একপ্রকার গর্ব ও অহংকারের সৃষ্টি করবে এবং এর ফলে তাঁদের মধ্যে স্বামীর প্রতি উপেক্ষা, অবহেলার মানসিকতা গড়ে উঠবে।[৪১] এই চিন্তাচেতনা থেকেই সুবোধ আরতির উদ্দেশ্যে অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক কণ্ঠে বলে ওঠেন - ' স্ত্রীর পৌষ মাস, স্বামীর সর্বনাশ'। সুবোধের মনে আরতির কর্মদক্ষতার প্রতি শুধুমাত্র ঈর্ষারই জন্ম দেয়নি পাশাপাশি আরতির প্রতি একপ্রকার সন্দেহপ্রবণতারও সৃষ্টি করেছিল এবং এটি তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্কের দুরত্বকেই বৃদ্ধি করে। নারীবাদের একটি ধারায় (Radical feminism) বলা হয় যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নারীরা পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছেন এবং নিজেদের স্থান ও সমানাধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এর পরিবর্তে অন্যকোন ক্ষেত্রে নারীগণ সেই একই পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন - অর্থাৎ পিতৃতন্ত্র কোন না কোন ভাবে সমাজের উপর তার একছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।[৪২] ভারতীয় সমাজে নারীরা কোন আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার লাভ করেননি। বরং আলোকপ্রাপ্ত পুরুষগণ ও ভারতীয় শাসনব্যাবস্থা তাঁদের নিয়ন্ত্রিত অধিকার প্রদান করেছিল। স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ভারতীয় নারীরা স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই অধিকার যাতে নারীদের পুরোদস্তুর স্বাধীনতা প্রদান করতে না পারে এবং নারীদের উপর যাতে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে সেই জন্য কর্মরতা নারীদের উপর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায়, পারিবারিক দায়দায়িত্বকে অগ্রাধিকার প্রদান করার মত বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। পুরুষতন্ত্র প্রদত্ত এই সকল মাপকাঠি প্রকৃতপক্ষে নারীদের অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কৌশল মাত্র। তাই কর্মরতা মহিলাদের সঙ্গে তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের মেলামেশা

অথবা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনই সুনজরে দেখে নি। 'মহানগর' ছায়াছবিতে আরতিকে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মিঃ হিমাংশু মুখার্জীর গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া ঘটনা নারীদের সেই বিশুদ্ধতা রক্ষায় পুরুষতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত শর্তকেই লঙ্ঘন করেছিল।

ভারতীয় রক্ষণশীল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে নারীদের সমাজের দুর্বল, অসহায়, বিশৃঙ্খল অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাই তাঁদের জীবনকে গঠনমূলক আকার প্রদানের জন্য পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক হিসাবে গণ্য করা হয়। শৈশবকাল থেকেই দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে জীবনযাপনের শিক্ষাকে নারীদের চিন্তাচেতনার মধ্যে প্রবেশ করানো উদ্যোগ গ্রহণ করানো হয়- অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের সামাজিকীকরণ (Socialization) ঘটে।[৪৩] এখান থেকেই 'আদর্শ স্ত্রী', 'আদর্শ জননী'র ধারণা আরও মজবুত ভীত লাভ করে। 'মহানগর' ছায়াছবিতে দেখা যায় আরতির কর্মজীবন ও মাতৃত্বের মধ্যে প্রবল সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং সেটি আরতির মধ্যে একপ্রকার বিষণ্ণতা ও অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছিল। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এতটাই শক্তিশালী যে একজন নারীর কাছেও তাঁর ব্যক্তিস্বত্তার থেকে তাঁর মাতৃস্বত্তাই অধিক গুরুত্ব লাভ করে। মাতৃত্বকে গৌরবান্বিত করার মধ্যে দিয়ে নারীদের স্থান ও অধিকারের ক্ষেত্রকে সীমিত করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণেরই একটি নামান্তর মাত্র।[৪৪] এর মাধ্যমে পুরুষ সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয় এবং নারীর অস্তিত্ব ও পরিচিতি শুধুমাত্র তাঁর সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

উপসংহার-

মহানগর' ছায়াছবির আরতি কিন্তু পরিস্থিতির কাছে অসহায় একজন নারী নন। গৃহবধূ থেকে কর্মরতা নারী হিসাবে উত্তরণের যাত্রায় আরতি অর্জন করেছিলেন প্রবল আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা। এই আত্মবিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করে তিনি একদিকে যেমন তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মিঃ হিমাংশু মুখার্জীর সঙ্গে নিজের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে যেমন দরকষাকষি করেছিলেন তেমনই তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা এডিথকে মিঃ মুখার্জী অন্যায়ভাবে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে মিঃ হিমাংশু মুখার্জীকে এডিথের কাছে ক্ষমা চাইতেও বলেন। কিন্তু মিঃ মুখার্জী তাতে অসম্মতি জানালে তিনি চাকরী ছেড়ে দেওয়ার মত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই দুটি ঘটনা প্রমান করে যে আরতি জীবনের কিছু ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উর্ধে উঠে প্রকৃত স্বাবলম্বী, আধুনিকা নারীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে সেখানে নারীরা প্রতিনিয়তই বিভিন্নভাবে শোষিতা, নির্যাতিতা, নিপীড়িতা হয়ে থাকেন। ভারতে স্বাধীনোত্তর যুগে কর্মরতা নারীদের উপর হওয়া নিপীড়নের স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women' শীর্ষক সরকারী রিপোর্টে।[৪৫] আবার কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা হেনস্থা হওয়ার ঘটনার কথা তুলে ধরেছিলেন পি. আনদিয়াপ্পান তাঁর গ্রন্থে।[৪৬] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

নারীরা এই সকল অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু ১৯৬০এর দশকে নির্মিত এই আরতি চরিত্রটি ব্যাতিক্রম। ভারতীয় সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতীয় সমাজে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য ঘটানো নিষিদ্ধ। কিন্তু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারীদের প্রতি মিঃ হিমাংশু মুখার্জী হৃদয়ে যে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ছিল তার দ্বারা চালিত হয়ে অন্যায় অজুহাতে এডিথকে চাকরী থেকে বহিষ্কার করেন। একজন নারী হিসাবে আরতি অপর একটি নারী এডিথের উপর হওয়া এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতীয় সংবিধানে নারীদের জন্য স্বীকৃত সমানাধিকার সহ বিভিন্ন অধিকারের বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকেই যায় যে ১৯৬০এর দশকে বাস্তবধর্মী ছায়াছবি নির্মাণের সংখ্যাগরিষ্ঠ কারিগর যখন কর্মরতা নারীদের জীবনসংগ্রাম, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রকে ছায়াছবির পর্দায় তুলে ধরেছিলেন সেখানে সত্যজিত রায় কেন বলিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী এক নারী চরিত্রকে (আরতি) ছায়াছবির পর্দায় তুলে ধরেছিলেন? এর একটি কারণ হিসাবে বলা যায় কলকাতার বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান সত্যজিত রায়কে দেশভাগ ও তার অভিঘাত সেই অর্থে সরাসরি স্পর্শ করেনি। পাশাপাশি বলা যায় তাঁর চলচ্চিত্র জগতে যখন যাত্রা শুরু হয় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর হাত ধরে প্রগতিশীল, আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল। নেহেরুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা উদারনৈতিক মানবতাবাদ (Liberal Humanism)।[৪৭] তিনি ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সত্যজিত রায় তাঁর মত এই আধুনিক, উদারনৈতিক, মানবতাবাদী আদর্শেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে নেহেরু স্বাধীনোত্তরকালে রাষ্ট্রগঠনের যে মহাযজ্ঞে রত হয়েছিলেন সেই ইতিবাচক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিই সত্যজিৎ রায়ের প্রাথমিক পর্যায়ের (১৯৫৫ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে নির্মিত ছায়াছবি) বেশ কিছু ছায়াছবিতে স্থানলাভ করেছিল।[৪৮] তাই দেখা যায় 'মহানগর' ছায়াছবির আরতি কিন্তু 'মেঘে ঢাকা তারা' ছায়াছবির নিতা চরিত্রটির থেকে পৃথক ও বলিষ্ঠ একটি নারী চরিত্র। কিন্তু তিনিও রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক বন্ধনের নিগড় থেকে মুক্ত ছিলেন না। কারণ সুবোধের অন্তরে তাঁর প্রতি যে ঈর্ষা, সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার একমাত্র অবসান ঘটে যখন তিনি চাকরী থেকে ইস্তফা দেন। অর্থাৎ আধুনিকা, কর্মরতা নারীর তকমা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরেই তাঁর ও সুবোধের বৈবাহিক সম্পর্কে সকল দূরত্বের অবসান ঘটে।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১ Manas Ghosh, 'Alternative Cinema: Response of Indian Film Studies', Journal of Moving Image, Jadavpur University: Department of Film Studies, 2011, p. 51

২ 'A Beginner's Guide to Parallel Cinema: The Indian New Wave', Cinema Waves, https://cinemawavesblog.com/movements/parallel-cinema/ , accessed on 06.02.2025, 17:35 pm

৩ Manas Ghosh, 'Alternative Cinema: Response of Indian Film Studies' in

Journal of Moving Image, No.10, Jadavpur University: Department of Film Studies, 2011, p. 59

৪ Paolo Cherechi Usai, The Death of Cinema: History, Cultural Memory and the Dark Age, London: British Film Institute, 2001, p.31

৫ Partha Chatterjee, 'Indian Cinema: Then and Now', Indian International Centre Quarterly, Vol. 39, No. 2, AUTUMN 2012, p. 45, Stable URL : http://www.jstor.org/stable/41804044, Accessed on : 04-2-2024, 06:53 UTC

৬ S.Theodore Bhaskaran , History Through the Lens: Perspectives On South Indian Cinema , Hyderabad: Orient Blackswan, 2009, pp.17-18

৭ Francesco Casetti THEORIES OF CINEMA: 1945-1995 , trans. Francesca Chiostri, Elizabeth Gard Bartolini-Salimbeni, Thomas Kelso, Austin: University of Texas Press, 1999, p. 25

৮ Christopher Wagstaff, Italian Neorealist Cinema: An Aesthetic Approach, Toronto: University of Toronto Press, 2007, p.42

৯ ibid, p. 52

১০ Ben Lawton, 'Italian Neorealism: A Mirror Construction of Reality', Film Criticism , Winter, 1979, Vol. 3, No. 2, Italian Neorealism , Winter, 1979, p.9 , Stable URL: https://www.jstor.org/stable/44018624 , accessed on - 12 Mar 2024 09:50 pm

১১ ibid,

১২ Geoffrey Nowell-Smith, 'The Second Life of Italian Neo-realism', Journal of Moving Image, No. 12, Jadavpur University: Department of Film Studies, 2014, p. 47

১৩ Cinema and the Real' in Francesco Casetti THEORIES OF CINEMA: 1945-1995 , trans. Francesca Chiostri, Elizabeth Gard Bartolini-Salimbeni, Thomas Kelso, 1999, p. 26

১৪ ibid, p. 50

১৫ Geoffrey Nowell-Smith, 'The Second Life of Italian Neo-realism', Journal of Moving Image, No. 12, Jadavpur University: Department of Film Studies, 2014, p.p. 50

১৬ Cinema and the Real' in Francesco Casetti THEORIES OF CINEMA: 1945-1995 , trans. Francesca Chiostri, Elizabeth Gard Bartolini-Salimbeni, Thomas Kelso, Austin: University of Texas Press, 1999, p. 29

১৭ Andrew Robinson, Satyajit Ray: The Inner Eye, London: I.B. TAURIS, 1989, p. 72

১৮ ibid, p.24

১৯ Census of India, 1931, VOLUME VI, CALCUTTA PARTS I & II, 'STATEMENT No. V-2, Numbers of workers in each occupational sub-

class with percentage on total population and percentage of workers who are females in Calcutta with suburbs in 24-Parganas and Howrah, 1921 and 1931' (Calcutta: Central Publication Branch), 1933, p.51

২০ Census of India, 1931, VOLUME VI, CALCUTTA PARTS I & II, 'STATEMENT No. VI-2. Distribution by age and literacy of 10,000 of the population of each sex', Calcutta: Central Publication Branch, 1933, p. 75

২১ Jasodhara Bagchi, 'Women in Calcutta: After Independence', in Sukanta Chowdhury ed. Calcutta: The Living City, Volume II: The Present and Future, Calcutta: Oxford University Press, 1990, p.43

২২ The Report of the University Education Comission, (December 1948-August 1949), Volume II, (Ministry of Education, Government of India, 1950), pp. 28-29

২৩ ibid, pp. 343-344

২৪ Report of the National Committee on Women's Education (May 1958-January 1959), Ministry of Education, Government of India, 1959, pp. 192-225

২৫ Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, New Delhi: Ministry of Education and Social Welfare, Department of Social Welfare, Government of India, 1974, p. 201

২৬ ibid,

২৭ ibid, p. 203

২৮ D.R.Gadgil, Women in the Working Force in India, New Delhi: ASIA PUBLISHING HOUSE, 1965, PP. 19-20

২৯ CENSUS 1961, WEST BENGAL DISTRICT CENSUS HANDBOOK, CALCUTTA, VoL II,Table B-V-Occupational Classification by Sex of Persons at Work Other Than Cultivation', Deputy Superintendent of Census Operations, West Bengal, Government of West Bengal Publication, 1961, pp. 165-167

৩০ Calcutta Employment Market Report for the Year 1962, Annual Report No. Cal/62, Directorate of National Employment Service, West Bengal, 1962, p.6

৩১ Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, New Delhi: Ministry of Education and Social Welfare, Department of Social Welfare, Government of India, 1974, p.209

৩২ ibid, p. 210

৩৩ Neera Desai, Women in Modern India, Bombay: Vora & Co. Publishers Pvt. Ltd. , 1957, pp. 283-284

৩৪ Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, New Delhi: Ministry of Education and Social Welfare, Department of Social Welfare, Government of India, 1974, p. 214

৩৫Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, New Delhi: Ministry of Education and Social Welfare, Department of Social Welfare, Government of India, 1974, , p. 203

৩৬ Stanley Jaya Kumar ‘ Changing Directions in the Status and Role of Women in India’ in C.Chakrapani and S. Vijaya Kumar eds. Changing Status and Role of Women in Indian Society, New Delhi: M.D. Publications Pvt. Ltd. 1994, pp. 51-62

৩৭ Promila Kapur, Marriage and the Working Women in India, Delhi: Vikas Publications, 1970, pp.359-360

৩৮ Neera Desai, Women in Modern India, Bombay: Vora & Co Publishers Pvt. Ltd., 1957, pp. 292-293

৩৯ G.N.Ramu, Women, Work and Marriage in Urban India: A Study of Dual and Single Earner Couples, New Delhi: SAGE, 1989, p. 33

৪০ Maria Mies trans. Saral K. Sarkar, Indian Women and Patriarchy: Conflicts and Dilemmas of Students and Working Women, New Delhi: Concept Publishing Company, 1980, p. 20

৪১ Hilary Standing, Dependence and Autonomy: Women’s Employment and the Family in Calcutta, London: Routledge, 1991, p. 123

৪২ Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, UK: Basil Blackwell Ltd, 1990, p.173

৪৩ Socialization বা সামাজিকীকরণ তত্বে বলা হয় যে শৈশবকালেই শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে যেমন- আচারাচরণ, বাচনভঙ্গি, রং নির্বাচন, খেলনা, বই, ম্যাগাজিন, গল্প কাহিনী, সঙ্গীত, ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে নারীপুরুষের মধ্যে যে শারীরিক ভেদাভেদ তাকে লিঙ্গবৈষম্যের আকারে শিশুমনে প্রবেশ করানো হয় এবং পরবর্তীকালে আজীবন সেই বৈষম্যের ভীতকেই আরও মজবুত করা হয়। এককথায় বলা যায় যে Socialization বা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে লিঙ্গবৈষম্যের প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই তত্বের প্রবক্তারা হলেন- পারসন্স এবং বালেস(Parsons and Bales, 1956), কমের (Comer, 1974, বেলোত্তি(Belotti, 1975) এবং সার্পে (Sharpe, 1976)। Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, UK: Basil Blackwell Ltd, 1990, pp. 91-94

৪৪ V. Geetha, Patriarchy, Kolkata: STREE, 2007, p.136

৪৫ Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women, New Delhi: Ministry of Education and Social Welfare, Government of India, 1974, pp. 229-231

৪৬ Sex Discrimination in Private Employment’ in P. Andiappan, Women and Work: A Comparative Study of Sex Discrimination in Employment in India and USA, Bombay: Somaiya Publication Pvt. Ltd, 1980, p. 68

৪৭ Suranjan Ganguly, Satyajit Ray: In Search of Mordern, London: Scarecrow Press Inc, 2000, pp. 4-7

৪৮ ibid, pp. 4-7

বেদান্তদর্শনের ধারায় ভগবদ্গীতা ও ঈশ্বর গীতার তুলনামূলক আলোচনা

ড: জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ
হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশ হল ভগবদ্গীতা, যা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫-৪০ তম অধ্যায়ে বিধৃত আছে। ভগবদ্গীতা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ রূপে প্রসিদ্ধ।ঈশ্বর গীতা কূর্ম পুরাণের অন্তর্গত ১১টি অধ্যায় নিয়ে রচিত একটি ধর্মীয় গ্রন্থ, যেখানে শিবকে পরমেশ্বর রূপে পূজা করার কথা উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থে লিঙ্গ পূজা ও ব্রহ্মের সঙ্গে লিঙ্গের একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর রূপে উপস্থাপিত করে। ঈশ্বর গীতা শিবকে পরমেশ্বর রূপে ব্যক্ত করে। উভয় গীতাই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে অনুসরণ করে রচিত, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, কর্মফল, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করে। উভয় গীতার অধ্যায়গুলো যোগের সঙ্গে সম্পর্কিত যা পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগকে নির্দেশ করে। মানবধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের ইতিহাসে ভগবদ্গীতা একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়েছে। গীতাকে মোক্ষশাস্ত্রও বলা হয়। গীতার মূল শিক্ষা হল নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান অর্জন। আত্মজ্ঞ যোগী তিনিই হন, যিনি পারমার্থিক জ্ঞানতত্ত্বের অগ্নিস্পর্শে পরিশুদ্ধি লাভ করেন। ঈশ্বর গীতায় উল্লিখিত হয়েছে শিবভক্তরা শাস্ত্রে উক্ত বিধান অনুযায়ী সব সময় মহেশ্বরের চিহ্ন পূজা করে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা অব্যক্ত মায়ার কারণ রূপে পরমাত্মা শিবকে দেখে অক্ষর ব্রহ্ম রূপে। ঈশ্বর গীতায় শিব বলেছেন তিনিই একমাত্র পরমব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন আর কেউই নেই, তিনি আদি, তিনিই অন্ত। ঈশ্বর গীতায় শিব বিষ্ণুর সম্মিলন লক্ষিত হয়। আকাশ থেকে দিব্য আসন নেমে এলে তাতে বিষ্ণুদেবকে নিয়ে ভগবান শিব নিজ নিজ আলো বিস্তার করে উপবিষ্ট হন। যারা ভেদ বুদ্ধি দিয়ে হরি ও হরকে দেখেন, তারা মুক্তি পায় না। ঈশ্বর গীতায় পুরাণ ও বেদের ঐতিহ্য নিহিত। ঈশ্বর গীতায় শিবের বিশ্বরূপ দর্শন ও ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন বর্নিত হয়েছে। উভয় গীতাতেই বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত ধারায় ব্রহ্মের সর্বময়ত্ব লক্ষিত হয়।

সূচক শব্দ: শিব, বেদান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি, জ্ঞানযোগ, ভগবদ্গীতা, ঈশ্বর গীতা

মূল প্রবন্ধ

ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫-৪০তম অধ্যায় নিয়ে রচিত। এই গ্রন্থটি সাতশো শ্লোকে নিবদ্ধ একটি ধর্মগ্রন্থ। ঈশ্বর গীতা কূর্ম পুরাণের অন্তর্গত একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক পাঠ্য। ঈশ্বর গীতা ৭৬৮টির বেশী শ্লোক সহ ১১টি

অধ্যায় নিয়ে রচিত। এতে শিবলিঙ্গের উপাসনা, শৈব অদ্বৈত অধিবিদ্যা, ভক্তি ও ওঁ এর তাৎপর্যের আলোচনা লক্ষিত হয়। ঈশ্বর গীতা বৈদিক পাশুপত দর্শনের প্রাচীনতম শৈববাদকে অনুসরণ করে। ঈশ্বর গীতার দর্শন বৈদিক ও পুরাণ ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। ঈশ্বর গীতা ব্রহ্মের সর্বোচ্চ আটটি যোগের শিক্ষা দেয়, যা পতঞ্জলির পরবর্তী অষ্টাঙ্গ যোগের সাদৃশ্য ব্যক্ত করে।

আদি শঙ্করাচার্য প্রথম ভগবদ্গীতার ওপর টীকাভাষ্য লিখেছিলেন। অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করে পরে লিখেছিলেন। বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ হিসাবে অনেকেই ঈশ্বর গীতার কথা জানেন না। ঈশ্বর গীতার কয়েকটি ভাষ্য পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়, যার মধ্যে যোড়শ শতকের বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত ভাষ্যটি অন্যতম। ভগবদ্গীতা ও ঈশ্বর গীতার মধ্যে পার্থক্য হল ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমাত্মা পরমপুরুষ বলেছেন, তিনি তাঁরই নিজের মায়ায় জড় প্রকৃতি ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন এ কথা উল্লিখিত আছে। ঈশ্বর গীতা শিবকে উৎসর্গীকৃত। এই গ্রন্থে শিব পরম ঈশ্বর রূপে লক্ষিত হন। লিঙ্গপূজা ও শিবের সঙ্গে ব্রহ্মের একত্বের ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়!

ভগবদ্গীতা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলী। ত্রেতা যুগে শ্রীভগবান অবিনাশী জ্ঞানযোগের কথা বিবস্বান সূর্যকে সম্যকরূপে বলেছিলেন, সূর্য নিজপুত্র বৈবস্বত মনুকে এই যোগ যথাযথভাবে বলেছিলেন এবং বৈবস্বত মনু নিজ পুত্র ইক্ষাকুকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এ কথা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগে উল্লেখ করেছেন। গীতায় জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিযোগের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা মোক্ষ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমাত্মা পরমেশ্বর বলে ঘোষণা করছেন, যিনি নিজের মায়ার দ্বারা প্রকৃতি, সর্বভূত সৃষ্টি করেছেন এ কথা গীতার জ্ঞানযোগের ষষ্ঠ শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি জ্ঞানযোগের ত্রয়োদশ শ্লোকে নিজেকে কর্তা হলেও অবিনাশী পরমেশ্বর ও অকর্তা বলেছেন।

কূর্ম পুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডের (উত্তর ভাগ) প্রথম ১১টি অধ্যায়ের ভিত্তি হল শিব কর্তৃক উচ্চারিত ঈশ্বর গীতা। এই গ্রন্থে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, ও অসীম সত্তা হিসাবে বর্ণিত হন। ভগবদ্গীতার প্রতিটি অধ্যায় 'যোগ' নামে অভিহিত। ঈশ্বর গীতা ভগবদ্গীতার মতো যোগের মাধ্যমে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করার কথা বলে যা অদ্বৈত বেদান্তের গুরুত্বপূর্ণ দিক। অদ্বৈত বেদান্তের মূল ধারণা হল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। ঈশ্বর গীতা এই ধারণাকে সমর্থন করে এবং শিবকে প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করে।

ভগবদ্গীতা বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থগুলোর একটি। এই গ্রন্থে ব্রহ্ম বা পরম সত্তার স্বরূপ, জগৎ, আত্মা এবং কর্মের বিভাগ, মোক্ষ সম্পর্কিত আলোচনা লক্ষিত হয়। ঈশ্বর গীতার যে বিষয়গুলো ভগবদ্গীতায় নেই, সেগুলো হল শিবলিঙ্গের পূজা, শিবের সঙ্গে ব্রহ্মের একত্ব ও ব্রহ্মের সঙ্গে লিঙ্গের একত্ব। শিব একটি লিঙ্গের আকারে প্রকাশিত হন, যা ঈশ্বরের প্রতীক!

ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের পরিপূর্ণ ধারণার জন্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়েছেন, যা বিষয় ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে আত্মসংযমপূর্বক পরমাত্মায় চিত্ত স্থির করে। "তত্ত্বং প্রসাদং দর্শয়ন্তি" (গীতা, ১৪/২৫)

-- এই শ্লোকটি পরব্রহ্মের ধারণাকে সমর্থন করে। ভগবদ্গীতার মাধ্যমে বেদান্তদর্শনের মূল ধারণাগুলো ভালো ভাবে বোঝা যায়।

"মায়া যা সর্বভূতে" এই শ্লোকটি মায়ার ধারণাটিকে প্রকাশ করে, যা সর্বব্যাপী ব্রহ্মের ধারণা, জীবের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ, মায়ার স্বরূপ প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। "ব্রহ্মণ: সর্বভূতে" (গীতা ১৩/২৯) এই শ্লোকটি ব্রহ্মের ধারণা স্পষ্ট করে, যেখানে সর্বকিছুই ব্রহ্মের অন্তর্গত। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগই হল যোগ। বেদান্ত দর্শনে জীব ব্রহ্মের ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। যোগের মাধ্যমে এই ঐক্য সম্ভব এ কথা ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত হয়েছে। পতঞ্জলি দর্শনে যোগের অষ্ট অঙ্গের মধ্যে সপ্তম অঙ্গ হল ধ্যান।

ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধ্যানযোগের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। যোগাভ্যাসের দ্বারা যোগীর চিত্ত প্রশান্ত, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্যব্রত পরায়ণ হবে। ধ্যানযোগে বলা হয়েছে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সহ শরীর যাঁর বশীভূত, যিনি সকল রকম আশা হতে মুক্ত, যিনি দ্রব্য সংগ্রহ করেন না, সেই রকম যোগী একাকী নির্জন স্থানে অবস্থান করে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করবেন। "যোগী যুঞ্জিত সততম্ আত্মনম্ রহসি স্থিত:। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশী অপরিগ্রহ:।।" (৬/১০)। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে সৃষ্টিকর্মে পরমাত্মা পরমেশ্বরের ভূমিকা স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে," ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি: সূয়তে সচরাচরম্।।" (গীতা ৯/১০)। বেদান্তদর্শনেও পরমাত্মা ব্রহ্মকে জগৎ সৃষ্টিকর্তা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে!

ঈশ্বর গীতা শিবলিঙ্গের গুরুত্ব ও উপাসনার কথা বলে যা অদ্বৈত দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঈশ্বর গীতা জগৎ ও আত্মার মধ্যে একত্বের ধারণাটিকে তুলে ধরে। ঈশ্বর গীতাও অষ্টাঙ্গ যোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঈশ্বর গীতার প্রথম অধ্যায় জ্ঞানযোগের প্রারম্ভে আছে যে, ঋষিগণ লোমহর্ষন সূতমুনিকে বলছেন তিনি তাঁদের স্বায়ম্ভুব নামক সর্গ, মন্বন্তরের রহস্য, চতুর্বর্ণের আরাধ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তত্ত্ব বলেছেন, এখন তাঁরা সূতমুনির কাছে আরো কিছু শুনতে ইচ্ছা পোষণ করেন। যে মুহূর্তে ব্যাসদেবকে স্মরণ করে সূতমুনি ঋষিগণকে ঈশ্বর গীতা বলতে যাবেন, সেই সময় সাক্ষাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। লোমহর্ষন সূত নিজ গুরু ব্যাসদেবকে প্রণাম করে ঋষিদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানলাভের আগ্রহের কথা জ্ঞাপন করেন। মুনি ঋষিরা শান্ত তপস্বী, ধার্মিক, জ্ঞান পিপাসু। লোমহর্ষন ঋষি বলেন যে, পূর্বে কূর্মরূপী বিষ্ণু যে মুক্তিপ্রদায়িনী দিব্যজ্ঞান ব্যাসদেবকে প্রদান করেছিলেন, ব্যাসদেব তা তাঁকে প্রদান করেন। সেই দিব্যজ্ঞান মুনিদের প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তখন ব্যাসদেব মহাদেবকে প্রণাম করে দিব্যজ্ঞান যুক্ত বাণী বলতে আরম্ভ করেন। এক সময় সনৎকুমার সহ আরো যোগীরা মহাদেবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, মহাদেব উত্তরে যা বলেছিলেন সেই দিব্য বিবরণই ব্যাসদেব বিবৃত করেন। পরম জ্ঞান কি এই নিয়ে তর্ক বাঁধলে মুনিরা ঘোর তপস্যা শুরু করেন, কিন্তু তাঁরা সংশয় দূর করতে না পেরে পুরুষের মধ্যে উত্তম নারায়ণের আশ্রয় নেন। নারায়ণই হলেন পুরাণ অব্যক্ত পুরুষ। ঋষিগণ নরনারায়ণরূপী বিষ্ণুকে বলেন যে, এমন কোনো গুহ্য বিষয় নেই, যা তাঁর জানা নেই। তিনি এখন ঋষিদের ধর্মসংকট থেকে মুক্ত করুন। তাঁদের জিজ্ঞাসা ছিল-- সমস্ত কিছুর কারণ কি? আত্মা কে? ঈশ্বর কি? পরমেশ্বর

ব্রহ্মই বা কি? সেই মুহূর্তে বিষ্ণু পাশে দেবী লক্ষ্মীকে নিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুক ধারণ করে তেজোময় রূপ পরিগ্রহ করেন এবং তেজরাশির মধ্যে প্রসন্ন মুখে উপস্থিত হলেন মহাদেব মহেশ্বর। তাঁকে দেখে সনৎকুমার সহ মুনিরা পরমেশ্বর শিবের স্তব করে জয়ধ্বনি দেন। মহাদেব তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুদেবকে আলিঙ্গন করে ব্রহ্মবাদী মুনিদের সমবেত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দুজনের আলিঙ্গন প্রমাণ করে যে তাঁরা একই ব্রহ্মের দুটি রূপ। ভগবদ্গীতায় শিব বিষ্ণুর মিলন নেই। বিষ্ণুদেব মহাদেবকে মুনিদের দিব্যজ্ঞান প্রদানের অনুরোধ করেন। বিষ্ণুদেব বলেন নিজ আত্মাকে একমাত্র শিবই জানেন, আর কেউ তা জানে না! ঈশ্বর গীতায় বিষ্ণুদেবের কথায় শিবের মহিমা ও গুরুত্ব লক্ষিত হয়। ভগবদ্গীতায় এরকম কোনো কাহিনী নেই। বিষ্ণুদেব শিবকে মুনিদের আত্মা দর্শন করানোর অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুদেব মুনিদের বলেন মুনিরা মহেশ্বরের দেখা পেয়েছেন, এতেই তাঁদের দিব্যচক্ষু খুলে গেছে। মহেশ্বরের দর্শন লাভের জন্যই তাঁরা পরমতত্ত্ব সর্ম্পকে অবগত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ভগবদ্গীতায় ভগবানের বিশ্বরূপ দেখার জন্য যেমন অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন, তেমনই মহাদেবের দর্শন লাভের মাধ্যমে মুনিরা দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হন পরমতত্ত্ব জানার জন্য।

এরপর আকাশ থেকে দিব্য আসন নেমে এলে তাতে বিষ্ণুদেবকে নিয়ে ভগবান শিব নিজ নিজ আলো বিস্তার করে উপবিষ্ট হন। যোগীরা যেমন আত্মায় আত্মস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখেন, ব্রহ্মবাদী মুনিরা সেই বিমল আসনের ওপর তেজোময় দেবাদিদেবকে দেখতে থাকেন এবং প্রশ্নগুলো করেন। মহাদেব তখন মুনিদের পরম আত্মযোগ উপদেশ করেন। ঈশ্বর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগে বলা হয়েছে একমাত্র নির্মল, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, সনাতন, সর্বান্তর, তমোগুণের অতীত সাক্ষাৎ চিৎ- সত্তা হল এই আত্মা। ইনিই অন্তর্যামী, ইনিই একমাত্র পুরুষ, ইনিই প্রাণ, মহেশ্বর, কাল, অব্যক্ত, ব্রহ্ম, বেদ, শ্রুতি। এই আত্মা থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি, এরই মাঝে বিশ্বের লয় (২/৪-৫)। "স মায়ী মায়য়া বদ্ধ: করোতি বিবিধাস্তন:" (২/৬) এখানে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি (পরমাত্মা) সৃষ্টি করেন মায়ার সাহায্যে। মায়া জড়িয়ে আছে তাঁরই মধ্যে, তিনি নিজেই মায়ার আধার। তবুও মায়াশক্তির এমনই আকর্ষণ, এমনই দুর্নিবার গতি যে তিনি নিজেই তাতে মোহিত হয়ে সৃষ্টিখেলায় মাতেন। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগে শ্রীকৃষ্ণ "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"(৪/৬) এ কথা বলেছেন। তিনি অবিনাশী পরমাত্মা হয়েও, সকল প্রাণীবর্গের অধিপতি হয়েও প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজের ঐশী শক্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হন। জ্ঞানযোগে তিনি নিজেকে এই জগতের কর্তা হলেও অকর্তা বলেছেন -- "অকর্তারমব্যয়ম্" (৪/১৩)। ঈশ্বর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্যযোগে পরমাত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে সেই আত্মা কর্তা নন, ভোক্তাও নন (২/৭)।

ঈশ্বর গীতার সাংখ্যযোগে বলা হয়েছে যে নিজে মায়া পাশে বেঁধে থাকে, সে শত জন্মেও মুক্তি লাভ করে না। তাই আমাদের মায়া পাশ বন্ধনের পথ খোঁজা উচিত। নয়তো মুক্তির স্বাদ পাব না। দেহীর পক্ষে সংসারের মূল হল অজ্ঞান (২/১৫-১৬)। ভগবদ্গীতার জ্ঞানযোগে(৪/১৫) বলা হয়েছে মুক্তিকামী সাধকদের দ্বারা নিষ্কাম কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও এভাবেই চলতে বলেন। ঈশ্বর গীতা ও ভগবদ্গীতা দুটি গ্রন্থেই এভাবে মুক্তির পথ তথা মোক্ষের সন্ধান লক্ষিত হয়, যা বেদান্ত দর্শনের মূল

তত্ত্ব। ঈশ্বর গীতায় বলা হয়েছে নিজেকে কর্তা ভাবার কারণ হল বিবেকহীনতা, যার মূল অহংকার। ব্রহ্মবাদী ঋষিদের কাছে জগৎ শিবময় ও ব্রহ্মময়। ভগবদ্গীতার জ্ঞানযোগে উল্লিখিত হয়েছে যোগীরা পরমাত্মরূপ অগ্নিতে অভেদ দর্শনাত্মক যজ্ঞর দ্বারা আত্মরূপ যজ্ঞের হোম সম্পাদন করেন (৪/২৫)। অর্থাৎ যোগীরা পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম বোধ করায় আত্মরূপ অহংকার ত্যাগ করেন। এখানেও জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন লক্ষিত হয়। ঈশ্বর গীতার সাংখ্যযোগে বলা হয়েছে যোগী তখনই স্বয়ং সম্পূর্ণ হন, যখন শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর চৈতন্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তিনি যাবতীয় বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন না, আত্মাকেই পরমার্থ রূপে দেখেন, জগতকে মায়ামাত্র জ্ঞান করেন, তখন তিনি শিবস্বরূপ হন (২/২৯-৩০)। ভগবদ্গীতার জ্ঞানযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, যিনি তাঁর অলৌকিক জন্ম, কর্ম দুটোই তত্ত্ববিচারপূর্বক জানেন, তিনি পার্থিব শরীর ত্যাগ করে তাঁর দিব্য শরীর প্রাপ্ত হন (৪/৯), অর্থাৎ সেই জ্ঞানতপস্বী জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তত্ত্বগত দিক দিয়ে দুটি গ্রন্থের এই তত্ত্বগুলো সাদৃশ্য পূর্ণ। এরকম আর একটি তত্ত্বের অবতারণা করা যেতে পারে। ঈশ্বর গীতায় মহাদেব বলেছেন যে সব তত্ত্বযোগীরা তাঁর তত্ত্বজ্ঞান বলে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন, তাঁরাই অব্যয় মুক্তি পেয়েছেন। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানী পন্ডিতরাই জানেন তিনি শাসক নন, মায়ার অতীত, তবু তিনি প্রেরয়িতা (২/৫১-৫২)। ভগবদ্গীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগীকে তত্ত্বজ্ঞানী বলা হয়েছে(৪/১৯)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন কর্মজনিত ফলে তাঁর আসক্তি নেই, কর্মসমূহ তাঁকে লিপ্ত করে না, এভাবে যে সাধক তাঁকে তত্ত্বত: জানেন, তিনিও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না (৪/১৪)। কর্মের তত্ত্ব তিনি অর্জুনকে যথাযথ উপদেশ করবেন, যা জেনে তিনি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন (৪/১৬)।

ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের জ্ঞানযোগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে, তাঁর দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান লাভ করলে অর্জুন আর মোহগ্রস্ত হবেন না। কারণ একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে পুনরায় অজ্ঞান আসে না! সেই জ্ঞান দ্বারা অর্জুন ব্রহ্মা থেকে স্থাবর ভূত সমূহকে নিজের আত্মাতে এবং পরমেশ্বরকে তাঁর মধ্যে দেখতে পাবেন(৪/৩৫)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অর্জুন আত্মজ্ঞান লাভ করে জ্ঞানযোগী হবেন। ঈশ্বর গীতার তৃতীয় অধ্যায় অব্যক্ত জ্ঞানযোগে শিব বলছেন তিনিই সর্বভূতের আত্মা, তিনিই শান্ত এবং জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বর। এই জগত সবই পরমাত্মা শিবের বহি:প্রকাশ। সব কিছুর মধ্যেই যে একই পরমাত্মা পরমেশ্বর বিরাজ করছেন -- এই ভাব যাঁর উদয় হয়েছে সে-ই জ্ঞানী এবং বেদজ্ঞ বেদবিৎ (৩/৭-৮)। এই শ্লোকে সব কিছু যে পরমাত্মারূপ শিবের দ্বারা ব্যাপৃত এই জ্ঞান লাভ করেন যিনি, তিনিই আত্মজ্ঞানী এ কথা অভিব্যক্ত হয়েছে।

ঈশ্বর গীতার তৃতীয় অধ্যায় অব্যক্ত জ্ঞানযোগে শিব বলেছেন তিনি সেই পরমেশ্বর, যিনি সময়ের সঙ্গে এক হয়ে জগতের সৃষ্টি করেন এবং সংহার করেন! তাঁর সান্নিধ্যেই সেই কাল জগত সৃষ্টি করছে এবং আবার অনন্ত আত্মাকে জাগতিক কাজে নিয়োজিত করছে। এখানে আত্মাকে কালের সঙ্গে অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে-- এটাই হল বেদের অনুশাসন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন বর্ণাশ্রমাদির অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মায়া বলে তিনি আবির্ভূত হন। সাধুগণের রক্ষার জন্য,

দুষ্টদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য তিনি আবির্ভূত হন (৪/৭-৮)। তত্ত্বজ্ঞরা তাঁর অলৌকিক জন্মকর্মের কথা জানেন। পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কালের সঙ্গে এই সংযোগ বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ।

ঈশ্বর গীতার চতুর্থ অধ্যায় দেবদেব মাহাত্ম্য জ্ঞানযোগে পরমেশ্বর শিব দেবদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। দেবদেবই সব কিছুর মূল উৎস। যত রকম তপস্যা আছে, দান ও যাগযজ্ঞ আছে, সেসব দিয়ে নয়, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই শিবপ্রাপ্তি হয় এ কথা পরমেশ্বর শিব বলেন। শিব বলেছেন যারা তাঁর ভক্ত, তারা বিনষ্ট হবে না (৪/১২)। ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের রক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যাঁরা সমস্ত কর্ম তাঁকে সমর্পণ করে তিনিই পরম পরমার্থরূপে উপাস্য এভাবে তাঁর প্রতি অনন্য যোগের দ্বারা উপাসনা ও ধ্যান করেন, তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্ত হন, সেই সকল ভক্তকে তিনি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করেন (১২/৭)। অতএব অর্জুনকেও তিনি তাঁর প্রতি সমাহিত হতে বলছেন, তাঁর প্রতি বুদ্ধি নিবিষ্ট করতে বলছেন। তাহলে দেহান্তে অর্জুন তাঁর স্বরূপে স্থিতিলাভ করবেন। অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হবেন (১২/৮)। এসবই হল পরমেশ্বর পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরো বলেছেন যে, অর্জুন যদি স্থির ভাবে চিত্ত সমাহিত করতে না পারেন, তাহলে অভ্যাস যোগের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে যত্নবান হোন। এভাবে না পারলে অর্জুন ভগবৎপ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হোন। তাহলে ক্রমে সিদ্ধিলাভ করবেন (১২/৯)। ঈশ্বর গীতাতেও দেবদেব মাহাত্ম্য নামক চতুর্থ অধ্যায়ে অনুরূপ ভাবে শিবকে জানার জন্য বিভিন্ন যোগের কথা অর্থাৎ ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ, শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মের কথা ও ভক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে (৪/২৫)।

ঈশ্বর গীতার তৃতীয় আধ্যায় অব্যক্ত জ্ঞানযোগে শিব পরমাত্মার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম থেকেই প্রধান ও পরম পুরুষ কালের প্রকাশ, এবং এই কাল শিব থেকেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি, তাই সবই শিবময়। যাঁর পা, চোখ, মাথা, মুখ বিশ্বচরাচরে ব্যাপৃত আছে, যিনি সব স্থানে শ্রুতিমান অর্থাৎ শুনতে পান, সব লোক ব্যাপৃত করে বিরাজমান, তিনি পরব্রহ্ম(৩/১-২)। ভগবদ্গীতার ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করে বিরাজিত। সকল শরীরের হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ এবং মস্তক ও মুখ তাঁর হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ (১৩/১৪)। অর্থাৎ পরব্রহ্ম যে বিশ্বচরাচরের সর্বভূতে ব্যাপৃত সে কথা দুই গীতাতেই উল্লিখিত হয়েছে।

ঈশ্বর গীতার দেবদেব মাহাত্ম্য জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়ে পরম শিবভক্তের শিবপুজোর কথা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। যে শিবভক্ত ভক্তি সহকারে শিবকে পুজো করে, শিবের আরাধনার জন্য বেলপাতা, ফল, জল সংগ্রহ করে শিবকে নিবেদন করে, সে-ই ভক্তই পরমেশ্বর শিবের পরম ভক্ত (৪/১২)। ভগবদ্গীতায় শিবপুজোর কথা নেই। দশম অধ্যায়ের বিভূতিযোগে উল্লিখিত হয়েছে যিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আদিহীন, জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনি মনুষ্যদের মধ্যে মোহশূন্য হয়ে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন (১০/৩)। ভগবদ্গীতায় 'মহেশ্বরে'র উল্লেখ থেকে বোঝা যায় মহেশ্বর ও পরমাত্মা পরমেশ্বরের মধ্যে কোনো ভেদ নেই ।

ঈশ্বর গীতার দেবদেব মাহাত্ম্য জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়ে শিব বলেছেন তেজোময় মুনি, পিতৃদেব, দ্বাদশ মনু কেউই তাঁর স্বরূপ দেখতে পান না, এমনকি ব্রহ্মা বা ইন্দ্রও পান না। শিব একমাত্র স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, দেবতারা তাঁর অবয়ব (৪/৬)। ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগ নামক দশম আধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছেন তাতে বলেছেন ব্রহ্মাদি দেবতা, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি কেউই তাঁর উৎপত্তি অবগত নন। কারণ তিনি দেবতাদের ও মহর্ষিদের আদি কারণ (১০/২)।

ঈশ্বর গীতার দেবদেব মাহাত্ম্য জ্ঞানযোগে উল্লিখিত হয়েছে যে, শিবের মধ্যে অধিষ্ঠিত সবার আত্মা, শিবেরই রূপে রূপায়িত হয়ে তাঁর প্রথমা শক্তি ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে জগতের স্রষ্টা হন। শিবের দ্বিতীয় বিপুলা শক্তি শ্রীহরি নারায়ণ, সেই নারায়ণ অনন্ত জগতপালক। আর শিবের যে তৃতীয় মহৎ শক্তি তা হল তামসী শক্তি। সেই শক্তিই কাল ও রুদ্ররূপে সংহারক (৪/২১-২২-২৩)। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সমন্বয়রূপ পরব্রহ্মের কথা প্রকাশিত হয়েছে।

ঈশ্বর গীতার দেবদেব মাহাত্ম্য জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়ে শিব বলেছেন তিনি সকল ভূতের অভ্যন্তরে অবস্থান করে আছেন, অন্তর্যামী রূপে তিনি সব কিছুর সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা। কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। সব কিছু নিয়ে ব্রহ্মান্ড যাঁর অভ্যন্তরে, যিনি সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই শিব। তিনিই ধাতা, বিধাতা, কালাগ্নি বা বিশ্বতোমুখ (৪/৩-৪)। ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ দর্শন নামক একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁকে "বিশ্বমনন্তরূপম্" বলে সম্বোধন করেছেন। অর্জুন তাঁকে আদিদেব ও অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের পরম প্রলয়স্থান বলে জেনেছেন। যা কিছু বেদ্য, সব কিছুর বেদিতা তিনি। যা কিছু বেদ্য সবই তিনি। তিনিই পরমধাম, জগতকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন (১১/৩৮)।

ঈশ্বর গীতার দেবদেবনৃত্য দর্শন ভক্তিযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে পরম জ্যোতির্ময় সেই ঈশ্বর মহাদেবকে যাঁরা নির্মল গগনে বিষ্ণুর সঙ্গে নৃত্য করতে দেখেছেন, সেই সকল সংযতচিত্ত, যোগতত্ত্ববিৎরাই তাঁকে জানেন। তাঁরাই যথার্থ ভূতাধিপকে দেখেছেন (৫/১-৩)। মহাদেবের নৃত্যবিষয়ক এই অধ্যায়ে শিব বিষ্ণুর মিলন দৃশ্য লক্ষিত হয়, যা যোগতত্ত্বের তাৎপর্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই অধ্যায়ে শিবের যে রূপ বর্ণিত হয়েছে, তা ভগবদ্গীতার অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভক্তপরায়ণ শিব আকাশে দৃশ্যমান হয়েছিলেন, যাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র পা, সহস্র শরীর, সহস্র বাহু, যিনি জটিল, মাথায় অর্ধচন্দ্র, বাঘছাল পরিহিত, যাঁর সুবিশাল আকারের ত্রিশূল, জ্ঞানদণ্ড আছে, সেই ত্রিনেত্রধারী, তিনটি চোখে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির তেজ, যিনি নিজের তেজে জগৎ ব্যাপ্ত করেন, সেই রুদ্রমূর্তি করালদংষ্ট্র, অসীম বলশালী, যাঁর জ্যোতি কোটি সূর্যকেও হার মানায়, বিশ্বে অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করে, যিনি ধ্বংসকারী, বিশ্বের সকল কর্ম সম্পাদনকারী বিশ্বকর্মা সদৃশ, সেই দেবাদিদেবকে মুনিরা নৃত্য করতে দেখলেন (৫/৮-১১)।

ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ দর্শন নামক একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা দিতে গিয়ে " মহাবাহো" বলে সম্বোধন করে অর্জুন বলেন যে, তিনি পরমেশ্বরের বহু মুখ, বহু বাহু, বহু নেত্র, বহু চরণ, বহু উদরবিশিষ্ট এবং অসংখ্য দন্ত দ্বারা ভীষণ বিরাট বিগ্রহ

দেখে সর্বপ্রাণী অত্যন্ত ভীত হয়েছেন এবং তিনিও হয়েছেন। পরমেশ্বরের আকাশস্পর্শী, নানা বর্ণযুক্ত, বিস্ফারিত মুখমন্ডল ও উজ্জ্বল বিশাল দুটি চক্ষু দেখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে, তিনি ধৈর্য্য ও শান্তি হারিয়ে ফেলছেন। তিনি পরমেশ্বরকে "দেবেশ" বলে সম্বোধন করে বলেন যে, দীর্ঘ দণ্ড দ্বারা বিকৃত ও প্রলয়াগ্নিতুল্য তাঁর মুখ সকল দেখে অর্জুনের দিকভ্রম হচ্ছে, তিনি শান্তি পাচ্ছেন না (১১/২৩-২৫)।

ঈশ্বর গীতায় বর্ণিত শিবের বিরাট রূপের সঙ্গে ভগবদ্গীতায় বর্ণিত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভয়াল ধ্বংসাত্মক রূপের সাযুজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বর গীতার পরমেশ্বর নৃত্যদর্শন জ্ঞানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিব বলেন মুনিরা নৃত্যরত শিবের যে অদ্ভুত রূপ দর্শন করেছেন, সেই রূপ জাগতিক জগতে একমাত্র শিবের তুলনা। মুনিদের এই রূপের মাধ্যমে শিব তাঁর মায়া দেখিয়েছেন। ভবসংসারের ভেতর মায়া হয়ে জগত পরিচালনা করেন শিব। এই বিশ্ব শিবের ভাবে শিবের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়। শিবই কালরূপী, কালাত্মক এই জগত পরিচালনা করেন (৬/৪-৬)।

ভগবদ্গীতাতে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের পর শ্রীভগবান বলেন যে, তিনি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল। বর্তমানে লোকসংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অর্জুন যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলের কেউই বেঁচে থাকবে না (১১/৩২)। পরিশেষে অর্জুন শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য বুঝতে পারেন। অর্জুন তাঁকে " মহাত্মা", "অনন্ত", "দেবেশ" , " জগন্নিবাস" নামে অভিহিত করে বলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মারও গুরু এবং আদিকারণ, যা ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং উভয়ের অতীত অক্ষর ব্রহ্ম সবই তিনি। তিনি ভিন্ন ত্রিভুবনে কিছু নেই (১১/৩৭)। এভাবেই ঈশ্বর গীতা ও ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হয়েছে। ঈশ্বর গীতার দেবদেবনৃত্যদর্শন ভক্তিযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়ে মুনিরা শিবকে বলেন ওঁকারই তাঁর বাচক, মুক্তবীজ তিনি, তিনিই অক্ষর (৫/২৮)। ঈশ্বর গীতার লিঙ্গ ব্রহ্ম জ্ঞানযোগ নামক দশম অধ্যায়ে শিব বলেছেন যে, পন্ডিতরা পরমাত্মা শিবকে দেখেন অক্ষরব্রহ্ম রূপে, শিবই সকলের পরম আশ্রয়, নিরাকার, বিশুদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ (১০/১-২)।ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেন মহর্ষিগণের মধ্যে তিনি ভৃগু। শব্দসমূহের মধ্যে তিনি একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁকার (১০/২৫)। উভয় গ্রন্থে ওঁকারকে ব্রহ্মবাচক রূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতীকরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

ঈশ্বর গীতার দেবদেবনৃত্যদর্শন ভক্তিযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে যে, সমস্ত বেদ হরিহর থেকে এসেছে, আবার হরিহরেই লীন হবে। ঋষি মুনিরা নিজের আত্মাতে জগতের কারণ হরিহরকে নৃত্য করতে দেখেছেন। হরিহরের স্মরণ নিয়ে মুনিরা হরিহরকে নমস্কার জানিয়েছেন (৫/২৬-২৭)। ঈশ্বর গীতায় শিব বিষ্ণুর মিলনের কথা বার বার অভিব্যক্ত হওয়ায় ঈশ্বর গীতার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয়েছে।

ঈশ্বর গীতার যোগাদি জ্ঞানযোগ নামক একাদশ অধ্যায়ে শিব বলেছেন যে, শিবের সাযুজ্য লাভের ক্ষেত্রে পাশুপত ব্রতই হল প্রশস্ত। এই যোগ অত্যন্ত গোপনীয়। মুনিরা ভক্ত ব্রহ্মচারী, দ্বিজাতি বলে শিবের দ্বারা কথিত হয়েছে (১১/৬৭-৬৮)।

লিঙ্গ পূজার কথা ঈশ্বর গীতাতেই নির্দিষ্ট ভাবে বলা আছে যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঈশ্বর গীতার একাদশ অধ্যায়ে শিব বলেছেন শিবভক্তরা শাস্ত্রে উক্ত বিধান অনুযায়ী সব সময় মহেশ্বরের চিহ্ন পূজা করেন। জল, অগ্নিমধ্যে, আকাশে অথবা সূর্যে কিংবা

অন্য রত্নাদিতে ঈশ্বরকে চিন্তা করে ঈশ্বর- লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্ন পূজা করবেন। সমস্ত কিছুই লিঙ্গময়, সবই লিঙ্গে অবস্থিত, তাই যেকোনো স্থানে চিরন্তন লিঙ্গ পূজা করবেন (১১/৯৫- ৯৭)।

ঈশ্বর গীতার একাদশ অধ্যায়ে যজুর্বেদীয় শতরুদ্রীয় স্তোত্রও যোগীদের জন্য বিহিত হয়েছে। যোগী যাবজ্জীবন নির্জনে একাকী সংযত চিত্তে এই স্তোত্র জপ করলে পরম পদ পাবে (১১/৯৮-১০০)।

পরিশেষে শিব নারায়ণ পূজার গুরুত্ব আরো একবার বিবৃত করেন। শিবকে সন্তুষ্ট করতে চাইলে মহাযোগীকে পুরুষোত্তম নারায়ণকে অবশ্যই পূজা ও প্রণাম করতে হবে। ঈশ্বর গীতার শেষে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহেশ্বর তাঁর কথা শেষ করে বিষ্ণুদেবকে আলিঙ্গন করে সকলের দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হন। হরিহরের অপূর্ব তাৎপর্য এভাবেই ঈশ্বর গীতায় অভিব্যক্ত হয়।

ভগবদ্গীতার পরিশেষে অর্জুন একাগ্রচিত্তে গীতাশাস্ত্র শুনেছেন কিনা যা শ্রবণ করে অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হয় এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রশ্ন করেন। অর্জুন তখন স্বীকার করেন যে, তাঁর অজ্ঞান নাশ হয়েছে, এরফলে তিনি সংশয়মুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করতে সম্মত। তাঁর আর কোনো কর্তব্য নেই। অপর দিকে ব্যাসদেবের অনুগ্রহে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখে পরম গুহ্য যোগ কথা সঞ্জয় শ্রবণ করেছিলেন যা তাঁর বিস্ময়, রোমাঞ্চ ও আনন্দের কারণ হয়! তাই সঞ্জয় পরিশেষে মত প্রকাশ করেন যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অবস্থান করেন, সেই পাণ্ডবপক্ষে রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজ করে। উভয় গীতাতেই অবিনাশী যোগকথা অজ্ঞানের মোহ দূর করতে সক্ষম হয়েছিল।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১) Swami, Nikhilananda, 1990, Vedantasara of Sadananda, Kolkata, Advaita Ashrama

২) WARDER, A.K, 1988, INDIAN KAVYA LITERATURE: The Origins and Formation of Classical Kavya, Vol 2, New Delhi, Motilal Banarsidass Publishers PVT

৩) সিংহ, কালীপ্রসন্ন অনূদিত, ২০১৮, মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্যতীর্থ পাবলিশার্স

৪) পাল, বিপদভঞ্জন, ১৪১০, মহালয়া, বেদান্তসার:, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা--৬, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৫) সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস, ১৯৭৮, মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৬) তর্করত্ন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সম্পাদিত, সন ১৩৩২ সাল, কূর্ম-পুরাণম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স

৭) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৬১, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অষ্টম সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়

৮) ব্যানার্জি দেবব্রত (ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা), ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৪, ঈশ্বর গীতা (www.scribd.com/document/782987486)